মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৬

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কল-৯

মুদ্রাকর : গোপাল পাল। স্টার প্রিন্টিং প্রেস। ২১/এ রাধানাথ বোসলেন কল-৬

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা

অশ্রু পর্ব

মাঝে মাঝেই বাস্তবতা হারিয়ে যায় শফীউল্লার। লোকের কাছে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু বাস্তবতা হারিয়ে এই ভাবনা-কল্পনার মধ্যে যাত্রা করতে সে নিজে ভালবাসে। আর, সে বাস্তবতা হারিয়ে বসবে না বললে, তার পক্ষে সম্ভব হয় না প্রতিরোধ করার। হতে পারে সে অন্যের কাছে অস্বাভাবিক, অপ্রকৃতিস্থ, কিন্তু তার ভাবনা-কল্পনার অনুভবের কাছে সে সত্য। কোনো সত্যকেই আমরা কখনও অস্বীকার করতে পারি না, অনাদর করতে পারি না, এড়িতে চলতে পারি না, তাই অপ্রকৃতিস্থ কোনো মানুষের ভাবনা-কল্পনা তার কাছে মিথ্যে এ কথা পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনোদিন বিশ্বাস না করে। সেই ভাবনার সত্য কারুর কাছেই মিথ্যে হতে নেই।

শফীউল্লার ভাবনা-কল্পনার মস্তিষ্ক নানারকম ধর্মকিস্‌সার মধ্যে চন্দ্রাহত হয়ে পড়ে বার বার। সে বিস্তর কিতাব পড়েছে, তাই বহু কিতাবের কথাবস্তু, বিধিবিধান, মহিমান্বিত নবি রশুলদেব কিস্‌সা কাহিনীতে তার মন খোয়া যায়। হারিয়ে যায় সে। মধ্যচল্লিশ বয়সের অকৃতবিবাহ এই পুরুষটি এতদঞ্চলে বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে বার বার। সে যে ঘটনার ভেতর থাকে, তাকে সরিয়ে দিয়ে থামিয়ে দিয়ে অন্য ঘটনায় নিয়ে যায়। আমরা তার ভাবনা-কল্পনার সত্যকে মান্য করি, সেজন্য তার সেই ভাবনা-কল্পনার বিবরণ আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তার ভাবনা কল্পনাকে অবাস্তব আমরা বলিনি, তাই এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে যে সচরাচর বাস্তবতা আসবে, সেখানে শফীউল্লার পঠিত কেতাব কাহিনীর অতীত ও বাস্তবতা মনে করা হবে। উপন্যাসের অংশও হয়ে উঠবে।

প্রথম যৌবন থেকে ধর্মসংক্রান্ত পড়াশোনা শফীউল্লাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। আর সেই সঙ্গে ধর্ম আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তার পরিবারে নামাজ রোজা সকলেই করে এসেছে, ধর্মে মতি সকলেরই ছিল, আছে, কিন্তু কারুরই এমন পড়াশোনার উৎসাহ ছিল না। সামান্য লিখতে পড়তে শেখাটুকুতেই নিজেদের পড়াশোনা সীমাবদ্ধ রেখেছিল। আর তার বেশি পড়াশোনার প্রয়োজনও তাদের ছিল না। ব্যবসায় হিসেব-নিকেশটুকু করতে পারলেই বেশ চলে যায়। শফীউল্লার পড়াশোনায় মন ছিল, তাই তাকে পড়তে দেওয়া হয়েছে। তার এই পাণ্ডিত্যের জন্য পরিবার গর্ববোধও করে থাকে।

মেটিয়াবুরুজের অনেক শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষই তার পাণ্ডিত্যের খবর জানে। কিন্তু এটাও তাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি, লোকটা উদাস, উদ্দেশ্যহীনভাবে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, আর নিজের ভাবনার মধ্যে নিজে হারিয়ে থাকে। সাম্প্রতিকের ভেতর থেকে তার এই হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা প্রত্যেকেই জানে।

এও জানে, যখন বাস্তবতায় থাকে, তার চেয়ে বস্তুবাদী কেউ নয়। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, ধর্মের নামে অধর্ম করে যারা তাদের ছাল-চামড়া খসিয়ে নেয়। ধর্মের বিধিবিধান কোথায় কী, নিষেধ পরিত্যাজ্য সব তার কণ্ঠস্থ। অনেক আলেম মৌলবিও তার সঙ্গে বিতর্কে এঁটে উঠতে পারে না। কে কোথায় ভুল ধর্ম আচরণ করছে, কোথায় কে ভুল ফতোয়া দিচ্ছে, সেসব প্রতিবাদ করার একমাত্র স্পষ্টবাদী লোক এই শফীউল্লা। ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান প্রীতি তার আর একটি স্বভাবের দিক। পৃথিবীতে কত মানুষ মুসলমান, কটা ইসলামি রাষ্ট্র, অমুসলমান কোন কোন বিখ্যাত পণ্ডিত-দার্শনিক মনীষী ইসলাম ধর্ম ও নবি রশুলকে তারিফ করেছেন, সে সব তার মুখস্থ।

এমনকী এই মেটিয়াবুরুজে মুসলমানরা কোন কোন দিক থেকে উন্নতি করে চলেছে, তার প্রতিনিয়ত হিসেব-নিকেশ তার কাছে পাওয়া যাবে। কজন মুসলমান এম এ, এম কম, এম এস-সি পাশ, কজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, কজন উকিল হয়েছে, কজন শিক্ষক, অধ্যাপক, বি সি এস, এসব হিসেব সে প্রতিনিয়ত করে যায়। সেই সঙ্গে মুসলমান মেয়েরা কোথায় কীসে এগিয়ে, তার হিসেবও থাকে তার।

এসব বাস্তববুদ্ধি যার মাথায় থাকে, সেই খতিয়ান যে প্রতিনিয়ত নথিভুক্ত করে যায়, তাকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখলেও তাই তাকে কেউ অপ্রকৃতিস্থ মনে করে না, তার এই অপ্রকৃতিস্থ দশা প্রকৃতিস্থ মান্যতা পেয়ে গেছে এ এলাকায়। চন্দ্রাহত কল্পচৈতন্যের মধ্যে উদাস হয়ে তাকে হেঁটে যেতে দেখলে, কেউ আর আশ্চর্য মনে করে না, স্বাভাবিক ভাবে। মেটিয়াবুরুজের কোথাও কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে, অথবা কোথাও বসে থেকে, কোনো অতীত ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়ে, অন্য কোনো দেশের অতীত ঘটনাক্রম, অন্য কোনো ব্যক্তির কিস্‌সা কাহিনীর ঘটনাক্রম এনে ফেলে, সাম্প্রতিকের ভেতর।

ধর্মচর্চার প্রভাবই তার এই পঠিত অতীত ও কিস্‌সায় চন্দ্রাহত হওয়ার কারণ। এক এক সময় এক এক জন নবির মহিমাকাহিনী সে নিজের মধ্যে এনে ফেলে। আর সেই কাহিনীর মধ্যে এতই মগ্ন হয়ে পড়ে যে কাহিনীর ঘটনাক্রম চরিত্র প্রকৃতি দেশ অতীত সবকিছুই যেন বাস্তব হয়ে ওঠে তার মধ্যে। সে যেন ওই কালের ওই ঘটনাক্রমে চাক্ষুষ যাত্রা করে আসে। হয়তো বা শফীউল্লা সেইসব কাহিনীকে অতি মনোযোগ দিয়ে পড়েছে এবং আত্মস্থ করে ফেলেছে, তাই সে যখন সেই সেই অতীত কাহিনীতে চলে যায়, সেই অতীতই তার সাম্প্রতিক হয়। ধর্মচর্চা, পাঠ, তো এক অর্থে ভালই, মনোযোগ দেওয়া, আত্মস্থ করা আরও ভাল। কিন্তু তার এই হঠাৎ হঠাৎ বাস্তবতা থেকে মন খোয়া যাওয়া ভাল কিনা, অতীত কিস্‌সার ঘটনাক্রমের সঙ্গী হওয়া ভাল কিনা, সে সব জানা নেই।

মেটিয়াবুরুজে এক ধনী পরিবারে তার বাস, নিজেও ধনী, কিন্তু দাদা শওকতউল্লা তার চেয়ে অনেক বেশি ধনী। কিন্তু তার যা শিক্ষাদীক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শওকতউল্লার টাকা পয়সাকে খানিকটা টেক্কা দিয়ে দেয়। ভাইয়ে ভাইয়ে টেক্কা দেওয়ার সম্পর্কও নেই, রেষারিষও নেই।

এই মরা আলোর বিকেলে নিজের মনে মগ্ন থাকতে থাকতে হেঁটে যাচ্ছিল শফী। যেতে যেতে পৌঁছে যায় সে কারবালার কবরস্থানের গেটে। মেটিয়াবুরুজের নানাস্থানে সে ঘুরে বেড়ায়, ঘরে বন্দি হয়ে থাকা তার স্বভাব নয়।

তখন একদল নারী পুরুষ তাদের কোনো আত্মীয়কে কাফন দাফন করে গেট থেকে বেরিয়ে আসছিল। তাদের অশ্রুসিক্ত ও শোকাহত শরীরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে গেটের ভেতর ঢুকে যায় শফীউল্লা। মেয়েরা যারা ছিল, তাদের মধ্যে যারা কম বয়সী ছিল, দু চারজন, তারা সালোয়ার কামিজ পরেছিল, আর মাথায় ওড়না চড়িয়েছিল। বাতাসে ওড়না উড়ে যাচ্ছিল তাদের। আর বিবাহিত নারীরা বোরখা পরে এসেছিল। তাদের মুখের পর্দা মাথার ওপর তোলা ছিল সকলের। কাঁদতে থাকার জন্য আপেলের মতো মুখগুলো শিশিরস্নাত গোলাপের মতো মনে হচ্ছিল শফীর। তারা বেসামাল কান্নার ভেতর ছিল বলে, তাদের কারুর সঙ্গে গায়ে গা ঠেকে যেতে পারত তার। ছোঁয়া বাঁচিয়ে নিজেকে খানিকটা ছিটকে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে শফী। মুখের ওপর থেকে তোলা বোরখার পর্দা হাওয়ায় উড়ে গিয়ে শফীউল্লার কাঁধের ওপর ছোবল মেরেছে। দু-একজনের মাত্র। পুরুষরা মুর্দা বয়ে আনার খাট বের করছিল। তাদের কারুর হাতে মুর্দা চাপা দিয়ে আনা শানদার চাদর, কারুর হাতে গোলাপ পানি ছেটানোর গোলাপপাশ, ধূপদানি। একটা সুরভির হাওয়া সঙ্গে করে নিয়ে যেন তারা চলে গেল।

গোরস্থানের গেটের চত্বরে ঢুকে দেখতে পায়, সদ্য জানাজা শেষ করে আর একটা মুর্দা নিয়ে একটা দল চলেছে কবর দিতে। তখনও আলো ততটা মরে আসেনি। গোরস্থানের গাছে গাছে পাতায় পাতায় নরম পাতলা আলো লেগে রয়েছে।

মুর্দাকে কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছিল খাটের পেছনে পুরুষদের একটা দল। যারা মুর্দার নিকট-আত্মীয় ছিল তারা একজনকে সরিয়ে অন্যজন অনবরত খাটে কাঁধ দিচ্ছিল। দলের পুরুষরা জোরে জোরে দোয়া পড়ছিল। মেয়েরা একেবারে শেষে ছিল। সামনের মেয়েদের পেছনের মেয়েরা কাঁধ ধরে ধরে চলছিল।

শফীর মনে এল মাইয়েতকে কাঁধে নিয়ে কেউ যদি চল্লিশ কদম হাঁটে, তাহলে তার চল্লিশটা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু অন্য মৃতের খাটে তো সে কাঁধ দিতে পারে না! দিতে পারত, কিন্তু অনুমতির প্রয়োজন হত। কবরস্থানে এসে অনুমতি নিয়ে মাঝে মাঝে খাটে কাঁধ দিয়ে থাকে শফী।

মেয়েরা ফিরে আসছিল। তারা একেবারে কবরের গোড়ায় যেতে পারেনি। যাওয়ার নিয়মও নেই। মৌলবির ঘরের লাগোয়া বড় রোয়াক আছে। তার ওপর চারপাশে চারটে থাম, ওপরে গম্বুজওয়ালা ছাদ। এই রোয়াকে সাধারণত মাইয়েতের রিস্তেদাররা এসে বসে। চকচকে সিমেন্ট করা তেলালো মেঝে। মেয়েদের ফিরে আসতে দেখে ভেতর দিকের থামের আড়ালে গিয়ে বসে শফী। মৌলবিকে তার দরকার। কারবালার মসজিদেই না হয় নামাজটা পড়বে মৌলবির সঙ্গেই। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে কোনো মুর্দা যে এসে পড়বে না, কে বলতে পারে। মৃতের

জানাজার নামাজ পড়তে আর কবরে শোয়াতে কাদের মওদুদি মৌলবির সময় থাকে না, গল্পগাছা করার।

এদিকে মেয়েদের দলটা ফিরে এসে বসেছে রোয়াকে। অদ্ভুত কান্না আর ফোঁপানি তাদের। দু চারজন তাদের থামাচ্ছে, প্রবোধ দিচ্ছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে। তারা এই বলে কান্না থামাচ্ছিল যে যদিও তাদের প্রিয় মানুষটা স্বপ্নে দেখা দিত, এত কাঁদলে তাহলে আর দেখা দেবে না। যত কম কাঁদবে স্বপ্নে দেখা পাবে, যত বেশি কাঁদবে স্বপ্নে দেখা যাবে না। মেয়েদের এই কান্নার বাসরে প্রকাশ হতে পারে না শফী। তেমনি থামের আড়ালে লুকিয়ে থেকে নানা জনের কান্নার নানা স্বর, ইনোনো-বিনোনো, হেঁচকি, ফোঁপানি, আর্তরব তুলে নেয় শফী তার কানে। একেবারে তাদের গায়ের কাছে আছে কিনা! তারাও শফীকে দেখতে পায়নি, শফীও তাদের দেখতে পায়নি। একদল মেয়েরা পুরুষের অসাক্ষাতে থেকে কীভাবে কাঁদে, সেই অভিজ্ঞতা হয়। আর পুরুষদের অসাক্ষাতে কান্নার অন্য এক ধরনও আছে। অন্য রকম ভাষায় যেন তারা কাঁদে। যেন মনে হয় শফীর, তাদের এই কান্না শুনে তাদের ব্যক্তিগত গোপনতা নষ্ট করছে। সে আছে জানতে পারলে অন্য রকমভাবে কাঁদতো। শফীর ভয় হচ্ছিল, যদি ধরা পড়ে যায়, যদি কেউ দেখে ফেলে? তখন কেউ ক্ষুব্ধ হয়ে যদি গালমন্দ করে বসে তাতে তার কিছু করার নেই। খানিকটা ভয় পেয়ে থামের আরও আড়াল হয়ে পড়ছিল সে। কে এ লোকটা চেনার আগে ক্ষিপ্ত হয়ে কেউ যদি পায়ের চটি ছুঁড়ে মারে শফীকে? শফীকে চিনতে পারলে কেউ কিছু বলবে না, সসম্ভ্রমে চুপ করে যাবে।

কবরস্থান থেকে পুরুষদের ফিরে আসার গুঞ্জন ক্রমশ এগিয়ে আসছে, আর এদিকে মেয়েদের কান্নার স্বর ও ধরন অদ্ভুতভাবে বদলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে এবারে তাদের এই কান্না পুরুষদের শোনানোর জন্য, নিজেদের জন্য এই কান্না নয়। পুরুষরা তাদের কাছে চলে এলে, তারা রোয়াকের স্পর্শ ছেড়ে ধেয়ে যাওয়ার ভঙ্গি করে থেমে যায়। মেয়েদের দলটা পুরুষদের প্রতি তাদের নির্ভরশীলতা বোঝায়। যেন তারা এখানে পুরুষদের ছেড়ে থেকে নিরাশ্রয় ছিল, ব্যাকুলভাবে তাদের অপেক্ষা করে থেকেছে যেন, যেন তারা নিজেদের মতো করে এই রোয়াকে থাকেনি, কাঁদেনি, কথা বলেনি, একে অপরকে সান্ত্বনা দেয়নি।

পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের দলটা চলে গেল ঝেঁটিয়ে।

যদিও গোরকোনরা, যারা কবর খুঁড়েছে, তারা এখনও পরিপাটি করে কবর লেপা-পোঁছা করছে। তারা কাজটা ভাল মতো করছে কিনা দেখার জন্য মুর্দার রিস্তেদারদের দু একজন হয়তো বা ওখানে থেকে গেছে।

ক্রমশ বিকেলের আলো মরে আসা গোরস্থান এই সবে শুনশান হয়ে উঠেছে। গাছে গাছে বাতাসের মর্মরধ্বনি উঠে আসছে। পাখিদের গাছে গাছে ফেরার কিচির-মিচির আর এ গাছ থেকে ও গাছে মৃদু ওড়াউড়ি চলছে। সন্ধ্যা নামবে আর একটু পরেই। কাদের মওদুদি আসছে কিনা থামের আড়াল থেকে শফী যেই মুখ

াড়িয়েছে, অমনি শিউরে ওঠে। এক অলৌকিক দৃশ্য যেন তার দেখার মধ্যে ধরা দিল। রোয়াকের ওপর দুজন বোরখা পরা মেয়েলোক বসে আছে দেখতে পায়। তারা মেয়েদের দলেই ছিল, অথচ তাদের দলের নয়, দলের সঙ্গে হয়তো বা মিশে গিয়ে কেঁদেছিল, কিন্তু তাদের কেউ ছিল না। দলটা চলে যাওয়ার পর, এরা যে তাদের থেকে আলাদা, বোঝা যায়, এরা যে অন্য কিছুর জন্য বসে আছে বাঝা গেল। উদ্দেশ্য এদের পৃথক।

কাদের মৌলবি এতক্ষণ পেচ্ছাপ করে, পেচ্ছাপে পানি নিয়ে, হাত মুখ ধুয়ে ওজু করে ফিরছিল। সামনের কল-বাথরুম থেকে গলায় জড়ানো হাজি গামছা টেনে হাত মুখ মুছতে মুছতে এগিয়ে আসে। তারপর পিরানের ঝোলা পকেট থেকে টুপিটা বের করে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে মাথায় পরে। মেয়েলোক দুটির দিকে চোখ পড়তেই প্রথমে অলৌকিক কিছু দেখার মতো ভয় পায়। তারপর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে তাদের কাছে আসে। 'বল কী কাম তোমাদের?'

একজন বয়স্কা ও আর একজন তার চেয়ে কম বয়সী মেয়েমানুষ। বয়স্কা কম বয়সীকে ঠেলা দিয়ে বলে, 'বল্ না।'

কম বয়সী বলল, 'না, তুমি বল।'

'বাপজি, এ মেয়ে আমার বোনঝি, এক বছর হল বোনঝির স্বামী এন্তেকাল করেছে, কবরের জিয়ারত করতে এয়েচি। এখেনেই বুন-জামাইয়ের কবর। আজ নিয়ে এক বছর হল মরেছে। বোনঝির শখ কবর জিয়ারত করাবার।'

'কেউ পুরুষমানুষ নেই তোমাদের সঙ্গে?'

'না। কুনু পুরুষমানুষ নেই আমাদের। আমার স্বামী অনেক আগেই মরেছে। বাঁজা ছিনু, বোনঝির ঘরজামাই আমার ঘরেই বসিয়ে ছিনু।'

'থাক কোথায়?'

'লিচু তলা, খাল পোলটার সামনে।'

'নাম কি?'

'বোনঝির নাম শাহনাজ বেগম।'

'আহ্ ওর স্বামীর নাম বল, ওর নাম কে শুনতে চেয়েছে?'

অমনি ফিক করে হেসে উঠল শাহনাজ। শাহনাজ তার খালার পেছনে বসেছে, খানিকটা মৌলবির দেখার থেকে নিজেকে আড়াল করে। আর রোয়াকে উঠে বসেছে সে। নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে সহবতের সঙ্গে বসেছে, তাই তার বোরখার ভেতর থেকে বাঁ পা-টা বেরিয়ে এসেছিল, ধবধবে ফরসা কোমল লাবণ্যে ভরা পা খানি।

'বোন-জামাইয়ের নাম কাজী মহরম।'

'কবর চেন কেউ?'

'বোনঝি চেনে।'

'দূর থেকে মুঠো তুলে দেখিয়ে দিলেই হবে, আঙুল উঁচিয়ে দেখাবে না খবরদার! লাগবে। পঞ্চাশ টাকা।'

'তাই দোব মৌলবিসাহেব।'

বিধবা শাহনাজের পায়ের রূপ দেখে চমকে ওঠে শফীউল্লা। মুখের পর্দা তুলেই ছিল, মাঝে মাঝে পাশ ফিরে তাকাচ্ছিল, লজ্জা-সম্ভ্রম দেখাতেই মৌলবির দেখার দিক থেকে নিজের মুখটা ফিরিয়ে নিচ্ছিল, তখনই শফী শাহনাজের মুখ আর রূপ দেখতে পায়। অপরূপ সুন্দরী। শফী দেখতে দেখতে বিমুগ্ধতার ভিতর দিয়ে খোয়া যেতে থাকে। মৌলবি শাহনাজ আর তার খালাকে নিয়ে কবর চিনতে যাচ্ছে, কবরের জিয়ারত করতে যাচ্ছে। শফীউল্লা বাস্তবতা থেকে খোয়া যেতে লেগেছে। গাছের শাখা-প্রশাখা পাখির কিচির-মিচির শব্দের মধ্যে খোয়া যেতে থাকে, খোয়া যেতে থাকে গাছে-পালায় লুটিয়ে পড়া বাতাসের শব্দের ভিতর।

একটা অন্য ভূখণ্ড, বহু বহু বছর আগের কোনো বিগত সময় জেগে উঠছে। একটা আকাশ। শূন্যে একটা সিংহাসন উড়ে চলেছে। সেই সিংহাসনে বসেছিলেন সোলেমান পয়গম্বর। পাশে থাকা সভাসদগণ জিন পরী তাদেরকেও উড়িয়ে নিয়ে চলেছিল সিংহাসনটা। সোলেমান পয়গম্বর পাখিদের ভাষা জানতেন। পাখিরাও ছিল তাঁর অনুগত। তাঁর উড়ন্ত সিংহাসনটা শূন্যে হাওয়া ভরে উড়ে যাচ্ছিল, সিংহাসনের ওপরে শূন্যে বিশাল এক পাখির দল উড়ে উড়ে যাচ্ছিল, সিংহাসনের ওপরে ছায়া ফেলতে ফেলতে।

কিন্তু সেদিন সোলেমান পয়গম্বর তেমন ছায়া অনুভব করছিলেন না, রোদের তাপ এসে লাগছিল তাঁর গায়ে। তিনিই এই অনুভব পেলেন। ভাবলেন, নিশ্চয় কোথাও কোনো গোলমাল আছে। ছায়া করে করে উড়তে থাকা পাখিদের দিকে তিনি চোখ তুলে তাকালেন, কিন্তু সেই পাখিদের মধ্যে তাঁর প্রিয় 'হুদ হুদ' পাখিকে দেখতে পেলেন না। তিনি জানতে চাইলেন, হুদ হুদ কোথায় গেছে?

হুদ হুদ-এর খোঁজে গেল একজন দৈত্য, তার নাম একাব। একাব উড়ে চলেছে আকাশে। হুদ হুদকে খুঁজে এনে হাজির করবে। উড়তে উড়তে চলল দৈত্য, খানিকটা যাওয়ার পর আকাশেই দেখা পেয়ে গেল হুদ হুদের। 'আরে তুমি তো দেখছি মহা ঝামেলায় ফেললে!'

'কেন, কী হয়েছে?'

'মহারাজ তোমাকে দেখতে না পেয়ে রেগে গেছেন। এখন তুমি বলছ, কেন কী হয়েছে? আমাকে পাঠালেন তিনি, খুঁজে ধরে আনতে। তুমি তাঁর কত প্রিয় পাখি, তোমাকে দেখতে না পেলে তিনি ভীষণ চটেন।'

'চল যাই।'

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

হুদ হুদ কোনো জবাব দিল না, উড়ে উড়ে ফিরতে লাগল একাব দৈত্যের সঙ্গে।

সম্রাটের কাছে গিয়ে হুদ হুদ পাখি শোনাল এক কথা, সিবা রাজ্যের রানী বিলকিসের খবর এনেছে সে। যে কিনা বাদশার যোগ্য পাত্রী। আমাদের এই আরবের এয়ামন রাজ্যেই বিলকিসের রাজত্ব। অপরূপ সুন্দরী সে।

এই কিস্‌সার পরের ঘটনাক্রম শফীউল্লার মধ্যে ঘটতে থাকে। আর সেই বিলকিসের প্রাসাদে উড়ে গিয়ে, গবাক্ষের ভেতর দিয়ে বিলকিসের শয়নকক্ষে ঢুকে যায় হুদ হুদ। সেই সময় শাহনাজ বেগম খালাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর কবরের সন্ধান করতে চলে গেছে, পাশে পাশে চলেছে মৌলবি কাদের মওদুদি। ঘুমন্ত বিলকিসের বুকের ওপর সম্রাটের পত্রখানি ফেলে দিল।

শাহনাজকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তার খালা। এই মুহূর্তে কবর চেনাতে গিয়ে স্বামীর স্মৃতিতে মেদুর হয়ে পড়েছে, নরম হয়ে পড়েছে। কবরের পর কবর, চারপাশে কবর। বুনো ঘাস লতাগুল্মে আর অনবরত ওলোট-পালট হওয়া মাটির এক ধরনের বুনো মরচে পড়া গন্ধ সারাক্ষণ বাতাসে ভরে আছে। শাহনাজকে ধরে রাখে তার খালা, কিন্তু খালাকে সে টেনে নিয়ে যায়, কেন না সেই তো জানে, কোথায় আছে কবরটা। বিবি কোনখানে এসে থেমে যাবে তার অপেক্ষা করছে কাদের মৌলবি। দু চারটে রাস্তার বাঁক তারা পেরিয়ে এসেছে। দু পাশে সারি সারি কবরের মাঝখান দিয়ে ইটের সরু রাস্তা ঢুকে ঢুকে গেছে। পুরনো কবর মিশমার করে দিয়ে নতুন কবরের জন্য হাড়গুলো সরিয়ে ফেলা হয়, নিয়মিত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এই গোরস্থানে।

না হলে এই এলাকায় জঙ্গল হাসিল করে বসবাস পত্তন হওয়ার সময় থেকে প্রত্যেক মৃতের জন্য দু গজ জমি দিতে দিতে, সম্পূর্ণ মেটিয়াবুরুজ গার্ডেনরিচ এতদিন গোরস্থান হয়ে যেত। না হলে রামনগর থেকে রবীন্দ্রনগর, রাজাবাগান থেকে সন্তোষপুর, আক্রা ফটক, হাজিরতন, বড়তলা, মুদিয়ালি, ফতেপুর, ধানখেতি, কাঁচি সড়ক, বদরতলা, পাঁচপাড়া, কাঁটালবেড়িয়া, কানখুলি, পাঁচুড়, পাহাড়পুর, লিচুবাগান, পানিকল, কারবালা সব কবর হয়ে যেত।

গত বছর এই দিনে দাফন হওয়া স্বামীর কবরটা খুঁজতে যাচ্ছে শাহনাজ। একটা গাছ সে চেনে, একটা বাঁকা খেজুর গাছ, তার উত্তর দিকে সাতটা কবরের পরে তার স্বামীর কবর। মুঠো উঁচিয়ে মৌলবিকে দেখিয়ে দিয়ে তেমনি তার খালার কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে ওই কবরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আরও কান্না উথলে তুলছিল। চেরাগের এতটুকু নরম শিখার মতো সেই কান্না কবরস্থানের ভেতর হাজার হাজার কবরের চারপাশের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া পড়ে কাদের মৌলবি। শাহনাজের মৃত স্বামীর আত্মার মাগফেরাতের জন্য মোনাজাত করে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই মোনাজাত করে মৌলবি। এতদূরে কবরস্থানের গেটের সামনে বসে শফীউল্লা সেই মোনাজাত, প্রার্থনা শুনতে পায়। প্রাক সন্ধ্যার ক্রমশ আলো ফিকে হতে থাকা নির্জনতার ভেতর, কবরের পরিব্যাপ্ততার দৃশ্যের বাস্তবতায়, কাদেরের মোনাজাত ধ্বনিত হতে শোনা যায়, শাহনাজের মিহি কান্নাবব প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। কাদের চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মোনাজাত করতে করতে কেঁদে থাকে, শাহনাজের কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। 'আল্লা পরওয়ার দিগার এমন বিবি থাকতে থাকতে তার স্বামী কাজী মহরমকে

তুমি কেড়ে নিলে? আল্লা তোমার কাছে শোকর, যা কর তুমি, ভাল কর, তুমি পরম দয়ালু, তুমি এ লোকটাকে বেহেস্তে ঠাঁই দিও আল্লা। কাজী মহরম নবি রশুলের উম্মত, তুমি তার ভাল কর আল্লা। দোজখের আগুন থেকে তাকে বাঁচাও।' ডুকরে ওঠে মৌলবি।

মোনাজাতের কথার ভেতর কান্নাতে আরও আক্রান্ত হয় শাহনাজ। খালা তাকে থামাতে পারে না, সামলাতে পারে না, তার হাত থেকে মোমের মতো গলে পড়ছে যেন। তার কান্না গোরস্থানের এ গাছ থেকে ও গাছে ধ্বনিত হতে থাকে, এ কবর থেকে ও কবরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাতাস একদিক থেকে অন্য দিকে বয়ে নিয়ে যায় তার কান্না।

শরাহিল দৈত্যের কন্যা বিলকিস, অপরূপ সুন্দরী সে, চোখ ঝলসে যাবে তার রূপে। ঘুম ভাঙতেই বিলকিস বুকের ওপর সম্রাটের পত্র পেলেন। সোলেমান পয়গম্বর তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। রাজ আমাত্যদের ডেকে পত্রের কথা জানালেন বিলকিস। কিন্তু এ পত্র কীভাবে তাকে দেওয়া হয়েছে, তিনি জানেন না। ঘুম ভাঙতেই বুকের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে। পত্রে জানিয়েছেন যে বিলকিস সূর্য পুজো ছেড়ে যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে, তাহলে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করা হবে। বিলকিসের সামরিক বাহিনী কম ছিল না। কিন্তু সোলেমান আল্লার নবি কিনা যাচাই করার জন্য কয়েকটি সোনা ও রূপোর ইট ও কিছু মূল্যবান পাথর উপঢৌকন হিসেবে সোলেমানের কাছে পাঠাতে মনস্থ করলেন। বিলকিস যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে, এই উপহার পাঠাচ্ছেন, তিনি যদি নবি হন, তাহলে অমুসলমানের এই উপহার তিনি গ্রহণ করবেন না। আর যদি শুধু বাদশাই হন, তাহলে এই উপহার গ্রহণ করে বিলকিসকে বিয়ে করার সুবিধে মনে করবেন।

হজরতের কাছে দূত এসে জানাল, বিলকিসের কাছ থেকে উপহার এসেছে।

কিন্তু উপহার যারা এনেছিল বয়ে, তারা দেখল প্রাসাদ, রাজ দরবারের দেওয়াল পর্যন্ত সোনা দিয়ে মোড়া, রুপো দিয়ে ঢালাই করা। রাজদরবারে সোনা রুপো মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি। সম্রাট উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন, জানালেন, আক্রমণ করবেন তিনি সিবা রাজ্য।

শুনে বিলকিস জানালেন, সামরিক শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে তিনি তো আত্মসমর্পণ করতে পারেন না, শুধু তাই নয়, তাকে ইসলাম ধর্মে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তিনি যদি নবি হন, তাহলে এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দেখান, সেই পরিচয় পেলে তবেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন।

তখন তিনি এক হাজার বাঁদী ও গোলামকে একই রকম পোশাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সোলেমানের দরবারে পাঠাতে বললেন। কৌটোয় ভরে দিলেন কিছু এয়াকুত পাথর, কয়েক হাজার তেজী ও অলস ঘোড়া পাঠালেন। আর একটা শূন্য বোতল পাঠালেন। দূত মারফত সোলেমানকে জানালেন, এই এক হাজার

বাঁদী ও গোলামকে আলাদাভাবে সনাক্ত করে দিতে। লোহা ও হীরের শলাকা ছাড়া এয়াকুত পাথরগুলি মাঝখান থেকে হার গাঁথার জন্য ছিদ্র করে দিতে হবে। আর ঘোড়াগুলোর ভেতর থেকে কারা পরিশ্রমী আর কারা অলস ভাগ করে দিতে হবে। আর এই বোতলটা এমন কোনো পানি দিয়ে ভরে দিতে হবে, যে পানি আকাশ থেকে পড়েনি।

সে সব কিছু সোলেমানের দরবারে যথারীতি এসে পৌছল। তিনি প্রথমেই বাঁদী ও গোলামদের হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তখন বাঁদী যারা ছিল, তারা হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে ফেলল, গোলামগুলো শুধু আঙুলগুলি। নারী পুরুষের হাত ধোওয়ার সহজাত স্বভাবের পার্থক্য দিয়ে সহজেই তিনি গোলাম বাঁদী কারা চিনিয়ে দিতে পারলেন। যেসব কীট পাথর ছিদ্র করতে পারে, তেমন এক কীটকে আদেশ করতেই এয়াকুত পাথর ছিদ্র করে দিল তক্ষুনি। কেন না কীট পতঙ্গ পোকা মাকড় পশুপক্ষী তাঁর অনুগত ছিল, বশ ছিল দেওপরী জিন দৈত্যরাও।

তারপর ঘোড়াগুলোকে পর পর বেঁধে দিয়ে তাদের দানাপনি দিতে আদেশ করলেন। যে ঘোড়াগুলোর তর সইছিল না, দ্রুত দানা খেতে গেল, তারা অলস ঘোড়া, আর যারা ধীরে-সুস্থে দানা খেতে লাগল, তারা পরিশ্রমী ও তেজী ঘোড়া। তারপর তিনি ঘোড়াগুলোর ওপর সওয়ার তুলে তাদের দৌড়ের নির্দেশ দিলেন। ঘোড়াগুলো ছুটতে ছুটতে ভীষণ রকম ঘেমে গেল, ঘোড়াগুলোর সেই ঘাম দিয়ে বোতল ভর্তি করে পাঠিয়ে দিলেন বিলকিসের কাছে।

দূত গিয়ে বিলকিসকে সব জানাল। সোলেমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তিনি খাঁটি নবি, বিলকিসের আত্মসমর্পণ করাই উচিত হবে। অতঃপর বিলকিস সোলেমানের রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন, সঙ্গে একশো বাঁদী আর কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে। যাত্রার আগে বিলকিস তাঁর বিখ্যাত সিংহাসন, ধনরত্ন মহলের ভেতর রেখে বাইরে থেকে তালা মেরে দিলেন। চাবিগুলো নিজের কাছে রেখে দিলেন।

বিলকিস আসছেন, সেই খবর সোলেমানকে বাতাস এসে আগেই জানিয়ে দিয়ে যায়। বিলকিস তাঁর সেবা করতেই ছুটে আসছেন। বাতাস এই খবর দেওয়ার আগে দেও ও জিনরা বিলকিস সম্বন্ধে সোলেমানের কাছে এই তথ্য বর্ণনা করেছিল যে বিলকিসের পায়ের গোড়ালির ওপর কেশ আছে, আর বিলকিসের মা পরী বংশোদ্ভূত হওয়ার জন্য বিলকিস তেমন বুদ্ধিমতী নয়। সাধারণত পরীরা সুন্দরী হয় বটে, কিন্তু বোকা। ভান বাম কোনো জ্ঞানই নেই। দেও দৈত্য জিনরা বিলকিস সম্বন্ধে বাদশার কাছে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছিল। তাদেরকে হজরৎ বশ করেছে বলেই না তারা বশ, না হলে তো সোলেমান পয়গম্বর তাদের শত্রু।

সত্যি সত্যি বিলকিসের পায়ের গোড়ালির ওপর কেশগুচ্ছ আছে কিনা, সত্যি সত্যি বিলকিস বোকা কিনা, বিলকিস আসা মাত্র তা জেনে যেতে পারেন যাতে, তার ব্যবস্থা করলেন সোলেমান। বিলকিসকে যে সিংহাসনে বসতে দেওয়া হবে, তার সামনে একটা কুঁয়ো খুঁড়ে রাখলেন। কুঁয়োর ওপর আরশি পাতা এক পুল

বানিয়ে দিলেন, আরশিতে মাছের ছবি এঁকে দেওয়া হল। তারপর কুঁয়োর ওপর সেই আরশির পুলটিকে এমনভাবে বসানো হল যে. যেন মনে এই বিভ্রম তৈরি হবে, কুঁয়ো দিয়ে নেমে তবে সিংহাসনে যেতে হবে! কুঁয়োয় নামতে গিয়ে কাপড় তুললেই পা ও গোড়ালি দেখা যাবে, সত্যি সত্যি গোড়ালির ওপর কেশগুচ্ছ আছে কিনা নিজের চোখে দেখে নেওয়া যাবে।

কিন্তু চালাক না বোকা জানার জন্য কী ব্যবস্থা করবেন তিনি? সে ব্যবস্থা করার আগেই সমস্যা দেখা দিল বিলকিসকে কোথায় বসতে দেবেন, কোন সিংহাসেন তিনি বসবেন? বিলকিস যে সিংহাসনে বসেন তাঁর তুল্য সিংহাসন সম্রাটের প্রাসাদে নেই। বিলকিসের সমতুল সিংহাসনে বসতে না দিলে সোলেমানের মান থাকে না। অথচ তেমন সিংহাসন বানাবার মতো সময় নেই হাতে, বিলকিস রানী এসে পৌঁছলেন বলে।

অতঃপর বিলকিসের সিংহাসনটাই উড়িয়ে আনতে বললেন তিনি। সম্রাট তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, এইটুকু সময়ের মধ্যে সিংহাসনটা এনে দিতে পারে এ কথা ইফ্রিত দৈত্য জানাল। সম্রাট দৈত্যকে না পাঠিয়ে তাঁর প্রধান উজিরকে পাঠিয়ে পলকের মধ্যে বিলকিসের সিংহাসনটা আনালেন। বিলকিসের সিংহাসনে যেসব পাথর বসানো ছিল. সেগুলো খসিয়ে ফেলে বহু মূল্য মণি-মুক্তো রত্নরাজিতে খচিত করে দিলেন, বিলকিস যদি নিজের সিংহাসনটা চিনতে পারেন, তাহলে সত্যিই তিনি বুদ্ধিমতী।

সিংহাসনের দিকে যেতে গিয়ে বিলকিস কুঁয়োর কাছে এসে যথারীতি কাপড় তুললেন। সোলেমান দেখলেন পায়ের গোড়ালির ওপর কোনো কেশগুচ্ছ নেই। দৈত্যরা বদমায়েসি করে তাঁর মন টলাতে চেয়েছিল। বাদশা বলে উঠলেন, 'আরে কী করছেন, ওতে তো বিন্দুমাত্র পানি নেই, পোশাক ভিজবে না আপনার।'

বিলকিসের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সিংহাসনে উঠে এসে বসলেন বিলকিস। নিজের সিংহাসনটি চিনতে পারলেন। বিলকিস সুন্দরী শুধু নয়, বুদ্ধিমতীও।

বিলকিসকে পয়গম্বর বিয়ে করলেন। তাঁর তিনশো বিবি ছিলেন, আর সাতশো ছিলেন হারেমের দাসী। তাঁদের মধ্যে বিলকিসকেই তিনি পাটরানী করেছিলেন।

একটু একটু করে বাস্তবতা ফিরে পায় শফীউল্লা। সে এতক্ষণ সিবা রাজ্যের রানী বিলকিসের কাহিনীতে চন্দ্রাহত হয়েছিল। খোয়া গিয়েছিল সাম্প্রতিকের থেকে। বহু বছর আগের অতীতে মরুভূমির দেশ আরবের ভূখণ্ডে চলে গিয়েছিল। সে যে গোরস্থানে এসে বসেছিল, ভুলে গিয়েছিল।

২

মেয়েলোক দুজন বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে কাদের মওদুদিও মোটা শরীরে হাঁসফাঁস করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিল, বাইরে পাড়ার মসজিদে তখন আজান

দিয়ে দিয়েছে। তাকেই নামাজ পড়াতে হয়, মসজিদের ইমামও বটে সে। এই মেয়েলোকটার স্বামীর কবরের জিয়ারত করতে গিয়ে আজান পড়তে তবে তাকে ছুটতে হচ্ছে। গোরস্থানের গেটের বাইরে বেরিয়ে এসেছে সবে, অমনি পেছনে পায়ের শব্দ জেগে উঠল সহসা। আচম্বিৎ এক ভয়ের শিহরন গ্রাস করে ফেলল কাদেরকে। গোরস্থানে কেউ নেই, অথচ ভেতর থেকে কে বেরিয়ে আসছে? ভুল কবরে জিয়ারত করার জন্য মেয়েলোকটির মৃত স্বামীর রুহু তার পেছন নেয়নি তো? গোরকোনরাও কেউ নেই! এত মানুষের কবর দেয়, এত মৃত মানুষের মুখ দেখে,—কবরে মৃতকে শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়ার আগে সেইই তো মৃতের মুখ দেখে, অন্য কেউ কবরে নেমে, মুখের কাপড় খুলে তাকেই তো তিনবার দেখায় মৃতের মুখ, সে দোয়া পড়ে। সেই কবরে প্রথমেই তো সে মাটি চাপা দেয়।

গোরকোনদের মতো সাহস তার নেই। তারা রাত-বিরেতে এসে গোরস্থানে কবর খুঁড়ে যায়। ওদের সাহসেই তার সাহস। তার মতো এমন ভীতু মানুষ সে কিনা এত বড় একটা গোরস্থান সামাল দিচ্ছে। কাফন-দাফন থেকে কবর জিয়ারত সবকিছু। সন্ধ্যার পরে একা কখনও গোরস্থানের গেটের ভেতরে ঢোকে না। ঢোকে তখনই কোনো মাইয়েত এলে, কেন না মাইয়েতের সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজনরা থাকে, গোরকোনরা থাকে। গেটের বাইরে অনেক রাত পর্যন্ত গোরকোনরা থাকে। লাশ আসার খবর আগে থেকেই বাড়ির লোকরা জানিয়ে যায়, যাতে গোরকোনরা কবর খুঁড়ে রাখতে পারে। রাতে গোরস্থানের বাইরে রোয়াকে পান বিড়ির দোকানের সামনে, চায়ের দোকানে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, বাড়ির লোক তাদের কাছে প্রথমে খবর দিয়ে যায়। গোরকোনরা কবর খুঁড়তে লেগে যায়। কাদেরকে সেই সঙ্গে খবর দিয়ে দেয়। লাশ এলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে কাদের মওদুদি। কবরস্থানে চারপাশে লাইটপোস্ট আছে যদিও, সেগুলো সারা রাত জ্বলে, গেটের ওপর জ্বলে আলো। রাতে কবর খুঁড়তে হলে তার দিয়ে লাইন টেনে মার্কারি আলো জ্বালায়।

পেছনে শফীউল্লাকে দেখে অতর্কিতে ভয় পাওয়া দূর হয় কাদের মৌলবির। লোকটার ভয় ডর নেই, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। অথচ জ্ঞানীগুণী মানুষ, ধনী, ধর্মপ্রাণ। কিন্তু বেখাপ্পা সব প্রশ্নে জেরবার করে ফেলে। তার মতো মানুষ এড়িয়েই চলতে ভালবাসে শফীউল্লাকে। কিন্তু যার দাদা এতদ অঞ্চলে অতবড় ধনী, তার ভাইকে মুখোমুখি এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়। লোকটা নামাজ পড়তে মসজিদে তার পেছু পেছুই আসছে। কদিন ধরে আসা যাওয়া করছে, ইচ্ছে, তার সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনা করার। কিন্তু দিনেরবেলা যখনই আসে, তখনই কাফন-দাফন জানাজা জিয়ারতে ব্যস্ত থাকে বলে বেঁচে যাচ্ছে কাদের মওদুদি। আজ কখন এল টের পায়নি, গোরস্থানের কোথায় বসেছিল, দেখতে পায়নি কাদের মৌলবি। বেশি জানা লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার এই একটা বিপদ, সে কত কম জানে প্রমাণ হয়ে পড়ে। স্বীকার করে, শফীউল্লা তার চেয়ে অনেক বেশি জানে, কিন্তু তার তো তাতেই কাজ চলে যায়। কাফন-দাফন দেয় কবর জিয়ারত

করে, এমনকী মিলাদ মওলুদও ভাল মতো উতরে দেয়। মসজিদে পাঁচ অক্ত ইমামতি করে, জুম্মার নামাজও পড়ায়।

এতক্ষণ পেছনে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিল শফীউল্লা। মোনাজাত সেরে, ভিড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছিল, অমনি চোখে পড়ে যায় শফীর।

'আপনার জন্যেই তো বাদ আসর গোরস্থানে পড়ে আছি।'

'আরে শফী মিএগ্রা যে!' হাত বাড়িয়ে শফীর সঙ্গে মোসাফা করে কাদের। 'তারপর কী খবর? আপনার মতো আলিম মানুষের সাক্ষেৎ পাওয়া নসিবের কথা। আমার জন্য দোওয়া করবেন ভাইসাহেব।'

'দোওয়া আমার জন্যেও করেন মৌলবি সাহেব। আপনি নাকি মশালা দিয়েছেন, সব তালাকেই বিবিদের তিন ইদ্দতকাল দেখতে হবে?'

'বলেছি নাকি? ভুল আছে নাকি? কারে বলেছি?'

'হানিফ চাচাকে আপনি বলেছেন। আপনার সঙ্গে সেই নিয়ে কথা।'

'তাহলে বলে থাকতে পারি। আবার কোনো কোনো তালাকে বিবিদের তিন রজঃস্রাব তো দেখতে হয় নাকি? যেতি পেটে বাচ্চা থেকে যায়, তালাক হবেনি। আর একবার তালাক যেতি দেয় তো তিন ইদ্দত দেখে সেই বিবিকে নিয়ে আবার সংসার করতে পারে। একবারে যেতি টানা তিন তালাক দিয়ে দেয়, স্ত্রীর তিন রজঃস্রাব পেরিয়ে যাবার পর, দেখা যায় যে বিবি তার ঔরসের সন্তান ধারণ করে নেই, তকন তো তালাক হয়ে যায় নাকি? আর একবার করে যেতি তালাক দেয়, ইদ্দত দেখার পর, স্বামীর যেতি ইচ্ছা হয় স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করবার তবে ঘর করতে পারে, দুবার পর্যন্ত তালাক দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে ঘর কত্তে পারে, কিন্তু তিনবার তালাক দেবার পর ওই রজঃস্রাব দেখে বিবি যেতি গর্ভবতী না হয়ে থাকে, আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। বিবিকে, পুরা তিন তালাক হয়ে যাবে। এসবে রজঃস্রাব দেখতে হয় না নাকি? ভুল কিছু বলেছি?'

'আপনি বলেছেন হানিফ চাচাকে, সব তালাকেই ইদ্দত দেখতে হয়?'

'দেখতে তো হয়ই।'

'মূর্খ, কিছু জানেন না।'

'আমি মূর্খ এ কথা বলতে পারলেন?' এমনিতে কাদের মওদুদি নিরীহ প্রকৃতির, কিন্তু খেপে গেলে মাথার ঠিক থাকে না। 'যান যান, আপনার মতো শিক্ষিত অনেক লোক আমার দেখা আছে। কত কাফন-দাফন করছি আপনার মতো শিক্ষিত লোকের, আমার হাতেই গোর হচ্ছে। আর আমি কিনা মূর্খ?'

'আপনি মূর্খ নন তো কি শুনি?'

'আপনি তাহলে ছোটলোক!' মুখ ফসকে ছোট মুখে বড় কথা বলে ফেলে কাদের।

সটান একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেয় কাদেরের গালে শফীউল্লা। রাস্তায় লোক জমে গিয়েছিল, সকলের সামনে কাদের মৌলবির গালে থাপ্পড় মারে শফীউল্লা। 'আমি

ছোটলোক? ভুল মশালা শিখে বসে আছেন, আমি সংশোধন করে দিচ্ছি, আমিই কিনা ছোটলোক? আছে এমন তালাক, যাতে ইদ্দতকাল দেখতে হয় না। যে বিবির সঙ্গে স্বামী সহবাস করেন নি, তারে যেতি তালাক দেয়, ইদ্দতকাল দেখতে হয় না। জানেন না, শুধু শুধু তর্ক করে চলেছিলেন। হানিফ চাচাকে আপনি এ মশালা শুনিয়েছেন। আর আরও শুনে রাখুন, এক্ষেত্রে এক তালাকেই তালাক হয়ে যায়। তিনবার তালাক বলতে হয় না আর।'

মসজিদের সামনের রাস্তায় লোক জমে গিয়েছিল বিস্তর। দোকান পশারি হোটেল চা দোকান থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে মৌলবির সঙ্গে শফীউল্লার বিতর্ক দেখছিল। আর বেফাঁস কথা বলেছে বলে অতবড় শিক্ষিত লোকটার হাতের থাপ্পড় খেল মৌলবি। লোকে শুনল, মৌলবিরই ভুল, ভুল মশালা প্রচার করেছে। সম্ভ্রমের সঙ্গে শফীউল্লার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মানুষজন। এমন একটা লোকই মৌলবির পর্যন্ত ভুল ধরার ক্ষমতা রাখে।

'এই যে মৌলবি সেজে ভুল মশালা দিচ্ছেন, জানেন, আপনারাই প্রথমে দোজখে যাবেন।'

সকলের সামনে মাথা কাটা গেল কাদের মওদুদির। বিতর্কে হেরেও গেল, আবার থাপ্পড়ও খেল। মসজিদ থেকে মগরেবের নামাজ পড়ে বেরিয়ে এসেছিল, কি কুক্ষণে শফীউল্লার খপ্পড়ে পড়ল। কদিন ধরেই গোরস্থানে আসছিল, আজ সুযোগ পেয়েই মোক্ষম ঘা দিয়েছে তাকে। হেরে যাওয়ার পর একদম রাগ জল হয়ে যায় তার, মনে পড়ে যায়, এমন বড়লোকের বাড়ির ছেলেকে সে কিনা ছোটলোক বলেছিল? তারপর তারই ভুলের জন্য সকলের সামনে সে হেরে গেল, থাপ্পড়ও খেল? লোকের কাছে মুখ দেখানোই দায় হয়ে পড়বে। লোকে মানতেই চাইবে না আর তাকে। হঠাৎ বুদ্ধি খুলে যায় কাদেরের, হাত বাড়িয়ে ধরে শফীউল্লার দিকে। 'মাফ করে দিন ভাইসাহেব, মুখ ফসকে খারাপ কথা বেরিয়ে গিয়েছিল। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়, মরণকাল পর্যন্ত মানুষ শেখে।' তারপর লোকজনের কাছে নিজের মান ফিরিয়ে আনার জন্য চালাকি করে বলে, 'আপনার কাছে আমি শিখব, আপনিও আমার কাছ থেকে শিখবেন।'

কিন্তু এই ঘটনার কথা মুখে মুখে এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে যে শফীউল্লা কাদের মৌলবির ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। আর সকলের সামনে মূর্খ বলেছে। ধর্মের ভুল শিক্ষা দেওয়ার জন্য থাপ্পড় পর্যন্ত খসিয়েছে। এলাকায় শফীউল্লার মান্যতা আরও বেড়ে গেল।

যে লোকটা অমন উদাস আর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, খানিকটা অপ্রকৃতিস্থের মতো দেখায় তাকে। আসলে সে এলাকার কাদের মৌলবির থেকেও বেশি জানে। তার পাণ্ডিত্যই তাকে অমন ধ্যানস্থ করে রাখে। আর সে সাধারণ ঘরেরও নয়। শওকতউল্লার মতো ধনী ওস্তাগরের ছোটভাই। ব্যবসা করে নিজেও ভাল পয়সা করেছে। আলিশান বাড়িতে থাকে। এই মাঝবয়সে পৌঁছে শুধু যা বিয়ে করেনি।

কাদের মৌলবি প্রচুর আহত হয়েছে, কিন্তু হাসি মুখ মেলে রাখে সকলের সামনে। কতবার সে ঠোঁটে এই অভিযোগটা এনে ফেলেছিল যে ভাইসাহেব, তুমি যে এই মাঝবয়সে পৌঁছলে, বিয়ে করলে না, সেটা কি ধর্মসম্মত? বিয়ে করা তো ফরজ এ ব্যাপারে তুমি কী বলবে? যে বিয়ে করে না তার হাতের পানি পর্যন্ত হারাম। শফীউল্লার বিরুদ্ধে এমন মোক্ষম একটা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সাহস করে বলতে পারেনি, বলতে গিয়েও কতবার নিজেকে সামলে নিয়েছে অমন একজন পড়াশোনা করা আর রাগী লোকের জন্য সাহস করে বলতে পারেনি এর পরে যখন রাগের মুখে পড়বে, এই অভিযোগটা মোক্ষম মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবে কাদের মওদুদি।

৩

গোরস্থানে কাজী মহরমের ব্যাওয়া বিবি শাহনাজ বেগমের প্রথমে বাঁ পায়ের একটু অংশের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল শফীউল্লা, পরে বাঁ দিকের মুখের একটু অংশের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, তারও পরে বিধবাতে মুগ্ধ হয়েছে সে ওই মরা আলোর আগতসন্ধ্যায়। প্রথমত শাহনাজ বিধবা হওয়ার জন্য তার মুগ্ধতার যৌক্তিকতা অনেক বেশি তাকে দুর্বল করেছিল।

দ্বিতীয়ত সুন্দরী ; আরেকভাবে তাকে দুর্বল করেছে। বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করতে শুরু হয়ে গিয়েছিল তার।

সেই মেয়েলোক যতক্ষণ না কলমা পড়ে নিজের বিবি হচ্ছে, যার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে, বুকের ওঠাপড়া শুরু হয়েছে, তার প্রতি এই অনুভূতি বয়ে নিয়ে যাওয়ার অবসান না হচ্ছে, ততক্ষণ সে এক অন্যায়ও বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শফীউল্লা ধর্মের চোখে অন্যায় করে যাবে, নিজেকে এমন নীচে নামাতে পারে না। কোনো নারী, যে বিধবা সধবা পরস্ত্রী যা হোক না কেন ধর্মের চোখে তার দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকানো অন্যায়। বিয়ে করে নিলে অন্যায় হয় না। বিধবাদের বিয়ে করা সুন্নত।

এত বছর বয়সে, বিয়ে করতে হঠাৎ উৎসাহী হয়ে উঠল শফীউল্লা। প্রথম যৌবন থেকে তার এখন এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে, বিয়ে করার ব্যাপারে তেমন আগে কখনও এমন উন্মাদনা আসেনি, নির্বাচনও এমন লাগসই হয়নি। প্রথমত সে প্রেমে পড়ে যায় শাহনাজ বেগমের। এরকম প্রেমে পড়া গর্হিত কাজ। যতক্ষণ না বিয়ে করে নিচ্ছে, ওই নারীর প্রতি তার প্রেম ও প্রেমসঞ্জাত নানা কিছু আকর্ষণের অনুভূতিরও অবসান হচ্ছে না। উদ্ভূত প্রেমে পড়ার ঘটনা তার জীবনে বিশেষ একটি সংকট সৃষ্টি করেছিল। দ্রুত বিয়ে করে নেওয়াই তার পক্ষে উচিত হয়ে উঠেছে তাই।

আর এতদিন ধরে সে এক অন্যায় বহন করে নিয়ে চলেছে, তার জীবনে বিয়ে না করে। বিয়ের মতো অবশ্যকর্তব্য একটি কাজ কী করে যে তার নাগালের

বাইরে রয়ে গিয়েছিল, সে নিজেই জানে না। কোথায় যেন ভেতরে ভেতরে তার নিরুৎসাহ ছিল, এই তার ভাল লাগা ও নির্বাচনের ভিতর দিয়ে খানিকটা বুঝতে পারল, কোনো বিধবাকে বিয়ে করার ইচ্ছে ভেতরে ভেতরে ছিল তার। তেমন কোনো বিধবা, যে সুন্দরী হবে, আর সেই সুন্দরী বিধবাতে দুর্বল হয়ে পড়বে, তবেই তার বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ সে খুঁজে পাবে। শুধু আগ্রহ নয়, প্রেমে পড়া তার ঘটে গেল এই মধ্য চল্লিশ বয়সে, গোপনে গোপনে শাহনাজের রূপে সে মুগ্ধ হয়ে পড়ল।

যে সংকটে পড়েছে, যে প্রেমে পড়েছে, নারীর প্রতি যে মুগ্ধতা তৈরি হয়েছে, সে নারী যে একজনের বিধবা স্ত্রী, বিয়ে করার আগে পর্যন্ত এ ধরনের ভাব-অনুভব, আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা অত্যন্ত গর্হিত অন্যায়। এই কথা ভেবেই ধর্মে বিয়েকে অবশ্যকর্তব্য করা হয়েছে। বিয়ে করে মানুষ অনেক গোনাহ্‌র নাগাল থেকে রক্ষা পায়। অন্য নারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ব্যাপারটাকে প্রশমিত করা যায়, হৃদয় ও মনের চাঞ্চল্য দূর হয়। আর স্বামী স্ত্রী কাউকে না দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রেমালাপ করলে তার সওয়াব, নফল নামাজ পড়ার চেয়ে বেশি পুণ্যের কাজ হয়। অথচ এতদিন বিয়ে না করে জীবন কাটিয়ে এসেছে শফী। এই অবিবাহিত মধ্য চল্লিশের অতিবাহিত জীবনে কত অবৈধ দৃষ্টিপাত করেছে সে, কত চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে, তার বিয়ে করা কোনো নারী নয় এমন সব নারীর দিকে তাকিয়ে, পরস্ত্রীদের দিকে তাকিয়ে, সচেতনভাবে, অচেতনভাবে কত অন্যায় করে এসেছে সে।

বিয়ে না করার এ ধরনের মানসিক পাপ বয়ে নিয়ে গেছে, শুধু বিয়ে না করার পাপ, নিজেব অন্য কোনো রকম স্খালন ঘটায়নি তার জীবনে। সেজন্য তার পরিতৃপ্তিও ছিল। কিন্তু তার এই পবিত্রতার আড়ালে যে সে এক পাপ বয়ে নিয়ে চলেছিল, সে কথা কেন যে তার এতদিন মনে পড়েনি, এত শাস্ত্র পড়াশোনা সত্ত্বেও নিজের এই অন্যায়ের সন্ধান কেন যে পায়নি, শফীউল্লা অবাক হয় এ কথা ভেবে। কোনো নারীর সঙ্গে অবৈধ যৌন সংসর্গে নিজেকে লিপ্ত না করার সংকল্পে ও আত্মসংযমে নিজেকে ধরে রেখেছিল, কোনোভাবে তার স্খলন-পতন ঘটায়নি, এমন ভাল থাকার মধ্যে এতদিন সে পরিতৃপ্তি বয়ে নিয়ে গেছে, আর এখন শাহনাজের প্রতি মুগ্ধতা ও প্রেম অনুভব করার দুর্মর আকর্ষণের ভেতর দিয়ে ভাবছিল বিয়ে করার কথা, সেই অবসরে সে জানতে পেরেছে এতদিন তার বিয়ে না করার পাপ সে বয়ে নিয়ে এসেছে।

সে যে এত লোকের ধর্মশাস্ত্রের ভুল ধরিয়ে দেয়, অথচ তারা তো কখনও তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেনি। এমনকী গত দিন কাদের মওদুদির গালে থাপ্পড় মেরে কোনো একটি বিষয়ে লোকটার ভুল সংশোধন করে দিয়েছে, কাদের মৌলবি তাকে 'ছোটলোক' বলেছে, কিন্তু সেও তো এই মোক্ষম অভিযোগটা আনতে পারত, তার বিরুদ্ধে। এই ভুল, এতদিন, এত বছর কেন করল শফীউল্লা? কবরস্থানে, ওই বিধবার পায়ের একটু অংশের রূপ দেখে, মুখের একাংশের একটু

রূপ দেখে, মুগ্ধ হয়েছিল বলেই না, সে তার নিজের ভেতর থেকে, নিজের অজ্ঞাত অন্যায়ের চেতাবনি পায়।

আর তার শাহনাজ বেগমের প্রতি মুগ্ধতা দিয়ে বুঝেছিল, কেন সে এতদিন বিয়ে করেনি? এভাবে এতদিন কারুর প্রেমে পড়েনি সে? হঠাৎ এই বয়সে তার মধ্যে প্রেম জেগে ওঠা, তার জীবনে বিশেষ ঘটনা। না প্রেমে সে পড়েনি আগে কখনও এমনভাবে। প্রেমে পড়া, বিধবা ও সুন্দরী এই তিনটি বিষয় তাকে টেনেছে। তার জীবনে আগে কখনও এই তিন বিষয়ের সম্মিলন ঘটেনি। বরং তার বিয়ে করার উৎসাহ, কোনো একটি বিষয়ে মুগ্ধ হওয়ার পরও সরে গেছে। কাউকে দেখে বিয়ে করার কথা ভেবেছে, কিন্তু সে বিধবা নয়, সুন্দরী নয়, প্রেমেও পড়েনি তার। আবার প্রেমে পড়েছে, বিধবা নয়, সুন্দরী নয় বলে নিরুৎসাহিত হয়েছে।

বিয়ে করার উৎসাহ কোনো না কোনোভাবে খোয়া গিয়েছিল তার এতদিন, বিয়ে করার উৎসাহ দিয়ে বুঝতে পারে শফী, বুঝতে পারে শাহনাজের প্রতি প্রেমে পড়া দিয়ে, বুঝতে পারে শাহনাজের প্রতি রূপের মুগ্ধতা দিয়ে, যা থেকে নিজেকে কিছুতেই সরিয়ে রাখতে পারছে না।

শুধু কি শাহনাজের পায়ের একাংশ ও মুখের একাংশের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছে? মিহি আলোর কবরস্থানের চতুঃপাশ থেকে তার কান্নার স্বরের প্রতিও এক আশ্চর্য আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল শফীর মধ্যে, শাহনাজকে বিবি হিসেবে নির্বাচনের মুগ্ধতার অন্য একটা কারণও সেটা। কারুর কান্নার স্বরক্ষেপের ভেতর শ্রবণকারীর তার প্রতি মুগ্ধ আকর্ষণ গড়ে ওঠে।

সে যখন গোরস্থানে ছিল, সে মুগ্ধ হয়েছিল শাহনাজের প্রতি, কিন্তু তার মুগ্ধতা সজ্ঞানতা পায়নি। এক কিস্সার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল তার মন, সে খোয়া গিয়েছিল অতীত কাহিনীর ভিতর। কাদের মওদুদির সঙ্গে বচসা করার মধ্যে একটি বারের জন্যও শাহনাজের প্রতি যে তার মন আকৃষ্ট হয়েছে, সেই খবর তার মনের মধ্যে তখনও সঞ্চারিত হয়নি। বীরবিক্রমে কাদের মৌলবিকে থাপ্পড় মেরে, নিজের গৌরব জনসমক্ষে বাড়িয়ে তুলে এক পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছিল সে বাড়িতে।

তার তেতলা ঘরের দখিন দিকের জানালার গায়ে বিছানায় বসে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যের হাত ধরে উঠে এসেছিল, গোটা শাহনাজ, শাহনাজের রূপ, শাহনাজের প্রতি মুগ্ধতা। কেন সে নারীর প্রতি আকুলতা বা আকর্ষণ অনুভূতি ভুলে গিয়েছিল, এই তার অনুভূতি দিয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করে বসে সে জানালার গায়ে ছুটে আসা চরাচর পরিব্যাপ্ত জ্যোৎস্নার ভিতর।

সিদ্ধান্ত নিতে তার কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়নি, সাত পাঁচ ভাবতেও হয়নি সে ব্যাপারে। প্রথমে মনে হয়েছিল, শাহনাজ বিধবা, তাকে আশ্রয় দিয়ে ফেলবে। তারপর মনে হয়েছিল শাহনাজ গরিব, তাকে স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হবে তার। তাকে বিয়ে করাতে কোনো পাপ নেই। শাস্ত্রে তেমনটাই লেখা আছে।

রাতে ভাল ঘুম হল না। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেছে আর মন কেমন কেমন করা অনুভব উপভোগ করেছে। বেশ ভাল লাগল। কিন্তু নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজের পরিবারের কাউকে জড়াতে ইচ্ছে করল না তার। চুপি চুপি সেরে ফেলা ভাল। পরের দিন সারাক্ষণ কাজ কারবার দেখেছে, সন্ধ্যাবেলা কাদের মৌলবিকে নিয়ে চলে গেছে লিচু বাগানে। অনেক নাটকীয়তার মুখোমুখি হল, ঘণ্টাখানেক পরে তবে শাহনাজকে নিকা করতে পারল শফী। শাহনাজ বিয়েতে সম্মত না হওয়ার নাটক। আচম্বিত শফীর মতো একজন ধনী লোকের বিয়ের প্রস্তাব তাকে অবাক করেছিল। কিন্তু কেন যে বিয়েতে সম্মত হতে গড়িমসি করেছিল, সে কথা জানতে পারেনি শফীউল্লা। সে তো তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, কিন্তু শাহনাজ কেন রাজি হতে চাইছিল না?

৪

তাকেই বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে ওই বড় ঘরের মানুষটি? বিশ্বাসই হচ্ছিল না শাহনাজের। কাদের মৌলবিকে সঙ্গে করে এনেছে শফীউল্লা। বিয়ে করবে তাকে, আজই। অথচ শাহনাজ কয়েক ঘণ্টা আগে জানতে পারেনি। ছোট্ট একটা ঘরে থাকে, আর সামনে ঘেরা ঘর-বারান্দা। সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা আর একধারে তক্তপোশ ফেলে রাতে শোওয়ার আরেক ব্যবস্থা। সেই তক্তপোশের ওপর বসতে দেওয়া হয়েছে বড় ঘরের জ্ঞানীগুণী মানুষটিকে, মৌলবিও তার পাশে বসেছে। ভেতর ঘরে শাহনাজ। শাহনাজ ছটফট করছে। বাইরের বারান্দা ঘরে খালা নূরজাহান বানু তাদের সামনে রান্নার জিনিসপত্রের আয়োজনের সামনে দুজনের দিক থেকে পিছন ফিরে গা-গতরে শাড়ির আঁচল টেনেটুনে বসে আছে।

এই দৃশ্যের ভেতর শফীউল্লার হয়ে কাদের মৌলবি বিয়ের প্রস্তাব জানিয়েছে। এরকম ঘটনার জন্য তারা তৈরি ছিল না। আগে তারা বিন্দুমাত্র জানতে পারেনি, বড় বাড়ির ছেলে শফীউল্লা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসছে, আজ সন্ধ্যায়। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটো এল আর ফস করে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে ফেলল।

ঘরের ভেতর শাহনাজ। তাকেই বিয়ে করতে চাইছে? প্রথমবার বলার ভেতর নিজেরই বিশ্বাস হয়নি, হয়তো ভুল শুনছে। বাইরে খালা নূরজাহান বানু জিজ্ঞেস করে আবার জানতে চায়, কাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছে? শাহনাজকে না শাহনাজের মেয়েকে? শাহনাজের মেয়ে সদ্য বালিকা পেরিয়ে কিশোরী হলেও তার বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। সে এখন এই সন্ধ্যার সময় এদিক-ওদিক কোথায় ঘুরতে বেড়াতে গেছে, ঘরে ভিতে নেই।

তারা স্পষ্ট শুনল, শাহনাজকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।

এই অসম্ভব কথা শুনে ঘরের ভেতর শাহনাজ নিজের শরীর দেখে নিল একবার। তারপর বোরখাটা পরে নিল। ঘরের ভেতর থাকতে থাকতে বোরখা পরতে হচ্ছে তাকে। এই এক বছর বিধবা হয়েছে, নিজে বিয়ে করবে, এ কথা

কখনও কোনোদিনের জন্য লালন-পালন করেনি সে। আজ এই প্রথম এই দুজন লোক তাকে মনে করিয়ে দিল, আর তাকে খুব অস্বস্তিতে ফেলল। তার বছর চল্লিশ বয়েস। স্বামীর মৃত্যু হয়ে গেছে। নিজের বিয়ে করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। শরীর মনের সব জানালা দরজা বন্ধ করে ওসবের চিন্তার থেকে অনেক দূরে সরে ছিল। কেমন যেন এক অন্যায় প্রস্তাব এনে ফেলেছে শাহনাজের কাছে, এমনটা মনে হল শাহনাজের। আসলে তার নিজের তো ইচ্ছে নেই কারুর বিবি হয়। সহসা এক আক্রমণের মুখে পড়ল শাহনাজ। এখন এই মুহূর্তে তাকে রাজি হতে হবে, আর এখনই তাকে বিয়ে করবে?

সে যে বিয়ে করতে চাইছে না, এ কথা ভাববারও সময় নেই, তার আগেই তাকে বিয়েতে সম্মত হয়ে বিয়ে করাতে সহযোগ দিয়ে ফেলতে হবে? কেমন যেন বিপদাপন্ন হল শাহনাজ।

খালা নূরজাহান বানুর আর কী করার আছে? বোনঝি নাবালিকা নয় সে ঘরের ভেতর থেকে সব শুনছে তার মামলা তাকে বুঝে নিতে হবে। এটুকু ভাল মতো জানে শফীউল্লার এই বিয়ের প্রস্তাব সে নিজে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, বোনঝি তাকে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেয়, তাহলে বিয়ের আয়োজনের বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবে না সে। যদিও বোনঝির এই বিয়ে করার মধ্যে অনেক সমস্যা তৈরি হবে। সমস্যা হল, এই বিয়ে করা শাহনাজের পক্ষে সম্ভব নয়, কেন না মেয়ে শাবানার বিয়ের সম্বন্ধ চলছে, তার আগে মায়ের বিয়ে হয়ে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। সমস্ত ঘটনাই তো বদলে যাবে? মেয়ের মার ভূমিকায়, জামাইয়ের শাশুড়ির ভূমিকায় থাকবে কী করে আর? তাছাড়া কীভাবে শাবানার বিয়ে হবে? যে পাত্রের সঙ্গে কথা চলছে, সেই কথার মধ্যে শাহনাজ জড়িয়ে আছে। এই মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে ছেলেটা 'কলওয়ালা', সেলাইয়ের কাজ করে। মেয়েকে দেখিয়েছে, শাহনাজও কথা বলেছে হবু জামাইয়ের সঙ্গে। তার মধ্যে কখনও কোনো ঘোষণা ছিল না, ভবিষ্যতে শাহনাজ কারুর বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বিয়ে করে ফেলতে পারে। সমস্ত শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে এই বিয়ে করলে। এত কিছু সত্ত্বেও শফীউল্লার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া নূরজাহান বানুর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অত বড় মানুষটা শাহনাজকে বিয়ে করতে চেয়েছে, কত বড় ভাগ্য শাহনাজের। শাহনাজের এই বয়স, বিধবা সত্ত্বেও বিয়ে করতে চাইছে, এতই মহত্ত্ব তাদের। শাহনাজ বিয়ের আকাঙ্ক্ষায় নেই, অবস্থায় নেই সে কথা আলাদা সমস্যা। সমস্যা নিয়েই তো তাদের জীবন। মেয়েকে ফেলে রেখেই, শফীউল্লার সঙ্গে চলে যেতে হবে তাকে। শাহনাজের অনেকটা কম বয়েস আর বিয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকলে কি এমন স্বাভাবিক ঘটনাটা ঘটত না, মেয়েকে খালার কাছে ছেড়ে গিয়ে নতুন স্বামীর কাছে উঠে যাচ্ছে সে। এই বিয়ে হওয়া আর শাহনাজের শফীউল্লার ঘরে উঠে যাওয়া, এসব প্রতিরোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু সমস্যা এই বিয়ে করতে না চাওয়া, বিয়ের আকাঙ্ক্ষায় না থাকা।

কাদের মৌলবি ঘরের ভেতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলে, 'কি গো শাহনাজ বেগম, দু একজন লোক ডেকে নিকা পড়িয়ে দিই এবার তোমাদের? আমার বেশি সময় নেই হাতে, আসার সময় খবর এসেছিল, লাশ আসবে কবরস্থানে, আমাকে সেখানে জানাজা পড়তে দাফন করতে চলে যেতে হবে একটু পরে। হাতে বেশি সময় পাব না. গোরকোনরা কবর খুঁড়ে ফেলছে।'

সহসা গোরস্থান চলকে ওঠে শাহনাজের মনে, আর গত সন্ধ্যার ঘটনা চলকে ওঠে। গত সন্ধ্যার ঘটনার আঘাতে খানিকটা টলে পড়ে যাবার মতো অবস্থা হয় তার, নিজের বোরখার কাপড় নিজে বাঁ হাতে খামচে নিজের টলে পড়া সামলায় শাহনাজ। আর মনে পড়ে যায় এক বছর একদিন হল. তার স্বামী মরেছে। সে গত সন্ধ্যায় তার মৃত স্বামীর জন্য খুব কেঁদেছিল. সে কথা তার শুধু মনে পড়ে যায় না, সে কথার আবেগে সে নিক্ষিপ্ত হয়।

'ওখানেই যাবে নাকি? গোরকোনদের মধ্যে সাক্ষী নিয়ে নেওয়া যাবে, মোনাজাতেও অনেক গোরকোনকে পাওয়া যাবে?' কথাটা বলে শফীউল্লার দিকে তাকাল কাদের, তার নিজের এই সুবিধেজনক প্রস্তাবে শফীর কোনো আপত্তি আছে কী না? এই নিকা অনুষ্ঠানটা গোরস্থানেব ওখানে পড়াবার ব্যাপারে শফীর রায় আছে কি?

তাদের সবাইকে সহসা চমকে দিয়ে শাহনাজ ঘর থেকে বেরিয়ে এল, আর বারান্দা ঘরটুকু থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ল ধাঁ করে।

সবাই বুঝল, শাহনাজের এই বিয়েতে আপত্তি নেই। নূরজাহান বানু কাদের মৌলবি আর শফীউল্লা সকলেই শাহনাজের অনুসারী হল। তার পেছু পেছু হাঁটতে লাগল।

গোরস্থানের কথা তুলতে, এমনভাবে শাহনাজ গত সন্ধ্যার কান্নার ঘটনার মধ্যে তাড়িত হয়েছিল যে, সে ছুটতে লাগল কবরস্থানের দিকে। নিজের দিক থেকে তার এই বিয়ে করার যৌক্তিক সমর্থন খুঁজে পাচ্ছে না বলে, এই বিয়েতে তাকে অসম্মতির ভেতর রাজি হতে হবে বলেই, তার এক পাগল দশার আশ্রয়ের যৌক্তিকতা তৈরি করছিল শাহনাজ। কেন না সুস্থ মনস্ক হয়ে তার পক্ষে এই বিয়ে করা সম্ভব নয়। ভেতরে ভেতরে সে সুস্থ মনস্ক থেকেই এই পাগলপনাকে নিজেব মধ্যে গড়ে তোলে, এই একরকম গোরস্থানের উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়ার ভঙ্গির ভেতর। আর তাতে আর একটা কথার সমর্থন সে ওই তিনজনকে খুঁজে দিয়েছে, গোরস্থানের ওখানে বিয়ে পড়ানোর প্রস্তাবে সম্মত। পাগলদশার অভিনয় দিয়ে এই বিয়েতে সম্মতি প্রকাশ করছে সে, বিয়েতে বসতে যাচ্ছে সে। শুধু আলগাভাবে মৌলবি গোরস্থানের ওখানে বিয়ে পড়ানোর কথা বলেছিল, তাকে পাগলপনা দেখাবার সহজ মাধ্যম পেয়েছে বলেই না সহজ হল শাহনাজের পক্ষে। পাগলের মতো চলেছে সে গোরস্থানের দিকে। কেন না তার আগের স্বামী সেখানে শুয়ে আছে। আগের সন্ধ্যায়ও গিয়েছিল। এখন এই মাত্র গোরস্থানে চলেছে শফীউল্লার বিবি

হতে, বিগত স্বামীর শোকের পাগলপনাকে আশ্রয় করে। পাগলপনার আশ্রয় খুঁজে নিলে বাস্তব দায়িত্ব কত সহজে সরিয়ে ফেলা যায়, তার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ চলছে, হবু জামাই কাল আসবে, আর আজ নিজেই বিয়েতে বসছে, এমন বিয়েতে সম্মত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না, তাই এই পাগলপলাকে আশ্রয় করেছে শাহনাজ।

সে জানে পেছন পেছন ওরাও আসছে। তার হাঁটার গতির ভেতর বোরখার অভ্যন্তরে ফর ফর করে বাতাস ঢুকে যায়, ফুলে ওঠে বোরখা, আপাত এক বাধা ঠেলে চলে, যেন স্ববিরোধিতার রূপক হয়ে ওঠে, তার এই বোরখায় বাতাস ঢুকে বাধা দেওয়া, আর বাধা ঠেলে তার এই এগিয়ে যাওয়া।

এই পাগলপন তাকে এক চিন্তাক্লিষ্টহীন পরিতৃপ্ত অবকাশ দিয়ে ফেলল। বাস্তবতা থেকে উড়ে গিয়ে পড়েছে সে এক কল্পলোকে। একজন বড়লোকের সঙ্গে এখন তার এই মুহূর্তে বিয়ে। সামান্য এঁদো বাড়ি ত্যাগ করে আলিশান বাড়িতে সে উঠে যাবে। এই সামান্য বাড়ি, দারিদ্র্য, সবকিছুর তার অবসান হবে। বাস্তবতাকে সরিয়ে ফেলতে পারলে শফীউল্লাকে বিয়ে করার অসুখ কোথায় তার? কোনো অসুখ নেই, বরং সুখই পাবে সে।

এমন এক ভঙ্গিতে হাঁটছিল শাহনাজ, যেন ছুটছে। আর তার পেছু পেছু নূরজাহান বানু, কাদের মওদুদি ও শফীউল্লা এমন ভক্তিতে হাঁটছে যেন তাকে ধাওয়া করেছে, যেন তাকে খেদিয়ে গোরস্থানে নিয়ে ফেলবে। সেখানে কাদের মৌলবির সুবিধে হবে কলমা পড়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার। এমন তো বাস্তবতার ভান পাবে ঘটনাটা, শাহনাজ এই বিবাহ প্রস্তাবের বেদনায়, অনাস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে, তাকে না ধরতে পারে, এমনভাবে সে হাঁটছে-ছুটছে। তেমনভাবে সে কোনো গোরস্থানে পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারছে। পাগলপন অভিনয়ের মধ্যে তেমন রকম ভঙ্গিটি এনেছে শাহনাজ। অথচ তো কবরস্থানে গিয়ে নিকা পড়ানোতে সে শুধু সহযোগই দিয়ে ফেলছে না, শফীউল্লার নিকা প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করে ফেলছে। এই পাগলপনার মধ্যে এতখানি বহুমাত্রিকতা আছে।

পাগলপনার মাধ্যম বেছে নিয়ে ওদের কাছে ধরা দিচ্ছে শাহনাজ, নিজের কাছে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেও। সেজন্য সত্যিই তার বেদনা হয়, এই পাগলপনার মধ্যে তার বেদনাকে মিশিয়ে দিতে সহজও হয়। দৃশ্যটা তেমনই গড়ে উঠেছে, সে সত্যি সত্যিই গত সন্ধ্যায়ও বিগত স্বামীর জন্য এই গোরস্থানে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল, স্বামীকে হারিয়ে ফেলার দৈন্যে, সেই বেদনারিক্ত অনুভূতি শোক থেকে তাকে শফীউল্লা বিবি হিসেবে চয়ন করছে। এই পরিস্থিতির ভেতর গোরস্থানে ছুটে যাওয়া, স্বামী-শোকের এক চরম ক্রান্তিলগ্ন হওয়া গড়ে ওঠে তার। সত্যি সত্যি স্বামীর বেদনায় সত্যিকারের গত সন্ধ্যার কান্নার রেশ তার মধ্যে ছিল, সেই কান্না এখনও অনেকটা জড়িয়ে আছে। আর সে নিজের বিয়ের কল্পনাতেও বিন্দুমাত্র ছিল না, তাই এই প্রস্তাব তার কাছে বেদনাদারক নির্যাতনের মতো, তেমন বাস্তবতার মিশেলও থাকে

তার পাগলপনা অভিনয়ের মধ্যে। অথচ সে ধরা দিতেই পাগলপনাকে বেছে নিয়েছে, বিবাহবাসরে নিজেকে পৌঁছে দিচ্ছে।

অথচ গোরস্থানের দিকে সে ছুটছে, পেছনে ধাওয়া করেছে তিনজন। শাহনাজ গুনগুনিয়ে কাঁদে, যে কান্নাটা গত সন্ধ্যা পর্যন্ত কেঁদেছিল, সেই কান্নাটাকে তুলে নেওয়া তার পক্ষে সহজ হল। আর সত্যি সত্যি তো বিধবাদের পুনর্বিবাহের কালে বিধবাদের পূর্বস্বামী বেদনা তাকে মারে, কাঁদায়, সেই কান্না পাগলপনার সঙ্গে মিশিয়ে দিল শাহনাজ। দ্বিতীয়ত পুনর্বিবাহের মুহূর্তে পূর্বস্বামীর বেদনা শোক শেষ করে দেওয়ার জন্য গোটা একটা পাগলপনা হয়ে উঠতে পারে। গোরস্থানের কাছাকাছি এসে সেই কথাকল্পনা পায় শাহনাজ। সে আসলে, আসন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে বসবার আগে পূর্বস্বামীর জন্য পাগলপনা দেখিয়েছে, খুব সৎ এই পাগলপনা। এই পাগলপনার মধ্যে দিয়েই না শফীউল্লার নিকা প্রস্তাবের সম্মতি প্রকাশ করছে, আবার কাদের মৌলবির নিকা পড়ানোর সুবিধেতে সহযোগিতা করে ফেলছে।

এই বিয়ে অনিবার্য, অলঙ্ঘনীয়, তাই শাহনাজ এক তৈরি পাগলপনার অভিনয় আশ্রয় করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, সেই অবাস্তবতার অভিনয়েই ঢুকে গিয়েছিল। এখন গোরস্থানে ঢুকে পড়ে পূর্বস্বামীর কান্নার রেশ টান মারতেই এক বাস্তবতার পাগলপনা তার মধ্যে তৈরি হয়। পূর্বস্বামীর বেদনায়, তাকে হারিয়ে ফেলার জন্য, তার এই কবরস্থানে ছুটে আসা পাগলপনার সত্য বাস্তবতা তৈরি করে। আর সত্যি সত্যিই তো শফীউল্লা তাকে বিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে, আজই এই মুহূর্তে বিয়ে করার জন্য মৌলবি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সে তো বিয়ে করার বাস্তবতায় নেই, মনও তৈরি নয়, আবার একটা বিয়েতে যায়। অথচ অনতিবিলম্বে তার নিকা পড়া হয়ে যাবে শফীউল্লার সঙ্গে। যে ঘটনা প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতা তার নেই। সেহেতু এই ক্রান্তিলগ্নে স্বামীর কবরের দিকে কাঁদতে কাঁদতে ছোটা, স্বামীর জন্য কান্নাকাটি করা খুবই বাস্তব ও সত্য পাগলপনা। অন্যদিকে শফীউল্লার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করতে পারছে, মৌলবিরও সুবিধে খুঁজে দিতে পারছে।

কোনো প্রতিরোধ নয়, এই আনুগত্যের ভঙ্গির মধ্যে একটা অবাস্তব দৃশ্য শুধু গড়ে তুলেছে, মৌলবি আর শফীউল্লা তার পেছু ধাওয়া করেছে। সে এই বিবাহ প্রস্তাবে রাজি নয়, ধরা দিতে চায় না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তার বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও বেরিয়ে এসেছে পিছু পিছু, তার যাওয়ার পিছু পিছু ওরাও চলেছে। ধাওয়া করেছে তাকে। তার বোরখার ভেতর হাওয়া ঢুকে যাওয়ায় গতিরোধ ঘটছে। ওরা তার পেছু পেছু আসছে, তাকে ধরতে চায়, জোর করে তাকে বিয়ে করতে চায় শফীউল্লা লোকটা, যে বিয়ে পড়াবে সেই তার সঙ্গী, সেও পেছু নিয়েছে। সে এই বেদনায় কাঁদছে, ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। কবরস্থানে পর্যন্ত ঢুকে পড়ছে, তবুও পেছু নেওয়া ছাড়ছে না লোক দুটো। কি নিষ্ঠুরতা!

কবরস্থানে বিজলি বাতি ছড়িয়ে আছে চারদিকে, তার চেয়ে বেশি জ্যোৎস্নালোক।

গোরস্থানের ভেতর ছুটছে। তার বোরখার ভেতরের শাড়ির আঁচল গা থেকে খসে গেছে, বোরখার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নীচে মাটিতে লুটিয়ে যাচ্ছে আঁচল. বোরখার ভেতর থেকেও তার এই দৃশ্যমান আঁচল প্রমাণ করছে, তার গা থেকে আঁচল খসে গিয়ে সে খানিকটা বিবস্ত্র, নগ্ন। মাথার আঁচল সরে গেছে, পিঠের কাপড় সরে গেছে, বুকের কাপড় সরে গেছে। সে এই দিশাহীন ভঙ্গির বাস্তবতা পায়, পেছনে দুজন লোক আর তার খালা তাকে ধরার জন্য ছুটে আসছে। শাহনাজ আঁচল লুটিয়ে পাগলের মতো ছুটছে গোরস্থানে। তার ডাইনে বাঁয়ে পেছনে সামনে সারি সারি অসংখ্য কবর সব। কেমন একটা বুনো গন্ধের সঙ্গে ভ্যাপসা গন্ধ মেশানো। গন্ধটা অদ্ভুত মৃতকল্প, পুরনো। জ্যোৎস্নার ভেতর গোরস্থানটা হয়ে ওঠে অন্য কোনো জগৎ। মাটি সরে গিয়ে, বাঁশ পচে গিয়ে অনেক কবর হাঁ হয়ে আছে শাহনাজ স্বামীর কবরের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে।

কিছুটা তফাতে ছিল তার খালা নূরজাহান বানু, ছুটে এসে আলুলায়িত ক্রন্দনরত শাহনাজকে গিয়ে ধরে। পেছন দিক থেকে দুটো হাত কজা করে ধরে।

গোরস্থানের অন্য এক দিকে গোরকোনরা কবর খুঁড়ে চলেছে, খানিকটা বিজলি বাতির আভার ভেতর, অনেকটা জ্যোৎস্নার আলোয়। কোদালের কোপের আওয়াজ ফুটে উঠছে বাতাসে, ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্!

এখন শাহনাজ খালার হাতে ধরা দিয়ে এলিয়ে দিয়েছে মাথাটা খালার কাঁধের ওপর, খালা তাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে গেটের দিকে। পেছনে আছে শফীউল্ল ও কাদের মৌলবি। এখন শাহনাজ গুনগুনিয়ে কাঁদে। এখন তার কান্না শেষ হওয়ার দিকে, মিহি ও স্তিমিতপ্রায়, অনুচ্চ।

ততক্ষণে লাশ এসে গেছে। গেটের ডান দিকে উঁচু চবুতরার ওপর নতুন লাশের খাট তুলে দিয়ে মৃদু গুঞ্জন তুলছে মৃতের লোকজন। তারা হাল্কা স্বরে নানা কথাবার্তা বলছে। ছায়াস্নিগ্ধ ক্রমশ সন্ধ্যা বিলীয়মান আগত রাতের বুকে কবরস্থানে, কিছু কথা ও কিছু কান্না ফুটে উঠল এই মুহূর্তে। যথারীতি বাড়ির মেয়েরা রোয়াকের ওপর বসেছে। সামান্য আলোর আভা ও জ্যোৎস্না গিয়ে পড়েছে রোয়াকের গায়ে একদল মেয়ে কেঁদে চলেছে গুনগুনিয়ে। সেখানে শাহনাজকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে নূরজাহান বানু কি চমৎকার শাহনাজের কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, শাহনাজের কান্নাও তাদের সামনে মিশে যায়।

বাথরুমের কাছে গিয়ে জলের কলগুলোতে পুরুষদের মধ্যে অনেকে ওজু করছে। কেউ পেচ্ছাপ করছে, পেচ্ছাপে জল নিয়ে পরে ওজু করছে।

শাহনাজ বেগমকে কবরস্থান থেকে তাড়িয়ে আনার পর লাশের বাড়ির লোকজনদের মধ্যে অভ্যস্ত কায়দায় ঢুকে যায় কাদের মৌলবি। তারপর তার কাছেই ঘুন ঘুন করতে থাকে মৃতের আসল আত্মীয়রা। কাগজপত্র দেখা, হ্যানা-ত্যান নিয়মকানুন সারতে থাকে। নানা কিছু জিজ্ঞাসা পড়া করে। মনোযোগে ও সম্ভ্রমে নুয়ে পড়ে তার দিকে দু চারজন লোক। এমনটা করতে করতে অভ্যস্ত রীতিতে

কাদের মওদুদি মৃতের খাটকে সামনে রেখে পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। পেছনে লাইন দিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে থাকে মৃতের আত্মীয়-পরিজন প্রতিবেশীরা। মৃতের জানাজার নামাজ শুরু করে দেয়। পুরুষদের মধ্যে গুঞ্জন বাক্যালাপ মুছে গেল সহসা। শফীউল্লাও এই জানাজার নামাজে যোগ দিয়েছে।

রোয়াকে মেয়েদের দলের মধ্যে স্তব্ধতা নেমে এল। শাহনাজও কান্না থামিয়ে ফেলেছে। সে মিশে গেছে মৃতের আত্মীয়-পরিজন প্রতিবেশী মহিলাদের দলের মধ্যে। এখন এই জানাজার নামাজের সময় কেউ কাঁদবে না। যে যার কান্না সামলে রেখেছে। একটু সুস্থতা ও বিশ্রামনন্দন ফিরে আসে মহিলা দলের মধ্যে। যারা বাচ্চা সঙ্গে করে এনেছিল, তারা বাচ্চাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ে। জানাজার নামাজ পড়া হচ্ছে বলে তারা এই কান্নার ক্লেশ থেকে কিছুটা সময়ের জন্য যেন রেহাই পায়। নিঃশব্দে জলের বোতল চালাছালি করে জল খায়। কেউ শিশুকে মাই দেয়। নিজেদের এই কান্নার নীরবতা, নিজেরাই উপভোগ করে, অদ্ভুত শান্ত পরিচ্ছন্ন পরিতৃপ্তি দেয় এই নীরবতা।

শাহনাজও কি সুন্দর শান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ কাঁদার পরে হঠাৎ কান্না থামিয়ে দিলে নীরবতা ভাল লাগে। এভাবে চুপ করে বসে থাকতে তার ভাল লাগছে। আর বিপরীত দিক দিয়ে ভাবছে, শফীউল্লা কেন তাকে বিয়ে করতে চাইল? প্রায় বছর কুড়ি তার আগের স্বামীর সঙ্গে সংসার করেছে সে। তার বিয়ের বয়েসও তেমন নেই। চল্লিশ বছর বয়েসে একরকম আধবুড়িই। কী এমন দেখে আকৃষ্ট হল তার প্রতি শফীউল্লা? তার রূপ আছে, কিন্তু কচি বয়েস না হলে এই রূপের মূল্যই বা কী? হয়তো এমন কিছু তারিফ আছে তার, সে নিজেই জানে না। সে তার অজানা নন্দিত তারিফ হাতড়াতে লাগল এই মুহূর্তে কান্নার স্তব্ধতার মেলায়।

৫

মৃতের কবর হয়ে যাওয়ার পর, তাদের সকলে চলে যাওয়ার পর অদ্ভুত এক নিকা পড়াবার মজলিশ গড়া হল, গোরস্থানের মৌলবির ঘর সংলগ্ন রোয়াকে। যে ঘরটাতে মৌলবি থাকে না, সেটা গোরকোনদের দখলে থাকে, তারা কোদাল শাবল গাঁইতি দা নানা কিছু রেখে দখল করে নিয়েছে। শুধু একটা আলমারিতে খাতাপত্র রাখে মৌলবি, চাবি নিজের কাছেই থাকে। সারাক্ষণ ঘরটায় আলো জ্বলে বলে নিজেই খাতাপত্র বের করে আনে, কাজের শেষে নিজেই আলমারিতে রেখে চাবি এঁটে আসে। রোয়াকের ওপর আলো বহুদিন নেই। তার আর দরকারও পড়ে না। কেন না ওই জায়গাটায় মেয়েরা এসে বসে তাই অনালোকিত রাখতে হয়েছে। কেন না অন্ধকারে মেয়েরা বসতে স্বস্তি পায়, একটা অন্ধকারের পর্দাও তৈরি হয়। পুরুষরাও চায় মেয়েরা আড়ালে থাকুক, না দেখতে পায় তাদেরকে কেউ। তারা আলোকপ্রাপ্ত না হয়।

বিয়ের আসরের জন্য গোরকোনরা ঘরের ভেতর থেকে একটা বাল্ব টেনে ওপরে ঝুলিয়ে দিল প্রবল উৎসাহের সঙ্গে। শাহনাজকে নিয়ে তার খালা নূরজাহান বানু থামের ছায়া বেছে নিল যথারীতি, পুরুষদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে তাদের।

এই নিকা পড়ানোটা খুবই সংক্ষিপ্ত হবে। আসলে বিয়ের অনুষ্ঠান না থাকলে নিকার অনুষ্ঠান তো সংক্ষিপ্তই। নিকা পড়ানোতে সময় অপচয় নেই বললেই হয়। মজলিশ থেকে একজন উকিল ঠিক করে দুজন সাক্ষী নির্বাচন করে, উকিলের সঙ্গে প্রথমে পাঠাতে হবে পাত্রীর কাছে এযিন নেওয়ার জন্য, অর্থাৎ সম্মতি নিতে। তিনবার জানাবে অমুকের সঙ্গে তোমার নিকা হচ্ছে, এই শাদিতে তোমার সম্মতি আছে কিনা? তিনবারই সম্মতি জানাবে পাত্রী, 'জি' 'হু' 'কবুল' ইত্যাদি ইত্যাদি সম্মতিসূচক শব্দ দিয়ে। তারপর পাত্রের সম্মতি আছে কিনা এভাবে জেনে নেবে। তাতেই বিয়ে হয়ে যায়। আর পাত্রীর কাছে উকিল সাক্ষী পাঠাতে দেরি হবে না, তাদের গায়ের কাছে থামের আড়ালেই আছে দুলহন। শুধু বরকে কলমা পড়িয়ে, সুরা পড়িয়ে নেওয়া, তারপর তাদের দাম্পত্যজীবন যাতে সুখের হয়, তাদের ইহলোক পরলোক যাতে সুখের শান্তির হয়, তার জন্য আল্লার কাছে মোনাজাত বা প্রার্থনা করবে। এইটুকু তো। ইশার নামাজের অগে বিয়েটা হয়ে যাবে।

এযিন, সম্মতিটাই আসল, সেটা হলেই বিয়ে হয়ে যায়। পাত্রীর অভিভাবক অভিভাবিকার সম্মতিক্রমে যদি দুজন পুরুষ সাক্ষী নিয়ে, কিংবা একজন পুরুষ সাক্ষী আর অন্যজন পুরুষ সাক্ষীর অভাবে দুজন মহিলা সাক্ষী নিয়ে শাহনাজের বিয়েতে সম্মতি আদায় করে নিত, তাহলে এই বিয়ে হয়ে যেত, ধর্মসিদ্ধ হত সে বিয়ে। তেমনই অনাড়ম্বর হয়ে উঠেছে শফীর বিয়ে পড়ানোর অনুষ্ঠানটা।

অবিবাহিতার ক্ষেত্রে, সে পাত্রী যদি মুখ ফুটে তার সেই বিয়েতে সম্মতি না জানায়, সম্মতিসূচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, সম্মতি বাক্যের জবাবে মিটিমিটি হাসে, অথবা বাপের বাড়ি ছেড়ে অন্যের বাড়ি চলে যাওয়ার বেদনায় সহসা কেঁদে ওঠে, মুখ ফুটে সম্মতি প্রকাশ না করলেও, তাতেই তার সম্মতি প্রকাশ ধরে নেওয়া হবে। তারা কান্নার প্রকাশ দিয়ে বিয়েতে সম্মতি প্রকাশ করতে পারবে।

কিন্তু তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে এমনটা বৈধ হয়। স্পষ্ট কথায়, স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানাতে হবে, তার এই বিয়েতে সম্মতি আছে। 'জি' 'হ্যাঁ', 'রাজি আছি' 'কবুল' এ সমস্ত সম্মতিসূচক শব্দ উচ্চারণ করে জানাতে হবে। এসব মাশালার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল শফীউল্লা। কাদের মওদুদির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে খানিকটা উদাস হয়ে পড়েছিল, বাস্তবতা থেকে সরে গিয়েছিল অল্প সময়। এত বছর বয়সে এই প্রথম বিয়ে করছে। বাড়ির কেউই জানল না। সে জানে বাড়ির লোক ভীষণ চটবে। প্রচুর ধুমধাম করে তার বিয়ে দিতে চাইত। তার জন্য যে সময় লেগে যেত! হয়তো এক দু মাস আয়োজন করতে লাগত। কত রকম খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন, কত রকম কেনাকাটা, কত রকম লৌকিকতা,

কত নেমন্তন্ন। এরকম জাঁকজমকপূর্ণ বিয়েতে শফী বিশ্বাসী নয়, ধর্মে নিষেধ করা হয়েছে, অপব্যয় করতে। সে যা বিশ্বাস করে, সেটা করে, বাড়ির লোক চটলেও গ্রাহ্য করে না।

আর এক দু মাস বিয়ের আয়োজনে অপেক্ষা করার ভেতর শফীউল্লার কত গুনাহ্ বাড়ত, তার খবর একমাত্র শফীউল্লাই রাখে। আল্লার কাছে জবাব দিতে হবে তাকেই, ভাই বেরাদর কেউ সেই সময় কাজে লাগবে না। তাকে নিজেকেই পুলসুরাত পেরতে হবে। কেন না শাহনাজ একজন বিধবা, তার প্রতি সে আসক্ত হয়েছে, যতক্ষণ না বিয়ে করে নিচ্ছে তার আসক্তির পাপ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পাপ বাড়িয়ে তুলছে, তাই এই বিয়ে দ্রুত সেরে নেওয়া খুবই জরুরি।

সে যে শাহনাজ বেগমের রূপে মুগ্ধ, শাহনাজে আসক্ত, এ কথা শাহনাজকে জানায়নি। সে শুধু শাহনাজকে বিয়ে করার ইচ্ছেটুকু প্রকাশ করতে পেরেছে। আর সেই বিয়ে হতে চলেছে, এই মুহূর্তে এই গোরস্থানে, একজন মৃতের কাফন-দাফন করাবার পর বিয়ে পড়াচ্ছে মৌলবি কাদের মওদুদি।

শাহনাজকে নিয়ে নূরজাহান বানু থামের আড়ালের ছায়ায় বসে আছে, থামের আড়ালে অথচ নয়। অন্ধকারের এক পর্দা তৈরি করে নিয়েছিল এতগুলি পুরুষের দৃষ্টিপাতের সামনে।

সম্মতি নিতে একজন গোরকোন উকিল সেজে দুজন সাক্ষী গোরকোনকে বিবির দিকে আনুষ্ঠানিক মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, শফীউল্লা পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন মোহরে তাকে বিয়ে করতে এসেছে। সে রাজি কিনা?

নৈঃশব্দ্যের ভেতর হঠাৎ গোরস্থানে ঝোড়ো হাওয়া বইল, তার ভেতর জবাবে একটু কান্না ভরে দিল শাহনাজ। কান্না দিয়েই বোঝাতে চেয়েছিল তার সম্মতি।

এ ব্যাপারে কাদের মৌলবিকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল শফীউল্লা, এক্ষেত্রে মুখ ফুটে সম্মতিসূচক শব্দ খসাতে হবে, কান্না দিয়ে অথবা হাসি দিয়ে সম্মতি জানানো চলবে না, কেন না কন্যা বিধবা।

আগের বিয়েতে, কুড়ি বছর আগে শাহনাজ কান্না দিয়ে তার সম্মতি প্রকাশ করেছিল খানিকটা, ভেবেছিল এভাবেও মিটিয়ে দেবে। তাই কাঁদছিল সওয়ালের জবাবে।

তবে কি বিবি এই বিয়েতে রাজি নয়? হঠাৎ এ কথাটা মাথায় এসে পড়ল শফীর। কিন্তু অসম্মতির কী আছে ভেবে পেল না সে। তার মতো একজন ধনী লোক, এমন একজন বিধবাকে বিয়ে করছে, অসম্মতির কি কোনো কিছু থাকে? বরং সাগ্রহে আনন্দের সঙ্গে বিয়ের এযিন দেবে।

কাদের মৌলবি বলল, 'কান্না দিয়ে বোঝালে হবে না, মুখ ফুটে উচ্চারণ করে কবুল জানাতে হবে তোমাকে। কারণ তুমি বিধবা, বিধবার নিয়ম নেই হেসে কেঁদে বোঝাবার।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারল শাহনাজ, তাকে মুখ ফুটে বলতে হবে। তখন সে

মুখ ফুটে বলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বরং কান্না দিয়ে বোঝানো সহজ ছিল। মুখের কাছে 'কবুল' কথাটা এসে আটকে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে উঠছে

এযিন নেওয়ার বয়ান বার বার বলে যাচ্ছে একজন গোরকোন, আর শাহনাজের কণ্ঠ ফুটে উঠছে না। কবুল দিতেই চায়, অথচ কবুল কথাটা বের করতে পারছে না। সমস্ত গোরস্থান জুড়ে নৈঃশব্দ্য, তারা যে দশ-বারোজন আছে, তারাও কোনো কথা বলছে না। শুধু কবুল কথাটা শোনার জন্য নৈঃশব্দ্য ধরে রেখেছে তারা

শাহনাজ ভাবল, বিয়ের আসরে এসে যখন বসেছে, এ বিয়ে রোধ করা ব এই বিয়েতে অসম্মতি জানানো তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাকে সম্মত হতেই হয়েছে অথচ 'কবুল' কথাটা উচ্চারণ করতে পারছে না? কান্না দিয়ে সম্মতি প্রকাশ করতে চেয়েছিল বলেই এই বিপত্তি, তার ক্ষেত্রে কান্না দিয়ে সম্মতি প্রকাশ করা বৈ নয়। এই এতটুকু সংক্ষিপ্ত বিবাহ অনুষ্ঠানটা শুধু তার জন্যই দেরি হয়ে যাচ্ছে অথচ সে এ বিলম্ব চায়নি। এক স্তব্ধতা ও নৈঃশব্দ্য এনে দিয়েছে সকলের মধ্যে গোরস্থানের গাছে গাছে বাতাসের স্বর শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর শুকনো পাত মাটিতে বাতাসের ঘায়ে উড়ে যাওয়ার স্বর উঠে আসছে, সেই শব্দ নৈঃশব্দ্যে ভেতর বিপুল হয়ে উঠছে। দীর্ঘ হয়ে উঠছে নৈঃশব্দ্যও।

আবার যতক্ষণ সম্মতি না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ বিয়ে সম্পূর্ণ হচ্ছে না, নিকা বৈধ হচ্ছে না, ততক্ষণ এই নব দম্পতির ইহলোক পরলোকের জন্য আল্লার কাছে হাত তুলে মোনাজাত করা যাচ্ছে না।

নূরজাহান বানু চাপা স্বরে বোনঝিকে খুব বকা ঝকা করতে শুরু করে দিয়ে ইত্যবসরে। মাঝে মধ্যে আঙুলের খোঁচাও বোনঝির পাছায় পিঠে মারছে।

আবার চেষ্টা করতে লাগল শাহনাজ। আবার তার কান্না পেল। নৈঃশব্দ্যে ভেতর তার কান্না গোরস্থানের গাছের শাখাপ্রশাখা বয়ে যাওয়া বাতাস আর ঝর পাতা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বাতাসে মিশে যেতে থাকল। তারপর এই কান্না ফু ওঠার ভেতর দিয়ে অদ্ভুতভাবে 'কবুল' শব্দটা উচ্চারণ করে ফেলল শাহনাজ আর পুরুষদের হর্ষ উল্লাস প্রকাশ হয়ে পড়ল সেই সঙ্গে। সেসব শাহনাজে অনুভূতিতে ঠিক ঠিক ধরা পড়ল। সে ওইভাবে প্রথমে কান্না গড়িয়ে নিল, পা 'কবুল' কথাটা উচ্চারণ করল আরও দুবার, মোট তিনবার।

মজলিশের মধ্যে অদ্ভুত এক প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এল। গোরকোনরা এত দ্রু কবর খুঁড়তে পারে যে তারা এ ধরনের বিলম্ব সইতে পারে না। কবর খোঁড় হয়ে গেলে তারা উল্লাস করে পরিতৃপ্তি জানায় এভাবে। বেশ তাদের মধ্যে এ চনমনে ভাব।

শাহনাজ বিবি কবুল করতে বিলম্ব করছিল, তার ভিতর শফীউল্লার এ অস্তিত্বের সঙ্কট তৈরি হয়েছিল। শাহনাজ বিবিকে বিয়ে করে ইহলোক পরলো দুটোই আবাদ করতে চেয়েছিল। বিবি সম্মতি দিচ্ছে না, ইতোমধ্যে ইহলো পরলোক তার বরবাদ হতে চলেছে, এমন এক সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছি

শফীউল্লা। কেন না এই বিবিতে সে আসক্ত হয়ে পড়েছিল, রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল, তার বিনা 'কবুলে' এ বিয়ে হতই না। তাহলে হত কি শফীউল্লা তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি এমন কোনো বিধবার আসক্তিতে থেকে রূপে মুগ্ধতা নিয়ে পাপ করে যেত দিনের পর দিন বছরের পর বছর। বিয়ে করলেই তো এই বিবির প্রতি তার আসক্তি আর রূপে মুগ্ধতা বৈধ ও ধর্মসম্মত হত। বিবি কবুল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সমস্যা থেকে উদ্ধার পায় শফীউল্লা। আর এক পরিতৃপ্তির প্রশান্তি খেলে যেতে থাকে তার মনের মধ্যে।

কাদের মৌলবি হাত তুলে মোনাজাত শুরু করে। গোরকোনরা হাত তোলে, শফীও হাত তোলে। কাদেরের মোনাজাতের একটি বাক্য যেই শেষ হয়, অমনি সকলে 'আমিন' উচ্চারণ করে সমর্থন জানায়। তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ ও শান্তিকে সমর্থন জানায়। প্যার মহব্বতে থাকার সমর্থন জানায়। তাদের ধর্মের প্রতি আনুগত্যে সমর্থন জানায়। তাদের জান্নাত বাসের জন্য আল্লার দরবারে প্রার্থনা জানানো হয়। সমস্ত দুঃখে বিপদে তারা যেন তোমার প্রতি ভরসা রাখে এই তৌফিক যেন এদের থাকে। এরা শুধুই জান্নাতে যাবে না, এদের মা বাবা ভাই বোন চাচা চাচি নানা নানি দাদা দাদি খালা খালু ফুপু ফুপা সকল রিস্তেদার এদের যেন জান্নাতবাসী হয়। এরা জ্ঞানে অজ্ঞানে ঘুমে জাগরণে যদি কোনো গুনাহ্ করে থাকে, আল্লা তুমি এদের গুনাহ্ মাফ করে দিও।

কেমন এক আচ্ছন্নতার মধ্যে ছিল শাহনাজ। কিন্তু হঠাৎ মৌলবির মোনাজাতের কথাগুলি কানে যেতে অদ্ভুত চমকে ওঠে। গত সন্ধ্যায় তার পূর্বস্বামীর কবর জিয়ারত করে মোনাজাতের সময় এই একই কথা বলছিল মৌলবি। সেই মোনাজাতে এক কান্নার ভাব উঠে এসেছিল মৌলবির কণ্ঠে, এই মোনাজাতেও সেই অভ্যাসের জন্য এক কান্না কান্না মৃদু সজলতা এসেছে মৌলবির কণ্ঠে।

৬

শফীউল্লাকে নিয়ে দাদা শওকতউল্লা কম গর্বিত নয়, কম সামাজিক গৌরব বোধ করেনি। যত পেরেছে, পাগলের মতো বই পড়েছে। এখন আর বেশি পড়ে না, প্রয়োজনে উল্টে-পাল্টে দেখে। পড়ার দরকার হয় না, সবই তার মাথার মধ্যে গচ্ছিত হয়ে থাকে। উসকে নিলেই একটার পর একটা মাশালা বলে চলে, একটার পর একটা কাহিনী বলে যেতে থাকে।

এতদ্ অঞ্চলে শফীর মান সম্ভ্রম পরিচিতি জনপ্রিয়তা যত দিন যাচ্ছে বেড়েই চলেছে। শফীর মর্যাদা শওকত পায়, শওকতের অর্থনৈতিক সামাজিক মান্যতা শফীও পায়। তারা এক পরিবারের। শফীউল্লা এতদিন বিয়ে না করে কাটিয়েছিল। এক বাড়িতেই থাকে। শওকতের বড় ব্যবসা, শফীর ছোটখাটো ব্যবসা। কিন্তু শফীর কোনো খরচ বরচ নেই। যা রোজগার করে, জমাতে পারে। দাদার কাছেই খায়

দায়, আলাদা বাড়ি করে দূরে সরে যায় না। তাছাড়া শফীর মাও তো থাকে শওকতের কাছে। ওরকম আলিশান বাড়িতে থাকারও একটা মর্যাদা আছে।

শওকতউল্লা বাপের প্রথম পক্ষের চার নম্বর ছেলে। বড়দা, মেজদা মারা গেছে তা হল বছর দশ বারো, হাওড়ার মঙ্গলাহাটে যে বছর আগুন লাগে। শওকতের ওপরের দাদা বেঁচে আছে, কিন্তু বৃদ্ধ। মালিপাড়ায় উঠে গিয়ে বাড়ি ও ব্যবসা ফেঁদেছিল, বাপের জীবদ্দশায়। এখন ছেলেদের হাতে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ওপারের দিন গুনছে। তার ওপরের দুই দাদাও পুরনো বাড়ি থেকে বাবার আমলেই সরে গিয়েছিল। তাদের ছেলে, ছেলের ছেলে হয়ে গিয়ে বিশাল শাখা-প্রশাখা। প্রথম পক্ষের তিন মেয়ে, তাদের মধ্যে দুজন মারা গেছে, একজন শুধু জীবিত, তাদেরও নাতি নাতনিদের বিয়ে হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পক্ষের মা দুই ভাই আর শওকত পুরনো বাড়ি পাঁচ পাড়াতেই থাকত। আর এখন যে কারবালাতে বাড়ি করেছে, এখানেই শফী থাকত। ছোট একখানা বাড়ি। এখানেই তাদের বাবা এন্তেকাল করে বছর পঁয়ত্রিশ আগে। শওকতের তিন নম্বর মা এক ছেলে শফী আর মেয়ে রেহানাকে নিয়ে থাকত। শফীর বয়েস তখন বছর দশ, রেহানা বছর সাতেকের তখন বাবা মারা যায়। বাড়ি লাগোয়া বিশাল একখানা পুকুর ছিল। সেই পুকুর বুজিয়েই সাত বছর ধরে বাড়িটা করেছে শওকত। বারো কাঠার ওপর তিনতলা বাড়ি। তিন বছর হল এখানে উঠে এসেছে।

মৃত্যুর আগে বাবা শেষ বয়সে ছোট মায়ের নামে এই বাড়ি ও জমিই শুধু করে দিয়ে যায়নি, আরও দুটো বাড়ি করে দিয়ে যায় ছোট মা নিগার বানুর নামে। যুদ্ধের সময় মিলিটারি পোশাকের বিশাল অর্ডার পেয়ে বাবা আকরাম হোসেন তখন বিশাল টাকা কামিয়েছে। ইংরেজ বিবিদের গাউন সেলাই করে খেত। দ্বিতীয় বিয়েটা তাই যুদ্ধের সময়ই করে বসে। বছর পঞ্চাশ বয়স হয়ে গেছে তখন। দ্বিতীয় পক্ষের প্রথমে দুই মেয়ে হয়, তারপর দুই ছেলে। মেয়েদের নিজের হাতেই ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু তৃতীয় বিয়েটা করল আরও বয়সে। আরও দশ বছর পর আরও দশ বছরে বেশি বয়সে। তখন আকরম হোসেনের ষাট বছর হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলেরর নামে আর প্রথম পক্ষের ছোট ছেলে শওকতের নামে পুরনো বাড়ি আর এই তিন ছেলেকে পৃথক ব্যবসা করতে টাকা দিয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষের বিবি তাহেরা খাতুন পুরনো বাড়িতে দুই ছেলে আর প্রথম পক্ষের সতীনের ছেলে শওকতদের সঙ্গেই থাকত। এই বছর তিন হল মারা যায়।

পাঁচপাড়াতে থাকতে থাকতেই শওকতের ব্যবসা রমরমিয়ে চলতে থাকে। বেশিদিন নয় বছর পনের হল। পাঁচপাড়ার বাড়িটা বড় ছিল, অন্য দুই ভাইয়ের ব্যবসা তেমন সুবিধের হচ্ছিল না বলে জায়গার অসুবিধেতে পড়েনি শওকত। ব্যবসা রমরমিয়ে পাঁচ বছর চলার পর ব্যবসার জন্য নিজস্ব বড একখানা বাড়ির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তখন ছোট মা দুই বছর আগে সবে রেহানার বিয়ে

দিয়েছে একটা বাড়ি বিক্রি করে। বাড়িভাড়ার ওপর সংসার চলত। আর শফী বাবার মৃত্যুর পর পরই পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে পড়ে। ততদিনে বি এ পাশ করে, পড়ে পড়ে, নানা লোকের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে করে নাম কিনেছে, আর উদাস হয়ে যাওয়া শুরু করেছে।

ছেলে কিছুই করে না, উপরন্তু বি এ পড়েছে, দেদার হাতখরচ নিয়েছে, দেদার বই কিনেছে। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় বাড়ি বিক্রি করতে হল। ছোট মায়ের কাছে ছুটে এল শওকত। তখন শওকত ভাল টাকা করে নিয়েছে। ভালই চলছে 'হীরামন ড্রেস'। এমনি করে বাড়ি ভাড়ার সামান্য টাকায় কী করে চলে? শফীকে ব্যবসা করতে হবে। শিক্ষিত হয়েছে ঠিক আছে, বংশপরম্পরা থেকে যে ব্যবসা চলে আসছে, তাকে ছাড়লে চলবে না। এক লক্ষ টাকা দিল শওকত ছোট মায়ের হাতে, শফীকে ব্যবসা করতে। তখন তিরিশ হাজারে সমবায়িকায় স্টল মিলত। শফীর হাওড়ার সমবায়িকায় একটা স্টল হল, আর বাড়িতে ব্যবসা। একজন ভাল ম্যানেজার ঠিক করে দিল শুধু শওকত। তারপর এই পুকুর ভরাট করে বাড়ি করার ইচ্ছে প্রকাশ করল শওকত। সেই পুকুর ভরাট করে সাত বছর ধরে বাড়ি করতে সময় লাগল। অবশ্য নিজের নামেই জায়গাটা লিখে নিয়েছিল।

না, ছোট মা আর শফীকে ঠকাতে চায়নি। অমন শিক্ষিত ভাইয়ের সংসর্গে থাকার একটা বাসনাও হয়েছিল। টাকা পয়সা হয়েছে, তার সঙ্গে এই মর্যাদাটুকুও থাকুক। হাজার হোক ছোট মা তো তারই বাবার বিবি। বিধবার সম্পত্তি, হাতিয়ে নিতে চায়নি। কিন্তু এখানকার জমিটা প্রয়োজন হয়েছিল খুবই। আর সে ছোট মা ও শফীকে মদত না দিলে, শফীও এত পয়সাকড়ি করতে পারত না। আর নিজে হয়েছে প্রথম সারির বড়লোক ওস্তাগরদের মধ্যে একজন। যতগুলি হাট আছে ততগুলি স্টল। আর বাড়িতে বাইরের খদ্দের তো লেগেই আছে প্রতিদিন। দুটো প্রাইভেট কার আর দুটো ম্যাটাডর আছে নিজের। ছোট মায়ের পুরনো বাড়িতে গ্যারেজ আর গোডাউন আর ইসতিরিওয়ালা বসিয়েছে।

একতলার অর্ধেকটা শফীকে দিয়ে দিয়েছে। বাকি একটা অংশে বাইরের খদ্দেরদের বেচাকেনার ঘর। আর নীচের তলার অন্য অংশটা তো তিনটে ঘর, তার একটা রান্নার ভাঁড়ার, অন্যটা মেহমানরা এলে বসতে দেওয়া হয় আর একটাতে ছোটমা নিগার বানু থাকে। তেতলায় কাম কাটার একটা বড় হলঘর, আর আড়াআড়ি একটা ফালিতে তিরিশজন কলওয়ালার একটা নিজস্ব ইউনিট। দোতলায় ইন্টারলক মেশিন, বোতামঘর টেকার মেশিন বসেছে। আর গেজিং মেশিন বসেছে, ইলাসটিক সেলাইয়ের কাজ হয় এতে। একজন ওস্তাগর এই তিরিশজন কলওয়ালাকে খাটায়, ওস্তাগরের কাছে কাম দিয়ে কাম বুঝে নেয়। তাছাড়া বাইরের বিশ তিরিশজন ওস্তাগর কাম নিয়ে যায়। দশ বারোজন ফুল মেশিনের ওস্তাগর নিত্য কাম নিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে যাচ্ছে। তারপরে বিশ পঁচিশজন চুকি বালি আছে, যারা বোতাম টেঁকে বোতামঘর করে, তুরপাই করে দেয়।

শফী ও নিগার বানুকে ঠকায়নি শওকত। ঠকালে কি ঠকাতে পারত না? বাড়ি শেষ হওয়ার মুহূর্তে শফী তার কাছে এসে বলেছিল ধর্মে আছে, সম্পত্তি মানুষকে পরীক্ষা করে থাকে। আল্লার সুনজরে পড়ার জন্য ধনসম্পদ কোনো কাজে লাগবে না, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎ কাজ করবে, তারাই আল্লার দয়া পাবে। ধর্মের এই সতর্কবাণী শোনার পর শওকত নিজেকে কড়কে নিয়েছিল। কিছুতেই ছোট মা আর শফীকে ঠকানো চলবে না। লোভের হাতে পড়ে পরলোকের জীবন বরবাদ করবে? পরের মেরে খাওয়া, লোভ শঠতা ধর্মে কড়াভাবে নিষেধ আছে। কিন্তু ব্যবসা করতে ধর্মে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং নবি রশুলে করিম ব্যবসা করেছিলেন। ব্যবসায় যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আসছে, তার কি টাকা-পয়সার অভাব হয়েছে যে ছোট মা আর শফীর মতো আল্লাওয়ালা শিক্ষিত ভাইকে ঠকাতে হবে তাকে? বরং শফী তাকে চেতাবনি দিয়ে ভাল করেছে, মনের ভেতর যেটুকু ঠকাবার মতলব ছিল, সে-সব নির্মূল হয়ে গেছে। প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়া যায়। বাড়ির একতলার অর্ধেক অংশ শফীকে ছেড়ে দিয়েই খালাস হল না, সেদিকের তিনতলার ঘরে শফীর থাকার ব্যবস্থা করল। ছোট মা আর শফীকে তার পরিবারের সামিল করল। তাদের সঙ্গে থাকে, খায় দায় তারই কাছে, কোনো খরচ-বরচ করতে দেয় না।

ছোট মা তার বাবার বিবি, তার মা। আর শফীর মধ্যে তার বাবার শরীরের রক্ত বইছে, আত্মিক এক আবেগ অনুভব তাকে এমন উদার করে ছেড়েছে, স্নিগ্ধ নরম এক সুসম্পর্কে নিয়ে গেছে। আর শফীর সংস্পর্শে এসে ধর্মের ছায়া খুঁজে নিয়েছে বেশি বেশি করে। এই সব ধনসম্পত্তি ছেড়ে দিয়েই চলে যেতে হবে আল্লার কাছে। একটা ফুটো কড়িটি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে না। একমাত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে নিজের আমলনামা অর্থাৎ কর্মলিপি। যে সব ভাল খারাপ কাজ করেছে তারই হিসেব-নিকেশটুকুই সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যাবে।

নতুন বাড়িতে ব্যবসা ও বসবাস উঠিয়ে এনে ব্যবসায় তো আরও উন্নতি করেছেই, তার সঙ্গে আল্লার কাজে ধ্যান দিয়েছে বেশি করে, শফীর সংস্পর্শই অনেকটা তাকে প্রভাবিত করেছে। জগতের সুখে মজে থাকতে দেয়নি শফী, মাঝে মাঝে শফী তাকে কড়কে দিয়ে যায়। দান খয়রাত বিস্তর করেছে। কন্যাদায়গ্রস্ত কোনো মেয়ের বাবা তার কাছে এসে হাত পাতলে তাকে ফেরায় না। গত বছর হজও করে এসেছে সে। মাদ্রাসা মক্তবে মোটা চাঁদা দেয়, সমাজসেবার কোনো কাজে নিজে যেচে গিয়ে চাঁদা দিয়ে আসে। তাতে সামাজিক মান মর্যাদা বাড়ে তার। অনেক শিক্ষিত মানুষদের সংস্পর্শে এসে পড়ে, তাদের সালাম পায়, তাদের মান্যতা পরিতৃপ্ত করে শওকতকে। কীভাবে এখানকার মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাবে, সে ব্যাপারে শওকতের মধ্যেও এই আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে।

এই যে তিন মঞ্জিলওয়ালা আলিশান বাড়ি করল শওকত লাখ কুড়ি টাকা খরচ করে, সে বাড়িতে কিন্তু শওকত থাকে না। নতুন বাড়ি লাগোয়া শফীর

ঘরের একটা একতলা ঘরে সে থাকে। ওই বাড়িতে কেন সে থাকে না, সেইই একমাত্র জানে। বাড়ির সকলে তাকে পেড়াপীড়ি করেছে, তার সুখে থাকা চেয়েছে, কিন্তু সে ওই বাড়িতে থাকার সুখ নিজের থেকে পায়ে ঠেলে দিয়েছে। ওই বাড়িতে প্রচুর সুবাতাস খেলে, বসবাসে বেশ আরাম যদিও। তিনতলার দক্ষিণ দিকের একটা ঘর তার থাকার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেই ঘরে এখন তার বউ কিসমত থাকে। একরকম কিসমতকে ছেড়ে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নতা এক অর্থে বিরহ মেনে নিল শওকত। কিসমতের ইচ্ছে, সে এ বাড়িতে থাকুক, তার একা একা থাকতে ভাল লাগে না। আর জীবনের এই শেষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বেলায় স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের কাছ থেকে সরে থাকা কষ্টকর। পুরনো ওই বাড়িতে কিসমতও উঠে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে আসতে দেয়নি শওকত। এই বাড়িটাতে গ্যারেজ, গোডাউন, ইসতিরিওয়ালা কাম করে, কাজের লোকজন শুধু সেঁধোচ্ছে বেরচ্ছে, মেয়েমানুষের থাকার কোনো পর্দা নেই, তাই আসতে দেয়নি কিসমতকে।

বড় বাড়ির অন্যদিকের তিনতলার যে ঘরটাতে শফী থাকে, শফী সেটা ছেড়ে দিয়ে শওকতকে থাকতে বলেছিল। আর সে থাকবে পুরনো বাড়িতে। শফীকে সে নিরস্ত করে। ওই বাড়িতে থাকার ঘরের অভাবের জন্য সে থাকেনি। তার একা একা থাকতে ভাল লাগে বলে থাকছে। কিন্তু এই একা একা থাকতে যে তার খুবই কষ্ট হয়, ভাল লাগে না, সেটা সে নিজে নিজেই অনুভব করে নিজে নিজেই কষ্ট পায়। সে কেন সকলের সঙ্গে থাকে না সেটা একমাত্র সেই জানে। কারুর কাছে কোনোদিন প্রকাশও করেনি। ছোট মা নিগার বানুর জন্য। বাবার বিবি, তার মা। তারই সমবয়সী। বয়সকালে যে রূপ সৌন্দর্য ছিল, তাতে মুগ্ধ হয়েই না বাপ ওই বুড়ো বয়সে নিগার বানুকে বিয়ে করে বসে। সেই থেকে নিজের কৈশোর থেকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে এসেছে ছোট মাকে শওকত। কখনোই তার মায়ের রূপ, সৌন্দর্য তার চোখে না পড়ে, তার চাহনিতে দেখার পাপ বিন্দুমাত্র উঠে না আসে, এ ব্যাপারটা সে রক্ষা করে এসেছে। কিছুই নয়, এটা তার একটা মানসিক তাড়স, সে নিজেই তৈরি করেছে। নিজেই বহন করে যাচ্ছে। নতুন বাড়িটা তিনতলা দুদিক দিয়ে ভাগ করা। দুদিকেই সিঁড়ি আছে। মাঝখানের সিঁড়ি দিয়ে ডানদিকের অংশটা কারবারের কাজে ব্যবহার হয়। বাকিটা অন্দরমহলের দিক দিয়ে সিঁড়ি। কাজ কারবার লোকজন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অন্দরমহল। নতুন বাড়ির কারবারের অংশে একটা ঘরে বসবাস করতে পারত শওকত, কিন্তু তাতেও সাহস খুঁজে পায়নি। নীচের তলায় অফিসঘরে বসে, কিন্তু রাত্রিবাস করে না। অন্দরমহলে যায়, কিন্তু বসবাস করে না। শুধুমাত্র ছুটির দিন বুধবারটা সে বেছে নেয় কিসমতের সঙ্গে কাটানোর। কাজের ব্যস্ততার যুক্তি থাকে না সেদিন, তাই তার মনের আড়ালটা লুকোবার জন্যই ওইদিন অন্দরমহলে গিয়ে গোসল করে, খায় দায়, দুপুরে কিসমতের ঘরে ঘুমোয়, ওই একদিন রাত্রিবাস পর্যন্ত করে আসে।

তার মন যে ভয়ে আক্রান্ত তাকে লুকোবারও প্রয়োজন হয়, তাকে যাপনও সে করে। সতর্কতার সঙ্গে একটা দিন ও রাত কাটিয়ে আসে। কেন না যৌবনে কোনো এক সময়ে তার মা নিগার বানুকে দেখে অদ্ভুত এক ভাল লাগা বোধে আক্রান্ত হয়েছিল সে। এই দেখার ভেতর আক্রান্ত হওয়া যে পাপ, অন্যায়, অধর্ম মুহূর্তে বুঝে নিয়েছিল সে। নিগার বানুকে সম্ভ্রমের চোখেই দেখে এসেছে। যতই রূপ থাকুক তার, নিগার বানু তার মা। তার এই চিত্তবৈকল্য তার নিজেরই। কিসমতের কাছ থেকে দূরে থেকে নিজে যে বেদনা পায়, সেটাকে সে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে, কিন্তু সে মানে, তাকে ছেড়ে থাকার কষ্ট কিসমতের মনের ওপর জীবনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে সে। এখানেই একটা অস্বস্তি। আর কিসমত তো থাকে ছেলেদের বউ নাতি-নাতনি ছেলে-মেয়েদের ভেতর, মেতে থাকার সাংসারিকতায়ও পৌঁছে গেছে সে। অসুবিধে কোথায়?

আর এ বাড়িতে উঠে আসার পর পরই নিগার বানুর শওকতের ওপর স্নেহ বেড়েছে। সংসারে সব সময় টিক টিক করে, বেটা এই খায়, সেই খায়। এখনও নাস্তা পৌঁছনো হল না কেন? সে তো এসব করবেই, তার তো ছেলে, শওকতকে নিয়ে এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই। সমস্যাটা কারুরই কোনো থাকার কথা নয়। এটা একটা রোগ শওকতের, ছোট মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা সম্ভ্রমবোধে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর তার রোগলক্ষণ আড়াল করার জন্যই দূরে থাকে। সংসার চলে, ব্যবসা চলে ঠিকঠাক। যত দিন যাচ্ছে ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। অন্য এক সুখানুভূতির মধ্যে চলে গেছে শওকত। ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্য থেকেই খদ্দেররা তার মাল কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এলাকায় সুনাম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সে। ব্যবসার ভেতর আর এই মান্যতার ভেতর আনন্দ খুঁজে পায় অনেক বেশি। মেতেও থাকা যায় বেশ। সেই সঙ্গে ধর্মকর্ম সমানতালে করে যেতে পারছে. পরলোক বরবাদ হতে দেয়নি, আবাদ করে যায়। তাতে শান্তিও জোটে বেশ। কখনও কখনও ঠোঁটে পরিতৃপ্তির এক প্রশান্তি ফুটে ওঠে। সে কোনো অধর্ম করেনি. অন্যায় করেনি। মুনাফেক নয়। ধর্মের সুপথে সে চলেছে। সে শিক্ষিত নয়, এখন তাকে কি কেউ এই দুয়ো দিতে পারে? তার টাকা পয়সা এসব মুছে দিয়েছে। অনেকেই ভুলে গেছে কোনোমতে নিজের নামটা সই করে, খানিকটা আঁকার মতো করে। শফী তার শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে তার পরিবারকে মর্যাদার আসন দিয়েছে। আর তার মেজ পুত্রবধূ শবনম পরভিন সে তো বি এ পাশ, মেজ ছেলে আশিক নাইন পর্যন্ত পড়েছিল মাত্র।

খুব সুখে আছে শওকত। এসব তার নিজের চেষ্টায় হয়েছে। ঘর সংসার সুখে ঝলমল করছে। হীরের টুকরো দুজন ছেলেকে ব্যবসায় না পেলে এতটা উন্নতি করতে পারত না। আর ওসমান আলির মতো দক্ষ ম্যানেজার সে পেয়েছিল বলেই। খুবই বিচক্ষণ আর সৎ। তার বিচক্ষণতা ও সততার পুরস্কার ওসমান আলিকে দিয়েছে শওকত। গরিবের ছেলে, ভাল ঘরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, লিচুতলায় বাড়ি

করে দিয়েছে। একবার ভেবে নিয়েছিল নিজের বড় মেয়ের সঙ্গে ওসমানের বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু মেয়ের বিয়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেওয়ার বাসনা ছিল। যদিও সে বাসনা পূরণ হয়নি শওকতের। ওসমানের আগে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য ওসমানকে জামাই করতে পারেনি সে।

খুব সুখেই ছিল শওকতউল্লা, হঠাৎ প্যারের ভাই শফীউল্লা তার মনের মধ্যে এক গিঁট বসিয়ে দিল। দুদিন আগে কাদের মৌলবিকে তার পাণ্ডিত্য দিয়ে হারিয়ে দিয়েছিল, এমনকী মারধোর পর্যন্ত করেছিল, সে-সব তার কোনো দোষ নয়, গুণ, এমন একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটাবার পরে, এ কি করল শফী, গত সন্ধ্যায় সেই কাদের মৌলবিকে সঙ্গে করে নিজের বিয়ে নিজে পড়িয়ে নিয়েছে? কেউ জানল না, তার ওই বিয়ে করা উচিত কি অনুচিত, অমনি দুম করে বিয়ে করে বসল? তাও কিনা লিচুতলার প্রায় আধবুড়ি বিধবাকে, এক গরিব পরিবারে। এমন এই বাড়ির ছেলে সে, তার অমন বিয়ে করে ফেলার জন্য কোনো মান থাকে নাকি?

বিয়ে করবে জানালে পাত্রীর অভাব হত নাকি? সম্ভ্রান্ত পয়সাওয়ালা বাড়ির সুন্দরী কমবয়সীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য কত বাপ ল্যা ল্যা করত। আর এ বাড়িতে বিয়ে শাদি ধুমধামের সঙ্গে হয়। আর শফী কিনা মৌলবিকে বগলদাবা করে সহসা ছোটলোকের মতো বিয়ে করে ফেলল? কী দরকার ছিল আধবুড়ি বিধবাকে বিয়ে করার? বিধবা বিয়ে করার যদি খায়েশ ছিল, সম্ভ্রান্ত বাড়িতে কি তেমন বিধবা ছিল না, যার বয়েস কম, সেও কম সুন্দরী নয়? শুনছে এই আধবুড়ি বিধবাটি নাকি সুন্দরী, সেটাই বোধহয় শফীর একটা দুর্বলতার জায়গা। কিন্তু বয়সটা দেখল না? আর গরিব ঘরের বিধবা ও সুন্দরীকে বিয়ে করার শখ মেটাতে যদি চেয়েই থাকে, আধবুড়ি বিধবাকে বেছে নেবে কেন? কম বয়সী সুন্দরী বিধবা ছিল না? আর সেই আধবুড়ি বিধবাতে যদিই তার মন মজে যায়, সে তাকে বিয়ে করার লোভ সামলাতে না পারে, কোনো ভাবে সেই আধবুড়ি বিধবা তার মন মজিয়েছে, তাহলে সেই বিয়েরও এক তরিকা আছে। বরং সেই তরিকায় বিয়ে করলে, এ বাড়ি একটা বেমিশাল দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারত? কীসের অভাব ছিল? টাকা পয়সার তো অভাব ছিল না। এখানকার ধনী ওস্তাগররা গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়ে দেখে পছন্দ করে ফেললে, সে বিয়ে দেওয়ার এক রীতি রেওয়াজ তৈরি হয়েছে। প্রচুর ধুমধাম হয়, মেয়ে পক্ষকে কোনো কিছু দিতে হয় না, গহনায় মুড়ে আনা হয়, মেয়েপক্ষকে ধুমধাম করার জন্য যত টাকা লাগবে, সব দেওয়া হবে, বিশাল বরযাত্রীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা, মেয়েপক্ষের ব্যবস্থাপনায় হবে, কিন্তু খরচ করবে পাত্রপক্ষ। তাতে নাম ফাটে ভাল। আর এমন সুযোগ ছেড়ে দিল শফী? শওকতকেও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দিল না? এক্ষেত্রে শুধু গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়েই নয়, বিধবা আবার আধবুড়িকে বিয়ে করেছে সে। যত বেশি সুনাম পেত, তত বেশি বদনাম পাচ্ছে এখন। বড় বাড়ির লোকটা এক গরিব ঘরের আধবুড়ি বিধবাকে বিয়ে করেছে চাকরবাকরের মতো। মান ইজ্জত মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল ছোটভাই শফীউল্লা।

অন্তঃপুর থেকে ডাক পড়েছে, তাকে যেতে হবে। নিগার বানু, তার ছোট মা তাকে এত্তেলা পাঠিয়েছে। এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সামনে পড়েছে শওকত। যে নিগার বানুর ছায়া মাড়াবে না বলে ওই রকম বাড়িতে বসবাসের সুখবিলাস নিজে থেকে ত্যাগ করেছে, এমনকী স্ত্রীকে ছেড়ে থাকে সপ্তাহে ছদিন, আজ কিনা এই সকালেই ঢুকতে হবে অন্তঃপুরে, নিগার বানুই তাকে ডেকেছে, তার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে? অদ্ভুত এক মানসিক মার শুরু হয়ে যায় তার মনের মধ্যে। শফীই এই উদ্ভূত সমস্যা তৈরি করেছে, অমন একটা বিয়ে করে, সেজন্যই তাকে ডাকা হচ্ছে। রাগে গর গর করে শওকতউল্লা, অদ্ভুত নিজস্ব এক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে।

৭

গোরস্থানে শাহনাজ বেগমকে নিকা করে, ওই রাতে তাদের লিচুতলায় পৌঁছে দিয়ে, বাড়ির সামনে একটু রাস্তার আলোয় শাহনাজের মুখ দেখেছিল শফী, তারপর হাত বাড়িয়ে শাহনাজের বাঁ হাতটা ধরেছিল অল্পক্ষণ, শাহনাজের হাতের স্পর্শের ভেতর দিয়ে শাহনাজের সমস্ত শরীরের কাঁপুনি অনুভব করেছিল, তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলেছিল শফী। আজ রাতে শাহনাজের সঙ্গে তার বাড়িতে থাকতেই পারত সে, অথবা নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারত শাহনাজকে।

কিন্তু অসুবিধেটা দুপক্ষেরই ছিল। হুট করে যেতে বললেই তো যেতে পারে না শাহনাজ, শফীউল্লাও নিয়ে তুলতে পারে না, তার জন্য বন্দোবস্তের প্রয়োজন। আর তাছাড়া শাহনাজ সন্ধ্যায় তার বাড়িতেই ছিল, বিধবা বেশে, মেয়ে ও খালার সঙ্গে। কত সংযুক্তি ছিল, আচমকা চলে যাওয়াও মুশকিল। শফীরও সাহস হল না গোরস্থানে বিয়ে করার পর গোরস্থান থেকেই শাহনাজকে হাত ধরে নিজের বাড়িতে তোলার। বিয়ের পর ফেরার সময়, শাহনাজও শফীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করেনি, সে তারই সঙ্গে যাবে সেই আকুলতা দেখায়নি, বিবাহউত্তর মুহূর্তে অদ্ভুত এক অসম্পর্কের ব্যবহার তারা করেছে নিজেদের মধ্যে। যেন সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত তাদের জীবনযাত্রার প্রভাব তাদের ভেতর থেকে সরে যায়নি, যেন তারা সেই দৈনন্দিনতার অভ্যাসে লাগু হয়ে গিয়েছিল। শুধু বাড়ি পর্যন্ত শাহনাজকে পৌঁছে দেবার সময়, বাড়ির কাছে গিয়ে শাহনাজের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়, শাহনাজ তার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল একটিবার, তখন তার সেই প্রথম সম্পূর্ণ মুখটা দেখেছিল। রাস্তার আলোয়। আর হাত বাড়িয়ে শাহনাজের বাঁ হাতটা ধরেছিল। তার হাতের মধ্যে শাহনাজের সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপছে, এই অনুভব পেয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিল।

কোনো কথা হয়নি, নিয়ে যাবে কিনা, তার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে কিনা, আগামীকাল তার কাছে শফীউল্লা আসবে কি না, কোনো কথা হয়নি। আকস্মিকতার

এক ধরনের চাপ উভয়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল বলেই, বিয়ে করার পরের মুহূর্তেও শফীউল্লা অকৃতবিবাহের দশার মধ্যে থেকে গেছে, শাহনাজও কাজী মহরমের ব্যাওয়ার জীবনযাপন পছন্দ করে নিয়েছে। বিয়ে করার আগেও যেমন উভয়ের মধ্যে অপরিচয়, অসম্পর্ক, দূরত্ব ছিল, বিবাহউত্তরও তেমনটা ঘটে গেল। শুধু শফীউল্লা সাহস করে শাহনাজের বাঁ হাতটা ধরেছিল এই যা, কিন্তু সেই স্পর্শে শাহনাজ ভয়ে কাঁপছে, এ অনুভব তো পেয়েছে শফী? তক্ষুণি মনে হয়েছিল, কোনো বিধবার হাত সে লাম্পট্য দিয়ে ধরেছে, ভয়ে কেঁপে ওঠার অনুভব পেয়ে, অনেকটাই সেই অবৈধ লাম্পট্যের বিভ্রান্তিতে হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল।

ফিরতে ফিরতে এই বিশ্বাস তার মস্তিষ্কে ঢোকাচ্ছিল, না শাহনাজ তার ধর্মসম্মত স্ত্রী, তার প্রতি কামনাবাসনা আসক্তি, এসব তার জন্য বৈধ। সন্ধ্যা পর্যন্ত শাহনাজ কাজী মহরমের বিধবা স্ত্রী ছিল, এই মুহূর্তে এখন আর নেই, এখন সে শফীউল্লার বিবি।

কিন্তু সে পৌঁছবার আগে আগে তার এই নিকা করার চাঞ্চল্যকর সংবাদ বাড়িতে পৌঁছে গেছে, সারা মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ছে। গোরকোনরা বাইরে এসে মুখে মুখে ছড়িয়েছে।

রাতের খাবার খাওয়ার জন্য তাকে অন্দরমহলে যেতে হয়। সরাসরি সে অন্দরমহলেই ঢুকল। কেন না রাত হয়েছে। বাড়ির এদিকের অংশে কলওয়ালারা মেশিন চালিয়ে সেলাই করে চলেছে, ঘরর ঘরর অনেকগুলি সেলাই মেশিনের সম্মিলিত শব্দ, আর তারা জোরে জোরে টেপ বাজিয়ে হিন্দি গান শুনছে। কলওয়ালারা অনেক রাত পর্যন্ত এভাবে রাতকে কর্মচাঞ্চল্যে ভরে রাখবে।

কিন্তু বাড়ির অন্যদিকের অংশে, যে দিকে অন্দরমহল, সেদিকে তো রাত হয়েছেই। বাড়ির অভ্যস্ত পরিবেশে এসে কেমন যেন আজকের সান্ধ্য অভিযানের ঘটনা মন থেকে মুছে যায়। সে ভুলেই গিয়েছিল, আজ একজনকে একটু আগে বিয়ে করে এসেছে। বাড়িতে ঢুকে অচেনা কোনো জায়গায় এসে পড়েছে হঠাৎ মনে হয়েছিল তার। ভাল করে চোখ ঘুরিয়ে দেখল, অন্দরমহলের রান্নাঘর, কলঘর, বারান্দা কোনো কিছু অপরিচিত নয় তার। এমনকী দালানে ওঠার সিঁড়ির ওপর, থামের পাশটিতে তাদের পাঁশুটে রঙের মেনি বেড়ালটা প্রতিদিনের মতো এক ভঙ্গিতে, একই জায়গায় বসে আছে। দালানে কলতলায়, রান্নাঘরে, খাবার ঘরে, বসবার ঘরে তার মায়ের শোবার ঘরে, তেমনই আলো জ্বলেছ। কিন্তু প্রতিদিনের মতো সবাইকে চোখে পড়ছে না, অথচ সকলে আছে, তার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। সিঁড়ির দিকটা খাবার ঘর। তার পাশে বসবার ঘরটার গায়ে দালানের আলোটুকু নেভানো আছে। কারুর কারুর নড়াচড়া ও বসে থাকার ছায়া-অবয়ব বোঝা যাচ্ছে। সবাই আছে বোঝা গেল। বাড়ির কাজের মেয়েটা রান্নাঘরে বাসন-কোসন তুলছে, তার সঙ্গে হালকা স্বরে ভাবি কথা বলছে, খানিকটা বকুনির সুর আছে কণ্ঠে—এবারে সেই কণ্ঠস্বর এই এতক্ষণ পর বেজে উঠল।

ছোটমা, মানে তার মাকে কোথাও খুঁজে পেল না। নিশ্চয় ঘরে গিয়ে শুয়েছে, হয়তো শরীর খারাপ, প্রেসার বেড়েছে। কিন্তু যত রাত হোক, সবার খাওয়া না হলে দালান ছেড়ে তো ঘরে ঢুকে যায় না, যতই শরীর খারাপ হোক, প্রেসার বাড়ুক, সিঁড়ির গায়ে, খাবার ঘরের দরজার সামনে চেয়ারে এসে বসে থাকবে, দালানের সিলিং ফ্যানটা তার মাথার ওপরেই ঘুরতে থাকবে। পাখাটা ঘুরছে, চেয়ারাটা আছে, অথচ ছোটমা আজ ওখানে বসে নেই।

দালানের ওপর উঠে নতুন মায়ের চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল শফীউল্লা। দালানের অন্ধকার অংশটা থেকে ভাইপো আশিকের বউ পরভিন বেরিয়ে এসে সহসা গায়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

মেজ ভাইপো আশিক মাথা নিচু করে তার পাশ দিয়ে ওপরের সিঁড়ির দিকে চলে গেল। দোতলার ঘরে সে উঠে গেল। ভাইপো তার দিকে চোখাচোখি করল না। অথচ ভাইপোর দিকে তাকিয়েছিল শফী, কিন্তু ভাইপো আশিক মুখ নিচু করে রাখার জন্য চোখাচোখি করতে পারল না। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে সব কিছু। মাকেও দেখা যাচ্ছে না, ভাবিও রান্নাঘরে অদ্ভুত রাগ করে কথা বলছে কাজের মেয়ে ফারজানার সঙ্গে। দালানের পশ্চিম দিকটাতে আলো নেভানো, আর তার ভেতর যারা আছে, তাদের ছায়া-অবয়ব অল্প নড়ে, কিন্তু নিশ্চুপ। ব্যাপারটা কী, কেন এমন অস্বাভাবিকতা? তার নিকার খবর পেয়ে গেল নাকি? এত তাড়াতাড়ি? এই তো সবে নিকা করে বেরিয়ে এসেছে, এর মধ্যে কি বাড়িতে খবর পৌঁছে গেল? সেই আশঙ্কায় কেমন কুঁকড়ে গেল সহসা শফী ভয়ে। কারুকে সে তেমন ভয় পায় না, মা আর ভাবিকে সে ভয় পায়। ভাইপোরা তো মুখের সামনে কথা বলতে পারে না, ভাইপোদের বউরা তাকে শ্রদ্ধা সহবত দেখিয়েই আসছে। ভাইঝি নাফিসার অল্প বয়েস, তার স্নেহ-আদর পেয়েই বড় হয়ে উঠেছে, সে তো তার দিকে অসম্মানের দৃষ্টি ফেলতেই পারবে না। বড় ভাইপো মেহবুব একটু গোঁয়াড় গোছের, দুম করে মাথা গরম করে ফেলে। ভয় তাকেও নয়। কেন না কাকা বলতে মেহবুবও অজ্ঞান। শুধু মা ও ভাবিকে ভয়। আর দাদা? সে এভাবে বিয়ে করার জন্য একমাত্র দাদা শওকতউল্লারই সমাজে মাথা হেঁট হয়ে যাবে। ভাইপোদেরও দুয়ো দেবে তাদের বন্ধুবান্ধবরা। সে যদি দেড় দুই লাখ টাকা খরচ করে এই শাহনাজকেই বিয়ে করত, তাহলে পরিস্থিতি এ রকম হত না। লাখখানেক টাকা দাদাই খরচ করে ফেলত। কিন্তু সেভাবে বিয়ে করতে চায়নি শফীউল্লা। তার অসুবিধে বুঝেই তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিয়েছে।

এখন এই রাতে বিয়ে করে বাড়িতে ফিরে, বাড়ির লোকজনদের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ টের পেয়ে বুঝতে পারে নিশ্চিতভাবে বাড়ির লোকজন জেনে গেছে, তার সদ্য বিয়ে করার খবর। তার মানে তার ফেরার আগে আগেই তার বিয়ের খবর তারই বাড়িতে আসছিল। এখন দাদার মুখোমুখি হতে হবে না তাকে। আজ শুক্রবার, বুধবারের আগে এ বাড়ির অন্তঃপুরে দাদার সঙ্গে তার মুখোমুখি

হতে হবে না। বাড়ির বাইরে কারবারে, দাদা শওকতউল্লা কখন কী করে সব রুটিনমাফিক, যাতে মুখোমুখি হতে না পারে বুদ্ধি করে চলাফেরা করলেই হবে। কিন্তু দাদার মুখোমুখি হওয়ারও সমস্যা আছে। সে পরে ভেবে নেওয়া যাবে। এখন ভাবি আর মায়ের মুখোমুখি হতে হবে সম্ভবত তাকে।

হঠাৎ মনে হল, এমন ভয় পাবেই বা কেন, এমন কুঁকড়ে যাবেই বা কেন, সে কী অন্যায় করেছে? বিয়ে করেছে, সেটা অন্যায় হতে যাবে কেন?

'কথাটা সত্যি?'

অন্ধকারের ভেতর মায়ের কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল শফীকে উদ্দেশ্য করে। যেন কোনো আকাশবাণী, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ শুনছে। কোনো নবিকে ফেরেস্তা মারফত ঈশ্বর প্রত্যাদেশ দিচ্ছে, তার সামনের বাস্তবতার ভেতর সেই অতীতের প্রভাব এসে বসে। সে সজ্ঞানতায় অনুভব করে এটা তার মায়ের কণ্ঠস্বর, আর তার দিকে কড়াস্বরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে।

'হ্যাঁ।'

'কবুল করতে লজ্জা করছে না? জানোয়ার কোথাকার! কতবার বিয়ে দিতে গেছি, বিয়ে করলি না, এখন মান-ইজ্জত মিটিয়ে দিয়ে বিয়ে করলি? কেন আর কোনো মেয়ে কি ভূভারতে ছেলো না যে নূরজাহানের আধবুড়ি ব্যাওয়া বোনঝিকে বে কত্তে হবে?'

'আমার ইচ্ছে করেছে, বিয়ে করেচি।'

'বংশ মর্যাদা বলে কিছু নেই, বিয়ে বললেই বিয়ে?'

'দুজনে রাজি থাকলে, হ্যাঁ বিয়ে হয়ে যায়, আর কিছু লাগে না।'

'আমাকে পুঁথিপড়া বিদ্যে দিতে এস না, আমি তোকে দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছি, আমি তুমার মা। কী হল যে এমন করে, এমন ঘরে, এমন মেয়েকে বে করে ফেললে? কী দেখিয়ে ভোলালো তুমাকে সি মাগি যে তুমি বে করে ফেললে? ঠিক জাদু জানে!'

'তার দোষ নাই, আমিই তারে নিকার প্রস্তাব দিয়েছি, নিকাতে রাজি করিয়েছি।'

'সি তুমার মন ভোলায়নি আগে, বলতে চাও, সি আগে তুমার মনে লোভ জাগায়নি বলতে চাও?'

লোভ জেগেই ছিল প্রথম দেখায়, তার পরিণতি এই বিয়ে। মা শাহনাজের দোষ কোথায় খুঁজছে তখন, ছেলের প্রতি অন্ধ স্নেহের টানে, ছেলের এই সর্বনাশের কারণ খুঁজতে চাচ্ছে, ছেলের অপরাধকে স্বার্থপরের মতো সরিয়ে ফেলে, একমাত্র শাহনাজের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিতে পারলেই তার শান্তি ও স্বস্তি আর আত্মরক্ষার সঠিক মুক্তি খোঁজা হবে। 'তাকে দেখে আমার পছন্দ হয়েছিল, তাকে কোনো দোষ দিও না।'

'ঠিক ধরেছি, তোমাকে সে নিজেকে দেখিয়েছে, তুমি না হলে তাকে দেখবে

কী করে?' সুইচ বোর্ডের কাছে এসে দালানের পশ্চিম দিকের আলোটা জ্বালিয়ে দেয়। যারা সব অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তারা এখন লজ্জা পেয়ে যায়।

বরং তারা এভাবে শফীউল্লার দিকে অন্ধকারে আত্মগোপন করে দেখছিল বলে, সেই অপরাধে, শফীউল্লার কোনো পরিবর্তন এল না ভঙ্গিতে, এমন একটা সদ্য বিয়ে করে আসার লজ্জাবোধও ভঙ্গির মধ্যে গড়ে তুলতে হল না।

কেউ চলে গেল রান্নাঘরে, কেউ গেল বাথরুমে, কেউ বসার ঘরে ঢুকে গেছে কিন্তু সবাই দালানের এই দৃশ্য আড়াল থেকে দেখছে, শুনছে। শফীউল্লার ভাবি কিসমত আরা রান্নাঘরে কাজের মেয়ে ফারজানাকে নিয়ে কাজ তদারকি করছিল কিছু বাসন-কোসন ধুইয়ে নিশ্চিল, মাংস, নানা রকম তরকারি গরম করাচ্ছিল পুরুষদের সব খাওয়া হয়ে গেছে, শফীর খাওয়া হয়ে গেলেই ঝেঁটিয়ে সব মেয়ের খেয়ে নেবে। এই দৃশ্য গড়ে ওঠায় কিসমত আরাও রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিল, শুনছিল। সে সোজাসুজি দেওরকে দেখিয়েই এই দৃশ্য দেখছিল লজ্জা পাচ্ছিল না, শফীউল্লার সম্মানে লুকিয়ে দেখছিল না, শুনছিল না। কেন না শফীউল্লা তার দেওর আর তার থেকে বয়সে ছোট, একটা শাসনেরও অধিকার আছে শফীউল্লাকে ঘিরে। তার পেছনে কাজের মেয়ে ফারজানা উঁকি-ঝুঁকি মারছে

'মাগিটা তোমার মন মজিয়েছে, এবার বুঝেছি। না হলে তোমার মতো ছেলে বলা নেই কওয়া নেই, দুম করে বিয়ে করে বসবে কেন?'

'আম্মি, তার দোষ দিও না।'

'উহু, দরদ যে উথলে উঠছে, কতদিন ধরে তুমার মাথা খেয়েছে কী জানি!' রানাঘরের দরজার কাছ থেকে চাপাস্বরে বলে ওঠে ভাবি কিসমত আরা।

'সেই মেয়ে তুমার কত বড় সর্বনাশ করছে, জেনেও বিয়ে করলে? বিয়ে করেও বুঝতে পারছ না কত বড় সর্বনাশ করেছে তোমার সে?' মা নিগার বানু তার জায়গা থেকে নড়ছে না।

'আমার কোনো সর্বনাশ করেনি সে। পাপ থেকে বাঁচিয়েছে আমাকে সে। তাকে দোষ দিও না। সে যদি আমাকে বিয়ে না করতে রাজি হত তাহলে আমার ইহলোকের পাপ বেড়ে বেড়ে পরলোককে বরবাদ করে দিত।'

খুব গোলমেলে স্বীকারোক্তি। নিগার বানু মুখ ফসকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল আর কী, তার কী পাপ? কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে, সেই আশঙ্কায় থেমে যায় নিগার বানু। শফীউল্লা যেমনই সৎ তেমনই সত্যবাদী, সত্য কথা বলতে ভয় পায় না, ফস করে তার গোপন পাপের কথাটা বলে ফেললে খারাপই হবে, কাজের মেয়ে, বাইরের লোকও আছে। নিগার বানু অনুমান করে নেয়, শফীউল্লা এমন অবৈধ কিছু মেয়েটির সঙ্গে করে ফেলেছে, বিয়ে না করলে অধর্ম হত। ছেলে যা সত্যবাদী, সৎ, এক্ষেত্রে ছেলে যা করেছে নীরবে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, তার সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করতে যাওয়া বরং বিপদ ডেকে আনবে দ্রুত সামলে নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় নিগার বানু।

৮

বাড়ির লোক সংবাদটা রাতেই পেয়ে গিয়েছিল, শওকতউল্লা পেল ভোরবেলা, মসজিদে নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসার সময়, হানিফ চাচা খবরটা দিল তাকে। একই সঙ্গে মসজিদে শফীউল্লাও নামাজ পড়ছিল, কথাটা হানিফ চাচার মুখে শুনে ঘুরে দেখতে গিয়ে আর শফীকে দেখতে পেল না, ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে শফী। না হলে রাগের মাথায় পড়ে চড়-থাপ্পড় বসিয়ে দিত। সবটা শোনেনি, কিন্তু বিধবা আধবুড়ি গরিবের মেয়ে আর গামছা পরা গোছের বিয়ে হয়ে গেছে, এইটুকু শুনেই মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল শওকতউল্লার।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় সামান্য টাকা পয়সা করা পাড়ার ওস্তাগররা তার দিকে চোখ তুলে দেখছে দেখে মাথা আরও গরম হয়ে যায় শওকতের। এসব কারবারিরা, তার কারবারের পাঁচশো মাইল দূরে, কত তফাৎ তার সঙ্গে এদের। কেউ কেউ সামান্য টাকা করে ফেলে একটু বড়লোকি ভঙ্গি হাঁটাচলায় আনলেও শওকতের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মাথা নিচু করেই যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নামাজ পড়তে এসেছিল, বাইরে বেরিয়ে বাড়ির পথে দাঁড়িয়ে, তাদেরই দু-একজন শওকতউল্লার দিকে চোখ তুলে দেখছে? ওরা এভাবে তার দিকে তাকানোর সাহস কোথা থেকে পেল, জানতে অসুবিধা হল না শওকতের। শফীর এই অপকর্ম তাদের সাহস এনে দিয়েছে। এত বড় দুঃসাহস এদের, এরা তাকে এই সকালে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে? বোঝাচ্ছে, অত যে তোমার টাকা-পয়সা, কারবারে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে বিস্তর টাকা-পয়সা মান-সম্মান গড়েছ, অথচ তোমার ভাই একজন আধবুড়ি বিধবাকে ভিখিরির মতো বিয়ে করে বসেছে। ইজ্জতদার আদমির ইজ্জত কি থাকছে?

তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাবার সাহস হল না শওকতউল্লার। অন্যায় সত্যি সত্যি করেছে শফী। মনে হল এই অপমান, অসম্মান প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ন্যায্যত পাওনা ছিল, তাই পাচ্ছে। তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে তার গর্ববোধের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, শফীর এই ধরনের ভয়ানক অন্যায় কাজের জন্য। শফীর এটা একটা বড় পদস্খলন। যার এত নামডাক প্রশংসা প্রতিষ্ঠা সম্মান মান্যতা, ধর্মে যে এত শিক্ষিত, জ্ঞানবান, সে কিনা এমন একটা অসামাজিক, ছোট কাজ করে ফেলল?

শফীর সম্মানে সম্মানিত হয়েছে, শফীর তারিফ শওকতের কাজে লাগে, কিন্তু শফীর সব কিছু ভাল নয়। সদ্য যে ঘটনা ঘটিয়েছে, সেজন্য শফীকে ল্যাংটো করে চাবকালে তবে গায়ের রাগ ঝরে শওকতের। অথচ মানী ভাইটা, তাকে এ রকম শাসনও করা যায় না। এত কোরান হাদিস জানে, তফসির মশয়ালা জানে যে পবিত্র মনে হত খুব শফীর সর্বশরীরকে, হাত দিয়ে ছুঁতে ভয় হয়, হয়তো তার অপবিত্র হাত দিয়ে পবিত্র কিছু ছুঁয়ে ফেলছে। শফীর সঙ্গে তার সম্পর্কের এই দূরত্বটা এক অর্থে ঘনিষ্ঠতার রূপক মনে হয়েছিল শওকতের।

কাজের মেয়ে ফারজানা চা দিয়ে গেল, আর বলে গেল, তাকে তার ছোটমা ডাকছে। হাতের চায়ের কাপে কাঁপুনি এসে চলকে উঠেছিল চা। খানিকটা চা বাঁ হাঁটুর লুঙির ওপর পড়ে, লুঙি ভেদ করে শরীরের চামড়ায় ছ্যাঁকা দেয়, জ্বালা জ্বালা করে। ছোটমায়ের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কথা বলতে হবে, এই মুহূর্তে জরুরি এত্তেলা। হয়তো ছোটমা নিগার বানুর চোখে চোখ ফেলতে হবে। কথা শুনতে গেলে তা মুখের দিকে তাকাতেই হবে, না হলে অভদ্রতা হবে। এ তার এক অস্বস্তি। মানসিক মার। কিছুতেই নিগার বানুর সামনে দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পায় না। স্বাভাবিক স্বস্তি খুঁজে পায় না। বহু বছর আগে সেই যৌবনে নিগার বানুর রূপ দেখে তারই অজান্তে এক ধরনের আকর্ষণের মুগ্ধতা তাকে দুর্বল করেছিল, মাকে দেখার মধ্যে, মায়ের দিকে তাকানোর মধ্যে কোনো স্খলন না হয়, শুধু এই ভয়ে তার বাড়ি থেকে দূরে সরে থাকে সে, এই স্বেচ্ছা নির্বাসন মেনে নিয়েছে। কেউ জানে না, তার মনের খবর একমাত্র সে নিজেই জানে। কাউকে জানাবার মতো গৌরবজনক খবরও নয় এটা। সাত সকালে এমন একটা আত্মবিপর্যয়ের সামনে ফেলে দিল শফী, তারই এক দুষ্কর্মের জন্য?

খবরটা পেয়ে তারই সমতুল ব্যবসায়ীদের কেউ না কেউ ফোন করতে পারে, তাই তার ঘরের ফোনটা তুলে রাখে। ছোট ব্যবসায়ীদের এ দুঃসাহস হবে না, তার সমকক্ষ ব্যবসায়ীরা আন্তরিক ফোনের ছলে, খবরটা জানার ভেতর দিয়ে অপমান করবে। এখানকার ব্যবসাটাই এ-রকম, সামনাসামনি দোস্তি হাসি বিনিময়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দুশমনি। প্রতিযোগিতার খেলা। কে কতজনকে টেক্কা দিতে পারছে, তার ওপর নির্ভর করছে তার উন্নতি। ব্যবসায়ী বড়লোক, বড়লোক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ছেলে অথবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা আনবে, বিস্তর খাওয়াবে, গলাগলি করবে, কিন্তু ব্যবসার শত্রুতা ভেতরে ভেতরে ঠিক চালিয়ে যাবে। একে অপরকে কীভাবে ডাউন করবে, তারই রণকৌশল সব সময় নিচ্ছে, সব সময় শত্রুতা করে চলেছে। তারই দুই ব্যবসায়ী বেয়াই কি এই সাত সাকলে ফোন করতে চাইবে না? মোট তিনজন বেয়াই। এক মেয়েরে শ্বশুর দুই ছেলের শ্বশুর। শুধু মেজবউ পরভিনের বাবা ব্যবসায়ী নয়। তাকে ভয় নয়। ভয় মেজ ছেলের শ্বশুর আর মেয়ে নাজিয়ার শ্বশুরকে। মেয়ের শ্বশুরকে বেশি ভয়। আর ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তার সঙ্গে প্রচুর। এই সুযোগে শোধ নিতে পারে। আর আপাতদৃষ্টিতে যারা তার বন্ধু ব্যবসায়ী, তারা? ফোন নামিয়ে রেখে শওকতউল্লা একটা অস্বস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

ছোটমায়ের ব্যাপারে তার এই মনের মারের সত্যি কথাটা গত বছর কিসমত তার স্ত্রী একবার ধরে ফেলেছিল। মায়ের জন্যেই কি তুমি এ বাড়িতে থাকতে চাও না? মা কত সুন্দরী ছিল, এখনও আছে, এ বাড়িতে থেকে ওঠাবসা করতে করতে, হয়তো তার দিকে চোখ পড়ে যাবে, মুগ্ধ হবে, সেটা রোধ করার জন্য কি? এই সত্য কথাটা কিসমত আরা বলে ফেলায়, অদ্ভুত ক্ষিপ্ত হয়ে অস্বীকার করেছিল। আর বিছানায় পাশ ফিরে এমনি ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে কিসমতের ওপর ঝাঁপিয়ে

ড়ে দু হাত দিয়ে গলা টিপে ধরেছিল যে জিভ বের হয়ে এসেছিল, আর একটু লে মারাই যেত।

ক্ষিপ্ত হয়ে কিসমতের ওপর জন্তুর মতো এমন একটা অত্যাচার নামিয়ে নেছিল শওকতউল্লা, পরমুহূর্তে নিজের অন্যায় স্বীকার করে, কিসমতের কান্না ামিয়ে, আদর করে ভালবেসে, ভাল ভাল অনেক কথা বলে তবে শান্ত করাতে ারে সে। তবে আর কখনও তার মনের এই সত্যি কথাটার ব্যাপারে তার সন্দেহ ানায়নি কিসমত, এমনকী ইঙ্গিতেও না, ভাবে ব্যবহার দিয়েও না।

বাড়ির ভেতর ঢুকে ভেবেছিল চোখ তুলে খাবার ঘরের দরজার পাশে য়ারটাতে বসে থাকতে দেখতে পাবে ছোটমাকে। দালানে ওঠার সিঁড়ির কাছে সমতের মুখোমুখি হয় শওকত। 'কোথায় ছোটমা?'

কিসমত স্বামীর দিকে ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিপাত করে। 'শুনেছ তো সব? ছোটমায়ের ন ভাল নেই। ঘরে'—

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, শওকত, 'ছোটমা মন খারাপ করে থাকবে কেন?'

'তোমার সঙ্গে কী কথা বলতে চায়, যাও তুমি তার ঘরে।'

খানিকটা দ্বিধা আর খানিকটা চকিত মানসিক মারের ভয় তার মনের ভেতরেই াখে, কিসমতকে বুঝতে দেবে না বলে স্বাভাবিকতার ভঙ্গিতে গটগট করে ালানের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ছোটমার ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে যায়। 'কোথায় ছাটমা?'

'এই যে আমি এখেনে, এস বাবা।' নিগার বানু বিছানায় শুয়ে ছিল, উঠে সে বিছানায়। পরনে সরু খয়েরি পাড় শাদা শাড়ি। খাটের বিছানার ওপর থেকে ার ছোট ছোট ধবধবে শাদা পা দুটি নামিয়ে দিয়েছে। 'দেখ না বেটা, তুমি কত াজের মানুষ, এই সাত সকালে তোমাকে আসতে হল আমার কাছে। ব্যস্ত মানুষ রসৎ কোথায়!'

'হ্যাঁ, আমার পক্ষে আসা অসুবিধে ঠিকই। কিন্তু তুমি ডেকেছ ছোটমা, যত াজ থাকুক, আসতে হবে। শফী এমন একটা আহাম্মুকি করেছে।'

'শফীর আহাম্মুকির জন্য রিস্তেদারদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না আমি। ময়েকে জামাই খোঁটা দেবে তোমার দাদা এই রকম, মেয়ের শ্বশুর ভাশুর তাদের াছে কম হেনস্থা হতে হবে?'

'সব রিস্তেদারদের কাছে মাথা হেঁট হয়ে যাবে ছোটমা।' ছোটমার বিছানার াশে চেয়ারটা লাগিয়ে কথা বলছিল।

হঠাৎ ছোটমা তার ডান হাতটা টেনে নেয় নিজের দিকে।

মুহূর্তে তড়িদাহত হয় শওকত। এক অবৈধ শিহরন পায়।

ছোটমা তার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের মাথায় বসায়। 'আমার মাথায় হাত দিয়ে বল বেটা, তুমি শফীর এই কাজের জন্য শফীকে মন থেকে তফাৎ করে দবে না? তোমাকে আমার মাথায় হাত দিয়ে এই কসম খেতে হবে। সে তোমার াই—তুমি তার বড়। তোমাকে সহ্য করতে হবে। সে একটা কাজ করে ফেলেছে ছাট হয়ে, তাকে মাফ করে দিতে হবে।'

এই হাতটা ধরার অনুভূতির মানসিক মার অনেক বেশি কষ্টদায়ক শওকতে কাছে। ঘেমে নেয়ে যায় সহসা, গলা শুকিয়ে যায়। হয়তো বা অচৈতন্য হয়ে পড়ে পারে শওকতউল্লা। তারই সমবয়সী এই ছোটমা, যৌবনে হঠাৎ চোখে পড়ে যাওয়া ভেতর দিয়ে যে অবৈধ এক আসক্তিতে তড়িদাহত হয়েছিল, এই প্রৌঢ়ত্বের শে সীমায় পৌঁছেও সেই অপরাধের মার তাকে রেহাই দিচ্ছে না। 'মাফ করে দিলা শফীকে।'

শওকতের হাতটা ছোটমায়ের হাত থেকে স্খলিত হয়। দ্রুত উঠে পড়ে শওকত তাকে শফীকে মাফ করতে বাধ্য করাবার জন্য হয়তো শওকতের রাগ হয়েছে তেমনটা ভেবে নিয়ে, শওকত দরজা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিগার বা বলে, 'আমার ওপর রাগ করলে বেটা?'

শওকত কোনো উত্তর দেয় না, বেরিয়ে যায় দালানে। উত্তর দিতে পারে না গলা থেকে স্বর ফুটছে না। এক মনের মার তাকে ঝড়ের মতো দাপট নিয়ে মে চলেছে। সে এখন এ কথাটা ধ্যানজ্ঞান করে চলেছে, শফীর কোনো অন্যায়ে ক্ষুব্ধ হতে পারবে না। শফী যতই অন্যায় করে যাক না কেন, নীরবে সব স যেতে হবে তাকে। ছোটমা হয়তো ভাবছে, এ জন্য রাগ করে চলে যাচ্ছে, বেরি যাচ্ছে শওকত। আসলে তার আত্মরক্ষার জন্য এই আত্মসমর্পণ। আসলে সে এভাবে চলে যাচ্ছে, আত্মরক্ষা করছে। পেছু পেছু ছুটে আসছে স্ত্রী কিসমত, এখা বসে নাস্তা খেয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সে এমনভাবে চলে যাচ্ছে, দেখাচ্ছে রাগ করেছে, আসলে সে আত্মরক্ষার জন্য চলে যাচ্ছে। শফীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তার এক ধরনের আত্মরক্ষা। এখন সে রাগ করে চলে যাচ্ছে, এই মিথ অভিনয়ের মধ্যে স্বতই সে আশ্রয় পেয়ে যায়—শফীর ওপর রাগ না করলে হল!

৯

পুরুষের সহসা হাত ধরার ভেতর দিয়ে যে তাকে এত ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হ হয়, সেই উপলব্ধিতে পড়ল, গোরস্থান থেকে সদ্য বিয়ে হয়ে ফিরতে ফিরতে একেবারে বাড়ির কাছে এসে। শফীউল্লা তার হাত ধরে ফেলল সহসা। আর পেছ ফিরে তার দিকে মুখোমুখি হয়েছিল, নিজের মুখ দেখতে দিয়েছিল, এই প্রথম ইচ্ছে করে মুখ দেখতে দেয়নি, ঘটনার অভিঘাতে, আক্রান্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া নাটকে তাকে মুখ ফেরাতে হয়েছিল। কি ভয়ঙ্কর আক্রমণ, সে যদি প্রস্তুত থাক তাহলে তার একটা অন্য মানে ছিল।

স্বামীর মৃত্যুর আগে আড়াই বছর বিছানাশয্যা ছিল তার স্বামী। তারপর এই এক বছর কেটে গেছে। তারপরেও সেই কিশোরী বয়েস থেকে অনেক বছ স্বামীর সঙ্গে থাকা পেরিয়ে এসেছে সে। স্বামীর মৃত্যুর পর এক রকম সে থা তৈরি করেছিল। খালার সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে ঢুকিবালির কাজ করে খায়। একভা তো জীবন কেটেই চলেছিল। মেয়েকে পাত্রস্থ করার বিষয়েই তার চিন্তা ছিল

ন্তু হঠাৎ করে তার জীবনে এমন একজন পুরুষমানুষ ঢুকে পড়বে, বিয়ে, ম্পত্যজীবন, দাম্পত্যজীবন শেষ করে এসে আবার দাম্পত্যজীবন শুরু করার না কিছুর ভাবনা-কল্পনা তাকে এমনভাবে আক্রান্ত করবে আগে কখনও কল্পনাই রেনি শাহনাজ বেগম।

আবার তাকে যুবতী হতে হবে নাকি? আবার পুরুষ, প্রেম ভালবাসা, আদর াহাগ, এসবের মধ্যে থাকতে হবে নাকি? হাত ধরার অনুভূতির ভেতর দিয়ে ই মুহূর্তে পুরুষে আক্রান্ত হয়েছিল, এখন সেই সব ভাবনায় আক্রান্ত হয়।

রাতেরবেলা বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছিল না তার। কি অদ্ভুতভাবে জের বুড়িয়ে যাওয়া মেনে নিয়েছিল সে! মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না র। বছর চল্লিশ বয়েস, তার ওপর বিধবা, তারও ওপর মেয়ে তার সোমত্থ য়ে উঠছে, তাকে বিয়ে দিয়ে জামাইয়ের শাশুড়ি সাজতে হবে তাকে। এসব মেনে তে কোনো আপত্তি করেনি সে। আর এভাবে জীবনযাত্রা পছন্দও করে ফেলেছিল। সব মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। জামাইয়ের শাশুড়ি হাওয়ার আগে কে হতে হল একজনের কনে। এক অস্বস্তিকর দুঃসময়ে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে । সমস্ত কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। আজ দুপুরেও জানতে পারেনি। এখন শফীউল্লার বিবি, সন্ধ্যায় তাকে বিয়ে করেছে, তার সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে ছে। জীবনটা ঝড়ের খেয়া যেন।

নিজেকে খুঁজে দেখে, এখন কি তার আর শফীউল্লার বিবি হিসেবে নিজেকে াজানো যায়? অনেক আগেই দাম্পত্যের সুধা, প্রণয়, কামনা-বাসনার জীবন শেষ রে রেখেছিল। নিজের মধ্যে সে-সব খুঁজতে গেলে, রোমাঞ্চের চেয়ে কান্না বেশি কে জড়িয়ে ধরে, পাকে পাকে কান্নাই তাকে দখল নিয়ে নেয়। দুঃস্বপ্নের মতো াতঙ্ক নিয়ে আসে শফীউল্লার কামনা-বাসনার নারী হিসেবে নিজেকে কল্পনা করার তের। কল্পনা আসে, কিন্তু নিজেকে খুঁজে পায় না। কি নিদারুণ তার সেই নিখোঁজ স্তিত্ব! শরীরের ভেতর যে ঘুমিয়ে আছে যে শরীর, তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেই র শান্তি স্বস্তি সম্ভ্রম ছিল, তাকে জাগাতেই তার লজ্জা বেদনা কান্না। অথচ ানে, সে যখন শফীউল্লার নববিবাহিতা স্ত্রী হয়ে উঠেছে, হঠাৎ এই দুর্ঘটনার তো, সে যখন শিকার হয়েছে শফীউল্লার বিবিত্বে, তখন তাকে জেগে উঠতেই বে সেই নিখোঁজ অস্তিত্ব দিয়ে। আরেকবার তাকে রমণী হয়ে উঠতে হবে।

মেয়ের দিকে তাকিয়েই এই বছর তিন অন্য রকম এক জীবনযাপন খুঁজে পয়েছিল সে। সেই থাকার মধ্যে এ ধরনের নিজের লজ্জা কান্না বেদনা ছিল । মেয়ের বিয়ে একরকম ঠিক করেই ফেলেছিল। কাল রাতে, সন্ধ্যার পর য়েকজন এসে বিয়ের দিনস্থির করবে, এসব কিছু ঠিকঠাক ছিল। যার সঙ্গে য়ে হবে সে আসবে আরেকবার তার মেয়ে শাবানাকে দেখতে। আগে একবার খে গেছে। তারও আগে কয়েকবার হাজিরতন মোড়ে, বড়তলায় দেখেছে ছেলেটি, খে পছন্দ করেছিল শাবানাকে। তারপর তাদের ম্যাটজিকে সঙ্গে করে এসেছিল থা ফেলে দেখতে। যে ঘরে কাম করে সেখানের একজন ম্যাটজিই কথা লে কলওয়ালা আলমের বিয়ের, শাবানার জন্য। ছেলেটির বাড়ি মেদিনীপুরের

নন্দীগ্রামে। মা বাবা কেউ নেই। ছোটবেলা থেকে মেটিয়াবুরুজে কাজ শিখে খা এখানেই থাকে। এখানে এক দূর সম্পর্কের চাচা আছে, তাকেও সঙ্গে করে কা আসার কথা। আর ম্যাটজি ও দুজন বন্ধু নিয়ে আসবে। ছেলেটি সুন্দর ও শৌখি গোছের। রাস্তায় প্রায়ই দেখে দেখে শাবানাকে চোখে লাগে, তারপর পাত্তা ফে ম্যাটজিকে দিয়ে। নাকি এক বছর ধরে শাবানাকে চোখে লাগা তৈরি হয়ে আলমের। কিন্তু প্রেম ভালবাসা নয়, সম্বন্ধ করেই বিয়ের কথা এগোচ্ছে তেমনভাবে তাদের দেখাশোনা নেই, কথাবার্তা নেই, চোখাচোখি নেই।

এমন একজন পাত্রেরই প্রয়োজন ছিল শাহনাজের, তার খালারও। মা ব নেই শাবানার জন্য এমন পাত্র তাদের খুব কাজে লাগবে। সে আর খালা নূরজাহ বানু একা থাকে, তাদের কোনো পুরুষমানুষ নেই, তাদের ঘরেও কোনো পুরু মানুষ নেই, মেয়ের বিয়ে দিয়ে বাড়িতে একজন পুরুষমানুষ জোটানো যাবে। তে পাত্রেরও প্রয়োজন হয় এমন একটা ঘর। মন সেই জামাইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছি মেয়ে শাবানাও মনে মনে তৈরি হয়ে পড়েছে। খুবই কম বয়েসের মেয়ে। বিয়ে কথা এগোতে এগোতে বড় হয়ে যাবে। মেয়েছেলেরা এমনভাবেই দ্রুত বাে শাবানার বুক তেমন ভরা হয়ে ওঠেনি, কাঁচা বয়েস। মনও কাঁচা। সরল সাদাসি কম বয়েসের মন তার আলমকে বিয়ে করার জন্য তৈরি হচ্ছে। কালকে বিকে ওদের আসার কথা!

অথচ আজ, আজকের সন্ধ্যায় যে ঘটনাটি ঘটে গেল, সেই ঘটনার সঙ্গে কাল ওদের আসার ঘটনার কোনো সমর্থন নেই, ভারসাম্য নেই। মেয়ের মা বিয়ে ক বসে আছে। কী লজ্জার কথা! জানাজানি হয়ে গেলে হয়তো পাত্র বেঁকে বসে শাবানাকে বিয়ে করতে চাইবে না। তিন চার মাস ধরে এতটা কথা এগিয়ে যাওয় পর হঠাৎ এই দুর্যোগে বিয়েটা ভেঙে গেলে, মন কতটা ভাঙবে তাতে!

আজকের এই সন্ধ্যায় তার নিজের বিয়ে হওয়ার পেছনে তার নিজের কোথ অপরাধ, তার নিজের কোথায় প্রতিরোধের উপায়, তার নিজের কোথায় অন্যা অথচ শফীউল্লার তার মুখ দেখা, হাত ধরা পর্যন্ত সে এগিয়ে গেছে? এম তার পক্ষে কি সম্ভব ছিল? আবার এমনটা না হয়েও উপায় ছিল না। বিয়ে কর পর একটু হাত ধরেছে, ঘটনাটি সামান্যই, ভয় হয়েছিল, তাকে আজই শফীউ বাড়িতে হাত ধরে নিয়ে না যায়, কিংবা খালার বাড়িতে তার সঙ্গে রাত কাটানো কোনো অপরাধ ছিল না শফীউল্লার। শফীউল্লা তার বিয়ে করা বিবির সঙ্গে থাকে যদি তাকে নিয়ে গিয়ে শফীউল্লা তার বাড়িতে তুলতো, তাহলে সমস্যার এক অন্যরকম সমাধানও আসত। আলম ভেবে নিতে পারত, মেয়ের মা বিয়ে ক পালিয়েছে। তাহলে খালাও শাহনাজকে দূরে সরিয়ে রেখে বোনঝির মেয়ে নিরপরাধ সাজাতে পারত। বলতে পারত, বোনঝি মুখ কালো করে চলে গে তার মেয়ের কী দোষ! পাত্র তো তার মেয়েকে বিয়ে করছে, তার মাকে নয়! বরং সমবেদনা পেত শাবানা।

সেই কলঙ্কেরও কোনো কিছু নেই শফীউল্লার সঙ্গে তার এই বিয়ে হওয়া ঘটন মধ্যে। কলঙ্ক থাকলে সেটা বাস্তব হত, সমস্যার সমাধানও করত। শফীউল্লা

বিয়ে করে তার অপরাধ প্রমাণ করতে না পেরে এক বাস্তব সমস্যা তৈরি করেছে শাহনাজ।

এক বিছানায় মা মেয়ে শুয়ে আছে তারা। রাত বেড়েই চলেছে, অথচ তারা কেউই ঘুমোতে পারছে না। একই বিছানায় দুজনে দুদিকে মুখ করে নিঃসাড়ে পড়ে আছে। আর নিঃশব্দে তারা কেঁদে চলেছে। নূরজাহান বানু দরজার বাইরে চালার নীচে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

শাহনাজ তার কান্নার ভেতর দিয়ে ভাবছিল, সে যদি আজ শফীউল্লার সঙ্গে উঠে যেতে পারত, শফীউল্লার বিশাল হাবেলিতে, তাহলে সমস্যার এক ভাবে সমাধান হত নিশ্চয়ই কিন্তু সে ব্যবস্থায় সে কতখানি বিপদের মুখে পড়ত? আচমকা শফীউল্লার শয্যাসঙ্গিনী হতে হত তাকে। তার এই জীবনযাপনের মধ্যে এহেন শয্যাসঙ্গ ভীতিকর মনে হয় শাহনাজের। কিন্তু তাকে তো যেতেই হবে শফীউল্লার শয্যাসঙ্গিনী হতে! কি লজ্জাজনক এক আতঙ্কের মধ্যে পড়েছে সে। এই মেয়ে যদি না থাকত তার, সেকি এমন লজ্জাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হত? হয়তো শফীউল্লার সঙ্গে সংসার করতে মন করত তার। বিপদ এই মেয়েকে নিয়েই। আজ সন্ধ্যায় তার শফীউল্লার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সেটা একরকম দুর্ঘটনার মতো, এই বিয়েতে কার কী অপরাধ খুঁজে পেলেও না পেলেও তাকে তো শফীউল্লার আইনি স্ত্রী হতেই হবে, আর তার কাছে চলে যেতে হবে, তার সঙ্গে জীবন কাটাতে হবে, শয্যাসঙ্গিনী হতে হবে, অনতিভবিষ্যৎ তাকে যে ঘটনায় নিয়ে যেতে বাধ্য করাবে, সেটাই এখন তার কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনতিঅতীতে আজকের সন্ধ্যারও আগে যে ঘটনার ভেতর ছিল, সেটা আর তার প্রয়োজনে লাগছে না। মেয়ের বিয়ের জন্য আকুল চেষ্টা করেছিল। জামাই দেখে পছন্দ করেছিল। আর মেয়ের ভবিষ্যতের সুখ দেখতে চাওয়ার ভেতর ছিল সে।

সেসব কোনো কাজে লাগছে না এখন আর। মেয়ের কীভাবে বিয়ে দেবে এই চিন্তার কেউ যেন নয় সে আর। সে কীভাবে শফীউল্লার বিবি হবে, সেই দুশ্চিন্তায় যেন ঘুমতে পারছে না। কিছুটা যেন স্বার্থপরতা এসে যায় তার এই চিন্তার মধ্যে, চিন্তার বিষয়ের এহেন প্রাধান্যের জন্যে। আজ সন্ধ্যায় যে ঘটনা ঘটে গেছে, তাতে মেয়ের কীভাবে বিয়ে দেবে, সেটা তো একটা সমস্যাই। কিন্তু তার কাছে কি শফীউল্লার বিবি হওয়ার সমস্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়? স্বার্থপরতার মতো সেই সমস্যার চিন্তার নিমজ্জিত হয়, খুঁজতে থাকে সেই সমস্যার কীভাবে সে সমাধান করবে। তার পক্ষে তো শফীউল্লার বিবি না হওয়ার কোনো উপায় নেই, শয্যাসঙ্গিনী না হওয়ার উপায় নেই, সে হেতু সে শফীউল্লার বিবি হওয়ার ভেতর কীভাবে তার অস্বস্তি লজ্জাকে খুইয়ে ফেলতে পারবে, সেই বাস্তবতার আবরণ খুঁজতে চায়, সেই বাস্তবতার আশ্রয় খুঁজতে চিন্তা-ভাবনা করে কীভাবে সে শফীউল্লার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে উঠবে। এই কথার চিন্তা-ভাবনায় তার এই বেদনাতুর মুখে এক রক্ত আভা মেখে ওঠে।

মেয়ে শাবানা উশখুশ করে। তার দিকে পেছন ফিরে শুয়েছে শাহনাজ। শাহনাজ তার মা। মেয়েও তেমনভাবে শুয়েছে। শাবানা তো তেমন ছোটটি নেই, জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে।

'মা, আমার একটা কথা শুনবে? শুনতে পাচ্ছ?'

কোনো উত্তর দেয় না শাহনাজ।

'তুমি জেগে আছ, তবু আমার কথার জবাব দিচ্ছ না।'

'কী বলবি বল না, শুনছি তো।'

'তোমারও বিয়ে করতে মন চেয়েছিল, এ কথা সত্যি, তাই না মা?'

শাবানা আরও কথা বলে উঠবে বলে এই কথার কোনো জবাব দেয় না শাহনাজ। চুপ করে অপেক্ষা করে থাকে। 'না, মিথ্যে কথা।'

'আমার বিশ্বাস হয় না মা!'

'আমি কিছু জানি না।'

'তুমি জান, এখন চুপ করে যাচ্ছ। ভালই তো বিয়ে করতে, কিন্তু আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারলে না? জানি, বড়লোক বর পাচ্ছ, অপেক্ষা করতে বললে যদি ফসকে যায়!'

'চুপ কর শাবানা।'

'সত্যি কথা অমন গায়ে বাজে মা! আজ কাল দুটো দিনও সবুর করতে পারলে না? আমার বিয়ের চিন্তায় তুমি ঘুমতে পারতে না বলতে, সব মিথ্যে। আমার মরা বাপের শোকে তুমি কাঁদতে, এসব মিথ্যে, আসলে তুমি নিজের জন্যে কাঁদতে, নিজের সুখের জন্যে, সেটাই দেখিয়ে দিলে।'

'তুই আমাকে ভুল বুঝিস না শাবানা, তুই আমার পেটের মেয়ে, তুই যদি না বুঝিস তো কে আর বুঝবে?'

'অমি বুঝেছি তোমাকে মা!'

'দ্যাখ, আমার কোনো দোষ নেই! বিশ্বাস কর!'

'কিন্তু তোমাকে তো ওই লোকটার ঘর করতে যেতে হবে, সেটা আটকাতে পারবে?'

'কী করে আটকাতে পারি, উপায় বের করে দে না। কোথায় গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলি, বুদ্ধি দে না!'

'তুমি তো বিয়েতে বসেছিলে!'

'বড় বাড়ির মানুষটা অমন করে—'

'বল, বল, থামলে কেন?'

'আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম গোরস্থানে। বড় বাড়ির মানুষটা আমার ভাল চাইছিল, আমি কাঁদছিলাম, আর কিছু জানি না আমি।'

'তুমি কাঁদছিলে?'

'এখনও তো আমি কাঁদছি, দ্যাখ!'

'বড় বাড়ির মানুষটাকেই দোষ দিলে তুমি? তার চোখে তুমি না পড়লে তার কী করে পছন্দ হয় তোমাকে? তুমি তার চোখে পড়েছ!'

'না চোখে পড়িনি কোনোদিন।'

'মিথ্যে কথা বলছ। তুমি কত দেখতে ভাল বল তো, মা। তোমাকে সামলে চলতে হবে। তোমার সঙ্গে আগে লোকটার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়েছিল, তোমার

মন ছিল বিয়েতে, না হলে দেখাশোনা কথাবার্তায় যেতে না। এখন তার দোষ দিও না। গরিবের মেয়েকে বিয়ে করে উপকার তো করে এখানকার বড়লোকরা! বাপ মরে গেছে, তুমি সুন্দরী, গরিব বাপটাকে বিয়ে করে কত কষ্ট পেয়েছ, আবার বিয়ে করবার মন ছিল তোমার, বড়লোকের ঘরের সুখ পেতে চেয়েছিলে তুমি, এখন আমার কাছে নিজের সাধ লুকিয়ে ফেলে অন্যকে দোষ দিচ্ছ? লজ্জা পাচ্ছ, আমাকে মা তুমি? তোমার বয়েসে অনেক মেয়ে বিয়ে করে। তোমাকে দেখে তোমার বয়েসও চেনা যায় না।'

'তোকে পেটে ধরেছি শাবানা, পেটের মেয়ে হয়ে আমাকে চিনলি না তুই? আমি যদি বিয়ে করতে মন করে থাকি তাহলে তুই আমার মরা মুখ দেখবি।' ভয়ঙ্কর স্বরে ভরা রাতের ওপর শাহনাজের কথাগুলো আছড়ে পড়ে।

শাবানা চমকে ওঠে। মায়ের ওপর এ ধরনের আক্রমণ করা ঠিক হয়নি, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, ভুল করে ফেলেছে, বুঝতে পারে। যে চোর নয়, তাকে চোর বলে দুষলে যে আত্মগ্লানি আসে, তেমন অবস্থার মধ্যে পড়ে শাবানা। বুঝতে পারে, তার মা নির্দোষ। শফীউল্লা যে লোকটা তাকে বিয়ে করেছে, এক্ষেত্রে তারই উদ্যোগ কাজ করেছে। মায়ের সঙ্গে জড়িয়েই তো বেড়ে উঠছে সে। একই বিছানায় শুয়ে মায়ের নিশ্বাস প্রশ্বাসের অনুভব নিয়েই তো বাঁচে। মায়ের এই ক্রোধ দিয়েই বোঝে, এসব বলে মায়ের প্রতি অন্যায় করেছে। সেই অপরাধে বুকের ভেতরটা ধুকপুকিয়ে ওঠে শাবানার। কেঁদে ওঠে। 'মা গো অন্যায় হয়ে গেছে!'

'বেশ করেছিস, বলেছিস।'

'না গো মা, তুমি আমার সে মা নও।'

'আমার দোষ দিস তুই মা, সন্ধেবেলা লোকটা মৌলবিকে সঙ্গে করে নে এল। তুই তখন মল্লিকের বউয়ের ঘরে টিভি দেখছিলি। আমি কাঁদতে কাঁদতে ছুটনু তোর মরা বাপের কবরের থানে। ওরাও গেল, খালাও গেল। আমি জানতুম, বিয়ে করতে চেয়েচে, না বিয়ে করে ছাড়বেনি। তবুও কবরস্থানে ছুটনু তোর বাপের কবরের গায়ের কাছে। আমার কী দোষ? আমি কুনুদিন তারে আমার মুখ দেখাইনি, কথা বলিনি। অথচ লোকটা আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। তোর খালাও তাদের সনে সায় দিল। খুব পয়সাঅলা লোক বুঝলি তো? এখনও বিয়ে করেছিলনি। শিক্ষিত। আমার মতো একজন গরিব বিধবাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, আমারই কপালে হাত বুলনো উচিত। অথচ বেঁকে বসেছি! আমার বয়স বোঝা যায়নি, আমি সুন্দরী, এসবই আমারই শত্রু হয়ে উঠেছিল। তা হলেও এমন বড়লোককে কে পায়ে ঠেলে দেবে?'

'তোমার কুনু দোষ নেই বলচি তো! আমার দুর্ভাগ্য!'

'তোর কথা ভেবেই তো বেশি করে কাঁদছি আমি, ওরা আসবে কাল পাকা কথা বলতে, তোর বিয়ের ব্যাপারে।'

শাবানা চুপ করে থাকে।

'তুই বল, আমার কি বিয়ে করা উচিত ছিল?'

'আমি জানি না, জানি না কিছু, আমাকে শুধিও না। লোকটা কে?'

শাহনাজ কিছু বলতে পারে না।

'নাম কি?'

'কারবালাতে বাড়ি। শওকতউল্লা দাদার নাম।'

'পাঁচপাড়াতে বাড়ি ছিল মনে হচ্ছে, শফীউল্লা নাম?'

'হ্যাঁ।' অস্ফুট স্বরে কথাটা বলে শাহনাজ। এই মুহূর্তে তার এই উত্তরের মধ্যে খানিকটা লজ্জার রাঙা আভা বালিশের গায়ে মিশিয়ে দেয় সে।

'তাহলে তো তারা পেল্লাই বড়লোক মা।' উৎফুল্ল হয়ে ওঠে শাবানা।

'তুই জানিস?'

'চিনি বাড়িটা। বড় কারবারি। অনেকগুলো গাড়ি আছে। তোমাকে এত বড়লোক বিয়ে করল? মা, তোমার কত ভাগ্য ভাল, হিংসে হচ্ছে তোমাকে। তুমি তো আর বুড়ি হয়ে যাওনি, মা!' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে শাবানা।

'কাঁদছিস যে?' নিজের কান্নার স্বরেই শুধোয় শাহনাজ।

'আনন্দে কাঁদছি, তোমাকে সুখী দেখব বলে। বাপের হাতে পড়ে তুমি কত কষ্ট পেয়েছ।'

শাবানার কথার পিঠে কথা না দিয়ে কান্না দেয় শাহনাজ। তাকে তো আর একজনের বিবি হতে হবে, শয্যাসঙ্গিনী হতে হবে। সেসব কথার কি আন্দোলন তার মনের মধ্যে ছিল? এমনকী তার স্বামীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেও? তার এই বয়সে কামনা-বাসনা পুরুষ-সাধ শেষ হয়ে যায় না যদিও, কিন্তু তার এই বয়সে কেউ বিধবা হলে পুনর্বার বিয়ের কথা তার হয়ে কেউ বলে না, সচরাচর বিয়েও হয় না। সেই অবাস্তব এক ঘটনার মুখোমুখি সে। সেই অবাস্তবতার অসামাজিক মানসিক মারই তাকে বেশি করে মারছে। না হলে নিজের মনের মধ্যে শরীরের মধ্যে ঠেলে গুঁজে রাখা কামনা-বাসনার তাপ যে আছে, তা জানে, তা দিয়ে শফীউল্লার বিবি হওয়া যাবে, শয্যাসঙ্গিনী হওয়া যাবে। কিন্তু সেই অবাস্তবতার অসামাজিক লজ্জা তাকে পোড়াবে। কুড়ি বছর একজন পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত জীবন কাটাবার পর, আর একজন পুরুষের জন্য যুবতী হয়ে ওঠার লজ্জা তার। মেয়েও তার সেই লজ্জার কথা জানছে। তার শরীরে মনে যে কামনা-বাসনা এখনও অবশিষ্ট আছে তার সত্যির কাছে নিজেই বন্দি হয়ে পড়ছে। তাকে

শফীউল্লা বিয়ে করে যে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে, তার শরীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কামনা-বাসনাই সেই সমস্যার সমাধান। শেষ পর্যন্ত নিজের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা কামনা-বাসনা ভাবনায় জাগিয়ে তুলেই পরিত্রাণের পথ খুঁজতে থাকে। ভাবে, সেই ভাবনায় যায়। শফীউল্লার বুকের মধ্যে ধরা দেবে, দুই হাতের মধ্যে নিজেকে ভরে রাখবে। রমণীর সমস্ত নাগাল তার শরীরের মধ্যে এনে তুলবে।

হয়তো শাহ্‌নাজ এই দুর্দিনের সঙ্কটে পড়ে, এই ভাবনার রাঙা অনুভব তাকে খানিকটা স্বস্তি দিয়ে যায়, হয়তো সে খানিকটা সঙ্কটের তাড়স থেকে মুক্তি খুঁজে পায়। সেই অবাস্তবতার এক নারী হয়ে উঠছে। সাবেক ও অনতি অতিক্রান্ত বাস্তবতা থেকে তার মুক্তি ঘটছে। সেই অবাস্তবতার মধ্যে পড়ে ছটফট করছে। রমণী ও কামনা-বাসনার নারী হয়ে উঠছে। শাবনার মা, শাবানার বিয়ে, হবু জামাই আলম, বিয়ের সমস্যা, এসবের সে কেউ নয়, এই সবের কিছু থাকার কথা নেই তার এই অবাস্তবতার জীবনের মধ্যে।

মেয়ে শাবনার পাশে, একই বিছানায় শুয়ে, খানিকটা সেই ভাবনায় ছিটকে পড়ে শাহ্‌নাজ, উড়ে গিয়ে পড়ে সেই অবাস্তবতার মধ্যে। অদ্ভুত ভারহীন, আত্মসঙ্কটের বিপরীতে পৌঁছনো যায়। মেঘের ভেতর দিয়ে, তারাদের গায়ের পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে সে পৌঁছে যাচ্ছে তেমন কোনো তুলতুলে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বিছানার মধ্যে, সেখানে শফীউল্লা তাকে দেখে, দেখতে থাকে। সে সুন্দরী, পুরুষের দেখার চোখে তার রূপ আছে, মান্যতা আছে, আত্মতৃপ্তিও খুঁজে পাবে। পরক্ষণেই ভাবনা আসে, এ চিন্তা অবাস্তব নয়, বাস্তব। আরেক দাম্পত্যে সে যাবে, আর সেই বাস্তবতার ভেতরেই তাকে জেগে উঠতে হবে সমস্ত কামনা-বাসনা নিয়ে, কামনা-বাসনা পুনরুদ্ধার করে শফীউল্লার নব বিবাহিত বিবি হয়ে থাকবে। নিজের সুখের জন্য এই বাস্তবতা স্বার্থান্ধ হয়ে উঠেও অভিযোগ দেবে না তাকে। তার কোনো অপরাধ হবে না শফীউল্লার বুকের মধ্যে মিশে যেতে, শফীউল্লাকে কামনা করলেও না। একা নিভৃতে থেকে শফীউল্লার জন্য ভাবলেও তার দোষ হবে না।

এক রাঙা ভাবনায় ডুবে যেতে থাকে শাহ্‌নাজ। ডুবে যায়, ডুবে ডুবে যায়, গভীর মনের সঙ্গে কথোপকথন করে চলে। মেয়ে শাবানা তার গায়ের পাশে শুয়ে কাঁদছে। সেও মেয়ের কান্নার পাশে কাঁদছে, কিন্তু তার সেই কান্নার ভেতর রাঙা ভাবনা এসে জুটছে।

শাবানা বলল, 'আমাকে তুমি ছেড়ে যাও, তোমার ভাল হবে।'

রাঙা ভাবনা থেকে স্খলিত হয় শাহ্‌নাজ, সে জানে স্খলিত হলেও তার সে ভাবনা থাকে, চুরি যায় না, কাঁদলেও হারিয়ে যায় না, মেয়ের সমস্যার মধ্যে ভারাক্রান্ত হয়ে নুয়ে পড়লেও, বেদনাতুর হলেও থাকে, শেষ পর্যন্ত তাকে

শফীউল্লার বিবি হতেই হবে, সেই রাঙা জীবনের মধ্যে ঢুকে যেতেই হবে। এখন সে মেয়ের এই কথার মধ্যে বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ছে, এই ঘটনার মধ্যে চলে যাচ্ছে, শফীউল্লা তাকে বিয়ে করে কি সমস্যায় ফেলেছে, মেয়েকে সমস্যায় ফেলেছে, সেই অসহায়তার কান্নার মধ্যে ঢুকে গিয়ে শাহনাজ মেয়ের এই কথায় কাঁদে। 'আমি তোকে ছেড়ে যাব কী করে? আমি কি যেতে চেয়েছি? আমি কি আমার ভাল কোনোদিন চেয়েছি?' এই খেদও অসত্য নয় শাহনাজের কাছে। কেন না সে তো কয়েক ঘণ্টা আগে যেমনটা ছিল, তেমনটাতেই থাকতে চেয়েছিল, সেই থাকার মধ্যে কোনো বিক্ষোভ সে প্রকাশ করেনি। এখন সে তাই সত্যি সত্যি কাঁদছে, বেদনা জানাচ্ছে। 'তোর কি হবে, শুনলে আলম কি তোকে আর বিয়ে করতে চাইবে? না যদি আসে কাল?' ডুকরে ওঠে শাহনাজ।

'কেঁদ না মা।'

শাহনাজও কাঁদে।

কিন্তু কেউ কাউকে ছোঁয় না, জড়িয়ে ধরে না, এমনকী মুখোমুখি তারা কথা বলে না, এক বিরোধ শয্যার ভঙ্গিতে শুয়ে আছে তারা। অথচ তারা একে অপরের সুখের কথা নিয়ে, সুখহীনতার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছে।

'আলমের কাছে আমি কী করে মুখ দেখাব?'

'অথচ তোমার কোনো দোষ নেই মা!'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে দেখে বিয়ে করতে ওর মন হয়েছিল, না এলে বিয়ে করবে না, ব্যস, মিটে গেল।' ফুঁপিয়ে ওঠে শাবানা।

'তোকে কয়েকবার দেখেছিল, আলম তোকে ভালবেসেছিল, জানিস?'

'জানি না। দেখে বিয়ে করতে চেয়েছে, ভালবাসে কিনা জানি না। বিয়ে করার পর যদি ভালবাসে, তবেই তো জানব ভালবাসে। কিন্তু দেখ, আসবে না কালকে আর, বিয়ে তো পরের কথা। তুমি বিয়ে করেছ, এ কথা জানলে আর কি আসবে?'

শাহনাজ কাঁদে।

'কেঁদো না মা, তুমি কত ভাল থাকবে!'

না কাঁদাও তো শাহনাজের পক্ষে সম্ভব নয়। কাঁদে, কেঁদে চলে।

'আমি তাকে কী বলব মা?'

'অ্যাঁ?' চমকে ওঠে শাহনাজ।

'কী বলব? বাপ?'

'আমি কিছু জানি না।' মেয়ের এই কথার আঘাতে শরীরের ভেতর জমে থাকা সমস্ত কান্না বেরিয়ে আসে শাহনাজের। 'তোর বাপ মরে গেছে।'

'আমার মরা বাপের জন্য শোক করা তোমার অন্যায় হবে মা। সে এখন তোমার কেউ নয়।'

'কেউ নয়? বলতে পারলি?'

'না, কেউ নয়। তুমি এখন শফীউল্লার বিবি।'

'তুই আমার মেয়ে নোস?'

'হ্যাঁ, আমি তোমার মেয়ে, কিন্তু শফীউল্লা তোমার স্বামী। আমার বাপ নয়। কেউ নয়।'

'তোর বাপের জন্য আমি কাঁদতে পারব না?'

'সে তোমার ইচ্ছে, কিন্তু কাঁদা তোমার অন্যায় হবে। তুমি আমার মা, কিন্তু ও লোকটা আমার কেউ নয়।'

শাহ্‌নাজ ভাবে, সত্যি শফীউল্লা শাবানার কেউ হবে না? অথচ সে শাবানার মা, আর সে শফীউল্লার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে উঠবে, আর শফীউল্লার সঙ্গে শাবানার এ কেমন অনাত্মীয়তা? অথচ ওই শফীউল্লাকে নিজের মনে করবে শাহ্‌নাজ, মনের মধ্যে ভরে রাখবে, অথচ তার মেয়ে শফীউল্লার কেউ হবে না?

'ওসব কথা এখন তোকে বলতে হবে না। তুই আমার মেয়ে কিনা!'

'হ্যাঁ, তাই তো আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমাকে পেটে ধরেছিলে। মা গো তুমি আমার মা। কিন্তু তোমাকে আমি আর পাব না।'

'তুই আমার মেয়েই থাকবি, তোকে নিয়েই থাকব।'

'পারবে না মা।'

'কোথা থেকে কী হয়ে গেল, কী করি বল না?'

'সত্যি মা কোথা থেকে কী হয়ে গেল! তুমি আর কী করবে?'

'কিছু করতে পারব না?'

'না।'

'তোর কী হবে?'

কাঁদে শাবানা। 'কিছু জানি না, কিছুই জানি না। আমার একটা ব্যবস্থা করে তুমি যদি বিয়ে করতে!'

'আমার বিয়ে আমি করেছি? আমি চেয়েছি বিয়ে করতে?'

'তোমার ভালর জন্য তোমাকে বিয়ে করেছে?'

'আমার এমন ভাল আমি কি চেয়েছিলুম?'

'তুমি না চাইলেও তোমার জন্য এ ব্যবস্থা ভাল হবে মা।'

'কিন্তু তুই ভাসবি। আমার ভাল হবে, তুই ভাসবি। এ কেমন আমার ভাল হওয়া?'

'তোমার ভাল হবে না? অত বড় ঘরে যাবে, অত বড় লোক তোমার স্বামী।

তোমার কীসের অভাব থাকবে বল তো? তোমাকে আজকেই কেন নিয়ে গেল না, বুঝে পাইনি।'

'আমি কী করে যাই?'

'তোমাকে যেতেই হবে মা। তুমি না গিয়ে পারবে না।'

'আমাকে যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।'

'কী করে যাই?'

'তোমাকে গাড়ি করে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে যাবে।'

'কেন? এই ক বছরে কবে আমি সেজেছি-গুজেছি? আমি সাজতে চেয়েছি কী? আমার লজ্জা! আমার মনের কষ্টে আমি বুঝি মরে যাব।'

'কেন সাজনি? তুমি কি বুড়ি হয়ে গেছ?'

'বুড়ি হইনি, কিন্তু ভাতার ধরতে সাধ করেছিলুম কি আমি?'

'তুমি চাওনি, কিন্তু তোমার সাধ বলে কি কিছু থাকতে নেই?'

'সাধ করব? কী লজ্জা কী লজ্জা! কেন বুড়ি হয়ে গেলাম না। আমার বয়েস, আমার দেহ, আমার শত্তুর হয়ে উঠেছে। লোকটা আমাকে বিয়ে করতে এগিয়ে এল। এসব কিছু হত না। আমি মরার দিন গুনতাম। এখন আমাকে সেজেগুজে যেতে হবে লোকটার ঘরে, সে আমার স্বামী। তার সাধ মেটাতে হবে আমাকে এখন? আমার এমন সাধ আমি কাকে জানিয়েছি, কার কাছে ফরিয়াদ করেছি?'

'এখন থেকে তুমি তোমার সাধ খুঁজে পাবে মা।'

'পাব হয়তো, কিন্তু আমার মান খুঁজে পাব? সেটা আমার অপমান নয়? লোকটার সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে?' কাঁদতে থাকে শাহনাজ।

'হ্যাঁ, কাঁদো মা তুমি। অনেক কাঁদার পর সব ঠিক হয়ে যাবে!'

আরও কিছুটা রাত বয়। আরও কিছুক্ষণ দুজন নারী ঘরের ভেতর কান্না জড় করে।

মিথ্যাঘটনা পর্ব

এই ছেচল্লিশ বছর বয়সে অকৃতবিবাহ থাকার পর দু-দিন আগে লিচুতলার মাঝবয়সী সুন্দরী বিধবা শাহনাজকে কেনই যে সে শফীউল্লা বিয়ে করে বসল, শফী নিজেই জানে না। এত বছর সে বিয়ে করতে চায়নি। আর শাহনাজের মুখের একটু রূপ দেখে কেনই যে তার রূপে এমন মুগ্ধতা এল, ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না সে। তারপর তো বিয়ে না করে কোনো উপায় ছিল না। পরদিনই চুপি চুপি বিয়ের আয়োজন করতে হল, আর তার এত বছর পর বিয়েও হয়ে গেল।

বিষয়টার মধ্যে তেমন কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না শফী, তাই তাকে দুপুরে পৌঁছে যেতে হল লাইব্রেরিতে। বড়তলায় স্কুললাগোয়া লাইব্রেরিতে শফীর অবাধ যাতায়াত। লাইব্রেরির উন্নয়নের জন্য শফী ভাল টাকা দেয়। লাইব্রেরির দুই কর্মচারী তাকে কদরও করে।

তার এই নারীর রূপে মুগ্ধতার ব্যাখ্যা কোনো কথা, কোনো ভাবনার ভেতর পাচ্ছে না বলে লাইব্রেরির মধ্যে আসা। বই ঘাটতে ঘাটতে যদি তার ভেতর থেকে কোনো উদ্ধার আসে। ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, বা রূপকথার আলোচনার বইতে কি পাওয়া যাবে না, সে কেন শাহনাজ বেগমের রূপে মুগ্ধ হল?

আর রূপে মুগ্ধ হল বলেই তো তাকে বিয়ে করতে হল। শুধু মুগ্ধতা নিয়ে যদি তার থাকা সম্ভব হত, তাহলে সে বিয়ে করত না। বিয়ে করল, ধর্ম মানে বলে। ধর্মে স্পষ্ট করে লেখা আছে, স্ত্রী নয় এমন সব নারীদের কামনার চোখে দেখা পাপ। সে জন্যেই বিবাহ অবশ্যকর্তব্য করা হয়েছে ধর্মে। এতদিন পর কোনো নারীর প্রতি কামনা বাসনা জন্মাল শফীর, এটা একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা। তার পরেও তার পক্ষে কি সম্ভব হত বিয়ে না করে থাকা? বিয়ে করতেই হল। আর আজই বিকেলে তার ঘরে আসবে শাহনাজ বিবি, যার রূপে মুগ্ধ হয়ে জর জর হয়ে আছে সে।

একেই কি প্রেম বলে? বুকের ভেতরটা কেমন করে। গোরস্থানে গোটা একখানি পা ও মুখের একটু অংশ দেখে পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়েছিল। তারপর পরদিনই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে এক অনাড়ম্বর গোপন পরিবেশে বিয়ে করে ফেলল। বাড়ির লোকজন খেপেছে তার এই ধরনের আচরণে। সে অন্য মানুষ, বাস্তব জগতের মানুষ নয়, কথা বলতে যত ভালবাসে, তেমনই ভাবতে ভালবাসে। সমাজে এক আশ্চর্য মানুষ হয়ে থাকা জোটে যদি তার তাতেই সুখ।

সে সেই আশ্চর্য মানুষ গোরস্থানে আলোছায়ায় শাহনাজের মুখের একটু অংশ আর একখানি পা দেখা দিয়ে শাহনাজের রূপে মুগ্ধতা পেয়েছে, কমনাবাসনা পেয়েছে, হয়তো বা প্রেম পেয়েছে। সে সেই এক আশ্চর্য মানুষ, যাকে সে বিবাহ

প্রস্তাব দিয়েছে পরের দিন সন্ধ্যায়, আর সেই সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বিয়ে করেছে, সেই গোরস্থানেই, ইমাম আর গুটিকয় গোরকোনদের সাক্ষাতে। সে সেই তো এক আশ্চর্য মানুষ রূপে মুগ্ধ হয়ে চুপ করে থাকেনি, পাপ বাড়িয়ে যায়নি, বিয়ে করে নিয়েছে। তা না হলে পাপ হত। একমাত্র স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হওয়াই বৈধ, তাকে কামনাবাসনায় দেখা বৈধ, তার সঙ্গে প্রেম করা সঙ্গত। বিয়ে না করে এমন পরিস্থিতির মধ্যে থাকলে পাপ হত। সে সেই তো আশ্চর্য মানুষ, কারুর তোয়াক্কা না করেই, ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ে করবার জায়গায়, দুম করে বিয়ে করেছে।

এখনও পর্যন্ত শাহনাজ বিবিকে কাছে পাওয়া তার জোটেনি। সেই কাছে পাওয়া তো গোপনভাবে কাছে পাওয়া। সেই অনুভূতির চমক গোপনে মন তাই বহন করে যায়, শফীর শয়নে স্বপনে নিদ্রা ও জাগরণে।

বিয়ে করার পর মাঝে দুটি জ্যোৎস্নাস্নাত রাত বিগত হয়েছে। সারারাত জুড়ে তেতলার ঘরে শফী ছিল একা। সেই সঙ্গে তার বাস্তব দশা অনেকাংশেই ছিল না। কতবার যে শাহনাজের সঙ্গে তার মিলন হয়েছে তার! কতবার শাহনাজের সঙ্গে অলৌকিক কথোপকথনে গেছে। শাহনাজ ছায়ামাখা জ্যোৎস্নালোকে কাজলটানা চাহনি নিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে, জানালা ঘেঁষে যেন আকাশ থেকে নেমে এসে জানালা দিয়ে ঢুকেছে সে। মুখে মৃদু হাসি। পাতলা ফিনফিনে ওড়না উড়ছে হাওয়ায়। শফীর দিকে লজ্জাবনত হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। তারপর শফী বিছানায় উঠে বসে নানা কথোপকথনে যায়। নানা কথার উত্তর দেয় শাহনাজ। কি কোমলমনা স্পর্শসুন্দর, ধীরা, আদরমনস্ক সে নারী। কোনো ওজর আপত্তি নেই, কাছে আসতে বলতেই কাছে এসেছে, ধরা দিয়েছে দুই হাতের মধ্যে, বুকের মধ্যে।

সেই শাহনাজকে না পেয়ে অলৌকিক পাওয়া নিয়ে দুটি রাত কেটে গেছে শফীউল্লার। দাদা শওকতউল্লা এই দুদিনে একবারও এত্তেলা পাঠায়নি। তার এই বিয়েকে কেন্দ্র করে বাড়িতে চাপা অসন্তোষ—খানিকটা অশান্তি তো বটে। যার বিয়ে করার কোনো কথা ছিল না, সে কিনা এমন একজনকে বিয়ে করল, এমন একটা ঘরে এমন আচমকা, এমন অনাড়ম্বরভাবে, অশান্তি হবারই কথা।

শাহনাজকে লিচুতলায় তার খালার ঘরে আগের আশ্রয়ে রেখে শফী আট দশদিন চুপচাপ কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু দুটি জ্যোৎস্নারাত্রি কাটার পর ভেতরে ভেতরে সে খুবই কাহিল হয়ে পড়ল শাহনাজকে বাস্তবে না পাওয়ার কষ্টে। দ্বিতীয়ত দাদা কোনো এত্তেলা পাঠাল না জবাবদিহি চাওয়ার জন্য। কাজ কারবার দিব্যি চলছে আগের মতো, কোনো ছন্দপতন ঘটেনি, বেতালা কোনো কিছুই তো চলছে না। সুযোগ বুঝে তার কারবারের ম্যানেজার জিয়াদকে সমস্ত ব্যবস্থা করতে বলে দিল সে ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে সকাল সকাল। হাজার পঁচিশেক টাকা হাতে তুলে দিল, গহনা আর বিবির শাড়ি জামা যাতে কেনা হয়। ভরি পাঁচ গহনায় এখন কাজ চলে যাবে। একটা হার, হাতে রুলি, কানে কানপাশা, নাকে নথ, গলায় চিক—আর শাড়ি জামা-জুতো ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিয়াদ আর জিয়াদের বিবি যাবে এইসব সঙ্গে করে। মিষ্টি ফলফুলুড়ি এসব সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, লিচুতলায় শাহনাজের খালার ঘরে যাবে, শাহনাজকে আনতে। দাদার কারবারের ম্যানেজার ওসমানকে চুপি চুপি বলে গ্যারেজ থেকে মারুতিটা বের করে নিয়ে যাবে। না, গাড়িতে করেই আসুক শাহনাজ। এইটুকু না হলে মান থাকে না। এই ব্যবস্থাটা গোপনেই করে এসেছে শফী। নিশ্চয় দুই ম্যানেজার কাউকেই জানাবে না। সেটা একটা ব্যাপার হবে। কেউ আগাম জানবে না, শাহনাজ একে এক এ বাড়ির বউবেশে হাজির হবে। আর সেই শাহনাজকে রাতে কাছে পাবে শফী।

এমন একটা ভাললাগা কল্পনার মধ্যে আছে শফী। অনেকটা রাত পর্যন্ত বাইরে বাইরে ঘুরবে সে। এই যেমন এখন আছে লাইব্রেরিতে, তেমনই অনেক রাত পর্যন্ত আরও কোথাও কোথাও থাকবে। কোনো ইতিহাসের পর্বে কি পদচারণা করবে? জানে না। শফী কোনো ধর্মকাহিনীর আচ্ছন্নতায় থাকবে? জানে না, কিছুই জানে না শফী। সে শুধু জানে আজ রাতে শাহনাজকে কাছে পাবে।

আর তার কাছে এই রহস্যের কিছুতেই কোনো সমাধান জুটছে না, কেনই বা একজন নারীর রূপের প্রতি মুগ্ধ হল, কেন তাকে নিয়ে কামনাবাসনা সহসা উন্মূল হয়ে উঠল? তার জন্যে সে লাইব্রেরিতে নানা কেতাব দেখে, ঘাটে, যদি পাওয়া যায় তেমন কোনো সূত্র, যা থেকে তার প্রেমে পড়ার ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে পারে।

ঘোর এক চিন্তাপ্রবাহে সময় কাটায় শফীউল্লা। সহজে সময় গড়ায় না। বইয়ের পাতায় পাতায় বাক্যে বাক্যে অক্ষরে অক্ষরে নিমগ্নতা এলেও সেই শাহনাজের মুখ, সেই আলটপকা প্রেমবোধ, রূপজ মোহ, সেই দেহের ক্ষুধায় অস্থিরতৃষিত হয়ে আনচান করে ওঠে মন।

বাড়ির লোকজন বলছে, শাহনাজের বয়েস হয়েছে, তার বিবাহযোগ্যা সোমত্থ মেয়ে আছে। এমন একজন কনে নির্বাচন বাড়ির লোকের মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু তার চোখে শাহনাজকে ভাল লাগার ব্যাপারটা বোঝাবে কী করে শফী? আর শাহনাজ আধবুড়ি হলেও তার প্রেমে পড়া তো সত্যি। শাহনাজের প্রেমে পড়ল আর বিয়ে করল না, এ ঘটনা যে কতখানি তাকে পাপের পথে নিয়ে যেত তা কি দেখেছে কেউ? শফী কোনোদিন অধর্মের পথে যেতে পারে না। সে তার পাপ বাড়াতে পারে না। সে জন্যেই তো এই বিয়ে। শাহনাজকে ভাল লাগা কি রোধ করতে পেরেছিল? এখানেই তার স্খলন, পাপ, সেই পাপ যাতে না বাড়ে, পাপ বিমোচনের জন্যই বিয়ে। কোনো নারীর প্রতি অহরহ প্রেমবোধ করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করার জন্যই বিয়ে। সেই নারীর রূপের মুগ্ধতা পবিত্র করার জন্য বিয়ে। তাকে নিয়ে বিছানায় ন্যায়সঙ্গত শোওয়ার জন্য বিয়ে।

আলটপকা মনের ওপর এই কথা উঠে আসে, তার প্রতি কি শাহনাজের এই বোধ, এই প্রতিকামনা তৈরি হয়েছিল? এই প্রেমে পড়া কি শাহনাজেরও হয়েছে? জানে না শফী। এসব জেনে কোনো নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষের বিয়ে হয় কিনা

জানে না শফী। বিয়ে তো পুরুষের অধিকারে চলে আসার কাহিনী, পুরুষের ভোগের কিস্‌সা, পুরুষের শারীরিকতার আয়াস-আরাম। এর চেয়ে বেশি ভাবতে হয় না। শফীর মনে ধরেছে, মুগ্ধ হয়েছে শাহনাজে, আর তাকে বিয়ে করেছে, ব্যস এইটুকুই। আর কিছু ভাববার দায় থাকে না। শুধু বিয়ের মজলিসে কনের সম্মতিটুকু পাওয়া নিয়ে কথা। শাহনাজ তো সম্মতি দিয়েছে। সেই গোরস্থানের ভিতর, থামের আড়ালে বসে। এই মুহূর্তেই শফীর আনচান করে মন শাহনাজকে কাছে পাওয়া নিয়ে। সেই মুখের একাংশ আর পা দেখে প্রেমে পড়েছিল শফী, তার বিয়ের সেই সন্ধ্যায় শাহনাজকে লিচুতলায় তার খালার বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসবার সময়, রাস্তার আলোয় সম্পূর্ণ মুখটা দেখেছিল শাহনাজের, আর একটিবার হাত ধরেছিল।

শাহনাজের সেই স্পর্শের ঘোর এখনও লেগে আছে শফীর শরীরে, সে জন্যেই তো মেটিয়াবুরুজের পরিচিতদের আড্ডায় গিয়ে বসছে না, ধার্মিকদের কাছে খাতির পাওয়ার জন্য গিয়ে বসছে না। বন্ধুবান্ধবদের দলিজে দোকানে কারবারে ঘুরে ঘুরে আড্ডা মারার যে স্বভাব, সে সব বন্ধ। এখন শফীউল্লা বিবাহিত প্রেমিক ধর্মের কোনো মশালা, ব্যাখ্যান, তফসির করছে না। সেজন্য তাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। আর হঠাৎ বিয়ে করে বসার জন্য মেটিয়াবুরুজের নানা এলাকায় নানা জায়গায় তাকে নিয়ে নানা কথা, নানা কথার আন্দোলন, তাই তার আত্মগোপনতা জরুরি হয়ে পড়েছে। লাইব্রেরি ভালই আত্মগোপনতা দিয়েছে তাকে।

লাইব্রেরি ঘরের খোলা দরজার বাইরে কীসের যেন একটা নড়াচড়া, মগ্নতায় বাধাসৃষ্টি করছে কী যেন। লাইব্রেরিয়ান তার টেবিলে মুখ গুঁজে ঘুমচ্ছে। বুকসটার ধারে বাড়ে নেই, চা দোকানে আড্ডা দিচ্ছে। দরজার বাইরে একটা ছায়া নড়ে যাচ্ছে শুধু। শফীর মনোসংযোগে বিঘ্ন আসে। চাপা স্বরে বলে ওঠে, 'কে?'

লাইব্রেরিয়ান রতনলালের ঘুম ভেঙে যায়, মুখ তোলে, কষ বেয়ে লালা বেরিয়ে এসেছে সহসা। ঘুমকাতর চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে আবার টেবিলে মাথা নামিয়ে আনে রতনলাল।

তার এই রাশভারি স্বরে 'কে' বলার পরও, দরজার বাইরে বারান্দার ছায়া উটকো অনভিপ্রেত কারু উপস্থিতির নড়াচড়া সরে যাচ্ছে না। শফী দরজার দিকে তাকায় মুখ তুলে, জোব চার্নকের কলকাতা আসার কাহিনীকে সরিয়ে ঠায় তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে। দরজার ফ্রেম বাইরের রোদের আভায় আলোকিত। হয়তো কেউ এসেছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে আসতে পারছে না। শফীর মেজাজকে সকলেই ভয় করে। শফী এবার কণ্ঠ নামিয়ে মোলায়েম স্বরে বলল, 'কে? ভতরে এস।'

কে আসবে, অপেক্ষায় দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল শফী। এক দুই তিন না সাহস করে আসতে পারছে না। শফীরও কৌতূহল বেড়ে গেল। কে এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে? একটু অপেক্ষার পর সেই আলোকিত দরজার ফ্রেমে একজন শিশু ফুটে উঠল। হাফ প্যান্ট পরা, খালি গা। বছর তিন বয়েস। পেছন দিক থেকে আলো লাগছে, আর লাইব্রেরি ঘরের আলোর ভিতর উঠে আসছে

। বলে চিনতে পারছে না শিশুকে। প্রথম দেখে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় ফীর। মনে হয় গায়েবি, অলৌকিক কিছু দেখছে। যেন ধর্মের আশ্চর্যকাহিনীর তো কোনো অলৌকিক শিশু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। শফীর অল্প কটু মাথা ঘুরল। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন দিক দিয়ে আলো পড়েছে শুটির অবয়বে, শিশুটি হয়ে উঠেছে এক অদ্ভুত শিশু, অদ্ভুত এক শিহরনে কেঁপে ঠছে শফীর শরীর মন। সবই আল্লার কুদরত। তার সঙ্গে বোধহয় কোনো লৌকিক সাক্ষাৎ ঘটাতে চলেছে। কেন না সে বিয়ে করেছে, তার এই ক্রান্তিলগ্নে কানো অলৌকিক শিশুর সাক্ষাতের মাধ্যমে, কোনো কিছুর সতর্কবাণী থাকতে ারে, কিংবা ভবিষ্যতের কোনো কর্মসূচি পাবে।

এই দৃশ্যের সামনে শফীর পক্ষে জ্ঞান হারিয়ে ফেলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু মনে য়, তার জ্ঞান হারিয়ে যায়নি। আবার মনে হয়, হয়তো সে জ্ঞান হারিয়েই আছে, ার সেই অলৌকিকতার মধ্যেই এক সজ্ঞানতা। নাকি যা দেখছে, বাস্তব নয়? ই যে লাইব্রেরি ঘরে বসে ইতিহাসের বই খুলে দরজায় দাঁড়ানো শিশুর দিকে াকিয়ে আছে, এ সমস্ত বাস্তব হয়তো নয়, সে আদৌ আজ দুপুরে লাইব্রেরিতে াসেনি। তার একটু তফাতে টেবিলে মাথা নামিয়ে যে লাইব্রেরিয়ান রতনলাল য়েছে, সে আসলে রতনলাল নয়। হয়তো বা অনুভব আচ্ছন্নতায় পাওয়া এই টনা, যার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির ভিতর তর্কাতীত কোনো মহিমার যোগ আছে, ার ভিতর বান্দা সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য বাড়াবার সুযোগ পায়, বিপথগামী য না, পরলোকের আবাদে স্থিরনিষ্ঠ থাকে, আল্লাওয়ালা হয়ে ওঠে। যেন মনে য় এই ঘটনা আমরণ শফীর জীবনে প্রলম্বিত হয়ে থাকুক।

শিশুটি চৌকাঠ পেরিয়ে লাইব্রেরি ঘরে আলোয় এল। শফী চিনতে পারল শুটিকে। রিকশাওয়ালা সালামের ছেলে। সালাম বাড়ি থেকে রিকশা করে াইব্রেরিতে এনেছিল। লাইব্রেরিতে সেই দুপুর একটায়। কবজি উলটে সময় দেখে ফী, আড়াইটে বাজে। এই দেড় ঘণ্টা সালাম তার বাচ্চাটাকে নিয়ে বারান্দায় াছে। শফী রিকশা ছেড়েছে কিনা বুঝতে না পেরে বাইরে অপেক্ষায় থেকেছে। ার শফীর কাছে গিয়ে সে কথা জিজ্ঞেস করবার হিম্মৎ সালাম রিকশাওয়ালার কানোদিনও হবে না। তাই ছেলেকে নিয়ে বসেছিল বাইরে বারান্দায়। রিকশার াঙ্গেই সালামের এই ছেলেটা সারাক্ষণ থাকে। সওয়ারি বওয়ার সময় সালাম সিটের ামনে রডে বসিয়ে নেয়। এই দৃশ্যটা মেটিয়াবুরুজের মানুষ বেশ কয়েক মাস রে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বলে এখন সকলের স্বাভাবিক মনে হয়। াইব্রেরির বারান্দায় শফীর জন্য রিকশা নিয়ে সারাদিন অপেক্ষা করলেও শফী াকে পুষিয়ে দেবে, সারাদিনের রোজগণ্ডার থেকে বেশিই দেবে। কিন্তু এই যে ারবালা থেকে বড়তলা এল, এখন মালিক রিকশাটা ছেড়ে দিয়েছে না দেয়নি, স কথা শুধোবার জন্য শফীর সামনে দাঁড়িয়ে বুকের জোর সালাম রিকশাওয়ালার নই।

কিন্তু শিশুটি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিল। বারান্দায় থেকে উশখুশ করেছে। বিঘ্ন

ঘটিয়ে গেছে শফীর পড়াশোনায়। এখন 'কে' ডাক শুনে নিজেই এগিয়ে গেছে দরজার দিকে। বাইরে সালাম ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এই হয়তো বেরিয়ে এসে রাগভরে সালামকে চড় কষিয়ে যাবে। কিংবা তার ছেলে আঞ্জুমকে দু-চার ঘা মারতেও পারে। তাতে যদি সালামের অপরাধ ঘোচে ঘুচুক। ছেলেটির মা অর্থাৎ তার বিবি মারা গেছে সাত মাস হল। আর কেউ নেই তার, ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়েই রিকশা টানে। তেমন একটা বিপদের সামনে দাঁড়িয়েছিল সালাম, অপেক্ষা করেছিল তেমন কোনো দুর্ঘটনার।

'আয়।' মোলায়েম স্বরে শিশুটিকে ডাকে শফী।

শিশুটি নির্ভয়ে এগিয়ে যায়, মুখোমুখি টেবিলের এ প্রান্তে দাঁড়ায়। টেবিলের উচ্চতা থেকে সামান্য খাটো সে। শফী উঠে দাঁড়িয়ে আঞ্জুমের মাথায় হাত রাখে মুখে তার হাসি, হাত আদর দিয়ে চলেছে। শিশুটির সাক্ষাৎ তাকে অদ্ভুত এক অনুভবে পৌঁছে দিয়েছে। সৃষ্টির ভিতর সৃষ্টিকর্তার অপার দয়ার এক বোধ এনে দেয় তাকে। হয়তো বা শিশুটির সঙ্গে এই সাক্ষাতের ভিতর তার ভবিষ্যৎ জীবনের কোনো পূর্বাভাস আছে, যা হয়তো শফী ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সেও তো গুণাগার বান্দা, আল্লাওয়ালা লোকেদেরও বিস্তর গুণাহ্ থাকে। সেই জন্য তার বোধের অগম্য এই শিশুদর্শন, এই শিশুবেশ যে আসলে কী, তাই তার পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। অন্তত অনুভূতি দিয়ে বুঝে নিতে তো পারে, কোনো কিছু।

পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে শিশুটির হাতে দেয়, শিশুটি টাকাটা পেয়ে দ্রুত দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে যায়।

শফী হাসি মুখেই মোলায়েম স্বরে ডাকল, 'সালাম!'

সালাম একটু পরেই গলায় জড়ানো গামছায় মুখ মুছতে মুছতে ভেতরে এল মাথা নিচু করে সামনে দাঁড়ায়। 'সাহেব, ডাকছেন?'

'হ্যাঁ, তুই আছিস, ভুলেই ছিলাম। থাক, দেরি হবে। ছেলেটাকে খাইয়েছিস?'

'না, দেরি হল। বুঝতে পারিনি আপনি বেরবেন কখন?'

'কখন বেরব জানি না। তবে কাছে ভিতে থাক, খুঁজে নেব। সারাদিনের রোজগণ্ডা তোর আজকে, ছেলেটাকে খাওয়া গিয়ে।'

'ছেলেটাকে রোজগণ্ডা—পঞ্চাশ টাকা—'

'না, ওকে এমনি এমনি দিয়েছি।' শফী হাসে।

সালাম রিকশাওয়ালা বুঝে উঠতে পারে না শফীউল্লা হঠাৎ আজ এত উদারহস্ত হয়ে উঠল কেন? রোজগণ্ডা হিসেব কষে তবে দেয়, আজ আবার মুফতে পঞ্চাশ টাকা ছেলের হাতে দিয়ে দিয়েছে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে ভাবনায় পড়ে যায় সালাম। বিয়ে করে শফীউল্লার মাথা বিগড়েছে নাকি? এমন মোলায়েম স্বরে কথা বলার স্বভাব তো নয় বড় বাড়ির মানুষটার! এমনি এমনি পঞ্চাশ টাকা পাওয়ার আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে মিইয়ে যায় এই কথা ভেবে যে আজ মাথা বিগড়ে যাওয়া শফীউল্লা তার গাড়ির সওয়ারি, বেয়াড়া আবদারে জেরবার হতে হবে নাকি?

পাগলকে নিয়ে কত রাত পর্যন্ত কাটাতে হবে কে জানে। শফীর হঠাৎ বিয়ে করে বসার পেছনে, পাগল হয়ে যাওয়ার লক্ষণ কাজ করেনি তো?

২

সেই শিশুটির কথা ভাবছিল শফী। কেমন নরম হয়ে উঠেছে তার মন। তারপর মনে এল শাহনাজ, উশখুশিয়ে উঠল মনের অতল তন্ত্রীগুলো। এতোদিন বিয়ে করেনি, তার সামনে পাশে পেছনে কত রমণীরা ঘোরাফেরা করেছে, পথে প্রান্তরে অন্তঃপুরে দেখেছে অথচ মনে দাগ কাটেনি, রমণীতে আসক্ত হয়নি, বিয়ে করার জন্য এমন উচাটন হয়নি কোনোদিন। হয়তো বা এটা তার একটা অবাক দশা। আর মনটা যে এত কোমল তরলতর হয়ে উঠছে, এটা তার স্বভাবের রূপান্তর এক। হয়তো বা প্রেমিক হয়ে উঠেছে বলে। হ্যাঁ, প্রেম খুব প্রয়োজন জীবনে। কিন্তু এতোদিন কেন সে প্রেমহীন, নারী আসক্তির বাইরে ছিল? সেই সূত্রটা কিছুতেই ধরতে পারছে না শফীউল্লা। সে যা ছিল না তা হল কেমন করে? যে কিনা কোনো নারীর দিকে তাকাতো না, সে এক বিধবা আধবুড়ি রমণীর প্রতি আসক্ত হল আর বিয়ে করে বসল সহসা?

সে বুঝতে চাইল যুক্তি দিয়ে। নিজেই নিজের মতো করে যুক্তি সাজায়। টাকা পয়সার সঙ্গে কোথাও কি নারীসম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা কাজ করে নাকি? হ্যাঁ. তার বেশ কিছু টাকা হয়েছে, সে মানে। টাকা পয়সা খরচখরচা বিশেষ হয় না, ব্যাঙ্কে আর আলমারিতে টাকা জমায়, খদ্দেরদের কাছে টাকা জমে। টাকার এই আগম তো বছর ছয় থেকে চলছে, সেদিন থেকে তো এমন বাসনার হাতে পড়েনি! আর কিনা মাত্র দুদিন আগে হঠাৎই আধবুড়ি বিধবাতে মন টানল? সমস্ত নারী-বিবর্জিত স্বভাবে এক পুনরুজ্জীবন ঘটে গেল কেনই বা?

যুক্তি সাজায় শফীউল্লা লাইব্রেরি ঘরে বসে নানারকম বইয়ের ভিতর মুখ গুঁজে। যুক্তি আনে, হয়তো বা মানুষের জীবন কোনো এক সময়ে মোড় নেয়, যাতে তার স্বভাবের উল্লম্ফন ঘটে, হয়তো বা সে সমস্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে একভাবে বাসনার বসবাস গড়ে।

কিন্তু না বাসনা কখনও শফীকে ধর্মবিরোধী আচরণে নিয়ে না যায় এটা সে পালন করবে। সেই জন্যই তো শাহনাজকে বিয়ে করে ফেলা তার। কোনো অশুচিতা কোনো অধর্ম অন্তত তার হাত দিয়ে হবে না। নারী লোলুপতাই তো অধর্মে নিয়ে যাওয়ার একটা বিষম বস্তু, তাকে আইনসম্মত, ধর্মমতে শুদ্ধ সুস্থ করে নিলে আর সেই নারী লোলুপতার কোনো দোষ থাকে না। সেই নারী যে-নারী শাহনাজ, তার পায়ের একাংশের ও মুখের একাংশের রূপ দেখে আসক্ত হয়েছিল. তাকে বিয়ে না করে বারবার আসক্ত হওয়া, তাকে কাছে পাওয়া সম্ভোগ করার ভাবনা ভাবা, মজে থাকা অন্যায় পাপ ধর্মবিরোধী হত শফীউল্লার দিক থেকে। তাকে বিয়ে করে নিলে লোলুপ হয়ে থাকায়, শয্যাসঙ্গী হওয়ার রসনাতে থাকা কোনো অন্যায় কিছু

নয়, কোনো পাপ নেই, কোনো অধর্ম নেই তাতে। সেহেতু তার এই রূপান্তর শাহনাজনাম্নী এক বিধবা রমণীর সম্ভোগের প্রতি যে তাড়স, সেটা এখন আর অন্যায় কিছু হচ্ছে না, অধর্ম হচ্ছে না। বরং সে পুণ্যলাভ করছে। স্ত্রীর প্রতি প্রেম আসক্তি সম্ভোগক্রীড়া পুণ্য এনে দেয়। বরং এই আচরণ তার পরলোকের জীবনকে সুফল এনে দেবে।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কেন এমনটা হল তার, এই স্বভাবের অন্য একটা অবরুদ্ধ দ্বার হঠাৎ খুলে গেল কেন? সে ভাবে, সারাক্ষণই তার এই লক্ষণের সূত্র খোঁজে, কিন্তু কোনো হদিশ করতে পারে না। শরীর ও মনের একটা অংশ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে পড়েছিল। শাহনাজের রূপ তাকে উদ্দীপিত আলোকিত করেছে। সে প্রেমিক হয়েছে, আহা প্রেমিক! চাঁদ আর ফুলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। সে ভালবাসতে জানে, ভালবাসতে পারছে। সে পুরুষমানুষ, সহসা পুরুষ হয়ে উঠেছে। সে নারীলোলুপতা পেয়েছে, কিন্তু তার বিবাহিত নারী ছাড়া অন্য কোনো নারীতে আসক্ত হওয়া চলবে না, অন্তত আসক্তিচরিতার্থতা করতে পারবে না, অন্য কোনো নারীদের তার প্রতি তার কোনো ভয় থাকবে না, কেন না সে ধর্মবিরুদ্ধ কিছু করবে না। বরং সে বিয়ে করে নিতে পারে, তাহলে তো সেই নারীর প্রতি তার সেই লোলুপতা সম্ভোগচরিতার্থতার যে অন্যায় পাপ তা আর থাকছে না। কিছুতেই পাপ হতে দেওয়া যায় না, তার জন্য তো আছে একটার পর একটা বিয়ে। সে তো একটাই বিয়ে করেছে, এখন তার চারটে বিয়ে করার দরকার হচ্ছে না। চারটে কেন, চল্লিশটা পর্যন্ত বিয়ে করা যায় তাতে অধর্ম হয় না। শফী ধর্মের অনেক নিয়মকানুন জানে, সমাজে মজলিশে সে সবের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। একসঙ্গে চারটি বিবি রাখা যায়, তা বলে চল্লিশটি বিয়ে করা যাবে না কেন? একসঙ্গে চারটি বিবিই কোনো দুর্ঘটনায় মারা গেলে, তখন কি আর সেই বিপত্নীক স্বামী বিয়ে করতে পারবে না? তেমনই চারটে থেকে একটি কোনো ভাবে মরে গেলে আবার একটি বিয়ে করতে পারবে, দুটি মরলে দুটি, তিনটে মরলে তিনটি বিয়ে করতে পারবে, তার কোনো সংখ্যাতে বেঁধে দেওয়া নেই। তবে হ্যাঁ, চারটে বিবি বর্তমান পর্যন্ত পঞ্চম বিবি আনা অন্যায় হবে। ধর্মের বই পড়ে পড়ে মশালা জেনেছে শফী, মনে মনে ঝালিয়ে নেয় সে সব।

জ্যৈষ্ঠ শেষের রোদের তেজ কমতে শুরু করেছে। বিকেল হয়ে গেছে। বাইরে হালকা ছায়া এসে নেমেছে। হয়তো বা মেঘ এসেছে মেটিয়াবুরুজের আকাশে। বাইরের রাস্তায় যান চলাচলের হল্লা বেড়েছে। রিকশা যায়, বাস লরি ট্যাক্সি টেম্পো অটোরিক্‌শা মোটরবাইক যায়। শহর ব্যস্তসমস্ত, বিকেল থেকে যানজটে মহল্লা কাহিল হয়ে পড়ে। লাইব্রেরিয়ান আর বুকসটার লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে বাইরে দোকানে চা খেতে গেছে। শফীর পক্ষে লাইব্রেরির ভেতর বই মুখে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকাই সঙ্গত, নতুন কিছু নয়। অনেক সময় লাইব্রেরির কর্মীরা বাইরে সারাক্ষণ আড্ডা মারে আর সারাক্ষণ লাইব্রেরির ভেতর থাকে শফী একা।

গ্রাহক আসে সে-দুচারজন, সে সন্ধ্যার সময়। তার মতো পড়ুয়া নেই। হয়তো বা বারান্দার বাইরে সালাম রিকশাওয়ালা তার শিশুপুত্র আঞ্জুমকে নিয়ে বসে আছে। কিংবা গামছা পেতে ঘুম পাড়িয়েছে আঞ্জুমকে। হয়তো বারান্দায় নেই, বাইরে চা-দোকানে এদিক সেদিক আড্ডা মেরে চলেছে। তুমুল আলোচনায় মেতে আছে বা।

দরজার ফ্রেমে আলোছায়ার অস্পষ্ট অবয়ব নিয়ে দাঁড়াল এসে এক নারী। সেই কাঙ্ক্ষিত নারী শাহনাজ। শফী দেখতে পাচ্ছে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়েছে। বাইরের সেই পেছন থেকে লাগা মরা আলোয় মুখ ছায়াময় হয়ে উঠেছে শাহনাজের। শাহনাজ শাড়ির ঘোমটায় না বোরখায় ধরতে পারছে না, বিভ্রম তৈরি হচ্ছে। ছায়া এসে ঘিরে রেখেছে তার মুখ, তবুও তাকে চেনা যায় শাহনাজ বলে। বাস্তব না বিভ্রম? সত্যি না অলৌকিক? সত্যি হলেও শফীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, অলৌকিক হলেও না। কিন্তু না সে দেখছে শাহনাজ এসেছে। পরম পুলকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে শফী, 'শাহনাজ তুমি?'

'না আমি!'

আশাহত বিস্ময়াভিভূত হয় শফী। 'তবে কে তুমি?' সে যে শাহনাজ এই উপলব্ধি তার অটুট থাকছে কেন বুঝে উঠতে পারছে না এই মুহূর্তে, তাই এ যে শাহনাজ, এই আশা কামনা জাগিয়ে রাখে সে, প্রশ্ন করে, 'তবে তুমি কে?'

'আমি?'

'তুমি তো শাহনাজ!'

'না।'

আরও একটু মরে উঠল বাইরের আলো। আরও একটু ঘনিয়ে উঠল মেটিয়াবুরুজের আকাশে মেঘ। ধীরে দরজার চৌকাঠ থেকে পা নামায় সেই নারী। বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে শফী। অন্য পা-টিও সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। না শাহনাজ নয়, এক অল্পবয়সী রমণী, তবে এক পলক দেখলে শাহনাজ বলে ভুল করতে হবে। কিন্তু অপুর্ব সুন্দরী। কম বয়সের জন্য আরও তার লাবণ্য, আরও তার শারীরিকতার ছন্দ। শাহনাজের মুখ বসানো। শাহনাজের চেয়ে আরও সুন্দরী এ নারী। নিশ্চয় শাহনাজের মেয়ে। সম্পর্কে তারও মেয়ে? না তার মেয়ে হতে যাবে কেন? তাতে তার ঔরস নেই। এও এক নারী।

'আমি শাবানা।'

'শাবানা! তোমার নাম? বা ভারি সুন্দর নাম তো! দেখতেও তুমি সুন্দর!'

শাবানা মুখ নত করে, মাটির দিকে দেয় দৃষ্টি।

সেই সুযোগে প্রাণপণ দৃষ্টি দিয়ে রমণীটির রূপ দেখে শফী। হঠাৎ করে শফীর মধ্যে কামনা বাসনা এই যে ফিরে এসেছিল, এই যে শাহনাজের প্রেমে পড়েছিল, শাহনাজকে বিয়ে করেছিল, সেই নবগঠিত অনুভূতিতেই রমণীদর্শন করে। সে জানে এতে তার পাপ হয়, এ রমণী তার স্ত্রী নয়, তবুও কেন জানি পারে না নিজের চোখ বন্ধ করে রাখতে।

'আমার মাকে আপনি বিয়ে করেছেন। সেই নিয়ে কথা বলতে এসেছি আপনার সঙ্গে।'

'কে তোমার মা? শাহনাজ?'

একটু মুখ তোলে, কড়ির মতো চোখের পাতাগুলো ওঠে, 'হ্যাঁ'।

স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে শফী। শাহনাজের মেয়ে শোনা সত্ত্বেও তার চোখ শাসন মানছে না, তার অনুভব কোনো বেড়ি পরতে চাইছে না। ক্রমশ শাবানার রূপে মুগ্ধ হয়ে উঠছে। শাবানার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। ঠিকই শাহনাজের একটু রূপ দেখে প্রেমে পড়েছিল, কিন্তু এর কাছে সেই রূপ কিছু নয়। এর লাবণ্যের কাছে তার লাবণ্য সামান্য। হয়তো বা এরই প্রেমে পড়তে চেয়েছিল, শাহনাজ দিশামাত্র। চরম আকাঙ্ক্ষা দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার আগে করেনি কখনও, তাই ভুল করে শাহনাজকেই বিয়ে করে ফেলেছে। এর প্রতিই প্রেমে পড়ার কথা। একেই বিয়ে করার সমস্ত সাধ ছিল তার, একে না দেখা পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি। এখন বুঝছে, এই লাইব্রেরির ভিতর, মরা বিকেলের আভায়। এই নারীই তার আকাঙ্ক্ষিত, তাতে তার পাপ হয় বুঝেও—কেন না এ নারী তার বিবাহিত নয় জেনেও রূপে মজে, প্রেমে পড়ে, জীবনে পাবার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। হ্যাঁ তাতে পাপ হয়, কিন্তু সামান্যতম পাপ। কেন না তার সঙ্গে জেনা বা অবৈধ যৌনাচার করছে না! বিবাহিত নয় অন্য কারুর রূপে মুগ্ধ হওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত পাপ যতক্ষণ না তাকে বিয়ে করছে! তবে কি সে একেই বিয়ে করবে?

কিন্তু রমণীটিকে এই কামনাবাসনায় দেখা তার পাপ হচ্ছে জেনেও দেখায় সে ছেদ আনতে পারছে না, প্রেমে পড়া সে রোধ করতে পারছে না। এই যে পাপ হচ্ছে আত্মোপলব্ধি সত্ত্বেও সে নিজেকে সামলাতে পারছে না, তাতে তার মনে হয় সে সাধারণ একজন মানুষ, আল্লার ওলি নয়, পাপপুণ্যে গড়া মানুষ। কিন্তু এই পাপ থেকে নিজেকে মুক্তশুদ্ধ করার পথ নিজেকেই খুঁজতে হবে। হয়তো বা খুঁজতে হবে ধর্মের নির্দেশ।

সে সত্যিই আশ্চর্য মানুষ। এ কেমন হল? এই রমণীর মাকেই গত দুদিন আগে বিয়ে করেছে, আর দুদিন আগে কেন সাক্ষাৎ ঘটল না এই নারীর সঙ্গে? জীবনের এক সংকটকালে উপনীত হয়েছে শফীউল্লা। জানে না সে কীভাবে উদ্ধার পাবে? শাহনাজকে বিয়ে করে এই মেয়েকে বিবাহিত হিসেবে পাওয়া কোনোদিনও সম্ভব নয়। অথচ এই প্রেম এই কামনাবাসনা সে পেল। তার সমস্ত আমলনামা কি এই রমণীর প্রেমে পড়া কামনাবাসনায় বরবাদ হয়ে যাবে? চরম এক আত্মসংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে শফী। এ নারী কেন তার সাক্ষাতে এল? একে না দেখলে শাহনাজের প্রেমে ও দেহে মজে থাকা জুটতো তার। কোনো সংকটদশা এসে তাকে এমন ভরিয়ে তুলত না। অথচ একটু আগে পর্যন্ত শাহনাজের প্রতি কামনাবাসনা প্রেমের আকর্ষণ কম কিছু ছিল না, সেই নিয়ে বেশ থাকা জুটতো তার। শাবানাকে দেখার পর আপেক্ষিকতায় শাহনাজের প্রতি কামনাবাসনা প্রেম তুচ্ছ, কোনো কিছু নয়।

৩

পাঠক, আমরা বরং এখন শফীউল্লাকে শাবানার প্রতি নবকলেবর প্রেম মুগ্ধতায় রেখে, শাবানার আগমনের অব্যবহিত আগের অনুভবের অনতিকল্প ভবিষ্যৎ ঘটনায় যাই। যেখানে এই বোধ ও আনন্দে ছিল শফী, আজ শাহনাজ তার ঘরে আসবে, আর সে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরবে, যাতে করে বাড়ি ফেরামাত্র শাহনাজকে পাওয়া জোটে। অনতি অতীতের এই জায়মান আকাঙ্ক্ষার কাছে যাওয়া আমাদের ঠিক হবে। শাবানাকে পাওয়া নিয়ে পৃথিবীর বিরলতম এক সংকট, সুযোগমত কোনো এক সময়েই সেই ঘটনায় আমরা তো যেতেই পারব, আখ্যানের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমাদের না গিয়ে তো উপায় থাকবে না। কিন্তু একটু আগে, শাবানার আগমনের আগে যে অনতিমৃত সময় বয়ে গেছে, তার গর্ভে যে অনতিভবিষ্যতের কল্পনা, পরিকল্পনা, আকাঙ্ক্ষা প্রাণতা ছিল, সেই ভবিষ্যৎ ঘটনা শাবানার আগমনের ক্রান্তিতে কখনও পাব না ভেবেই সেই মৃত অনতি অতীতের সাধের অনতি মৃত ভবিষ্যতের ঘটনার ভিতর যাওয়া এক প্রাপ্তি হবে, কল্পনার মুক্তি হবে।

লাইব্রেরিতে সন্ধে পর্যন্ত পড়াশোনা করে বাইরে অপেক্ষমাণ সালাম রিকশাওয়ালার রিকশায় চেপে চলে যেত সে অন্য কোথাও। হয়তো কাঁচি সড়কে শাহী পান দোকানে। মেটিয়াবুরুজের যে কোনো জায়গায় চলে যেত সে। গঙ্গাতীরে, মসজিদের আড্ডায়, চা দোকানে, বন্ধুদের দলিজের মজলিশে, তর্কে উপদেশে যে কোনো অবস্থায় থাকা হত তার। অনতি ভবিষ্যতে ঘটতো অথবা ঘটবে না, তেমন কল্প ঘটনায় শফীউল্লাও যেতে চাইছে। এ আখ্যান বা কিস্‌সা সময়ের অনুক্রম ভেঙে দিচ্ছে। তাই এই কিস্‌সা মেটিয়াবুরুজের নয়, মেটিয়াবুরুজে ঘটছে—পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটতে পারত। আখ্যানকার মেটিয়াবুরুজে এ কিস্‌সার কল্পনা করেছে মাত্র।

আর একটু আগে পর্যন্ত শফী শাহনাজের প্রেমে ও সম্ভোগের অনুভবে ভরে ছিল, তার একটা ঘটনান্তর ছিল, যেহেতু তাকে হারিয়ে ফেলেছি বলে আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করছি। একটা মিথ্যেকল্প বাস্তব ঘটনায় যেতে চাই আমরা। শফী, শাবানাকে সামনে রেখে তৈরি হয়েছে সেই কল্পঘটনায় যেতে।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সালাম উঠে দাঁড়ায়, শিশুটিও রিকশার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই শিশু যার মধ্যে অলৌকিক দেখা জুটেছে তার। রিকশায় উঠে বসতে সালাম শুধলো, 'কোথায় যাবেন?'

কোনো উত্তর দিল না শফী।

সালাম বুঝে নিল তার মতো করে যেতে হবে, পাঁচুড় কিংবা রাজাবাগান কিংবা কিলখানা যেখানে খুশি যাওয়া হলেই হবে তার। কিন্তু সালাম রিকশাওয়ালার মনে একটা খচখচানি লেগেই আছে, হয়তো বা বড় বাড়ির মানুষটার মাথায় ছিট এসেছে, না হলে আঞ্জুমকে পঞ্চাশ টাকার নোট এমনি এমনি দিয়ে দেয়? ভয় হয় মানুষটিকে

সওয়ারি করে কোনো অস্বস্তিকর ঘটনায় পড়বে কিনা। ছিটগ্রস্ত শফী মিঞার কোনো আচরণে পথচারী কেউ কেউ খেপে গেল, তার রিকশা ভাঙচুর করল পথচারী। সওয়ারির অভব্য আচরণে কখনও কখনও রিকশাওয়ালা বিপদাপন্ন হয়। আর ছিটগ্রস্ত হলে পথচারীর গায়ে পানের পিক ফেলা অদ্ভুত কিছু নয়, সওয়ারির পক্ষে অদ্ভুত কিছু নয়। চলন্ত অবস্থায় কোনো বউবিটির গায়ে হাত বাড়িয়ে দেওয়া এমনটা করে থাকে মহল্লার মাস্তানরা আর আধপাগলরা। এমন মোলায়েম স্বরে শফীকে কথা বলতে কখনও তো শোনেনি সালাম!

শফী বলল, 'দাঁড়া সালাম।'

সালাম একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

শফী বলল, 'পানের দোকানের সামনে আনলি কেন?'

'মনে করেছি পান খাবে।'

'দে, ছেলেটাকে রডে বসিয়ে না রেখে আমার কোলে দে।'

ব্যাপারটা সুবিধে মনে করল না সালাম। আঞ্জুমকে কোলে নিতে চাইছে শফীউল্লা? তার পরে কপালে কী দুর্ভোগ রেখেছে কে জানে। শফীর আদেশও অমান্য করা যায় না। অতএব রিকশায় শিশু আঞ্জুমকে তুলে দিতে হল শফীর কোলে। লোকটার কথার অবাধ্য হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ঘাড়ে দুটো মাথা নেই তার।

রিকশা যে মুখো সেদিকেই যেতে হচ্ছে, আক্রা রোড, অধুনা এস এ ফারুকি রোড ধরে সোজা মেটিয়াবুরুজ থানা আর গার্ডেনরিচমুখো। রাস্তায় যানজট। কখনো কখনো রিকশা যায় ধীরগতিতে। চেনা মানুষ কথা বলতে চায়, শফী তাদের পাত্তা দেয় না, অন্য চিন্তায় বুঁদ হয়ে আছে বোঝায়। রাস্তার দু পাশে বেশ কিছু মসজিদ পড়ছে, সেখান থেকে চেনা পরিচিতরা হাত নেড়ে শফীকে সৌজন্য দেখাচ্ছে। শফী কিছুই দেখছে না। শফীর কোলে এক শিশু দেখে চেনা পরিচিতরা খানিকটা অবাক হয়, শফীকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারছে না। হয়তো যাকে বিয়ে করেছে তারই সন্তান ভেবে নিয়ে শফীকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে এই ভেবে ডাকতে পারছে না। শফী চলেছে সেই ভাবনায়, সেই শাহনাজকে কাছে পাওয়ার আনন্দে শাহনাজকে কাছে পাওয়া আগতপ্রায়। এই তো রাত দশটা সাড়ে দশটার পরে বাড়ি ফিরবে, কিছু খেয়েই উঠে যাবে তার তেতলার ঘরে, সেখানে শাহনাজ থাকবে।

এতক্ষণে শাহনাজকে মারুতির ভিতর কাছে বসিয়ে জিয়াদ ম্যানেজারের বিবি তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। বাড়ির লোকজন চমকেছে, কলমা পড়ে সে যে শফীর বিবি হয়েছে, তাকে তো মেনে নিতেই হবে। গরিব হলেও আপত্তির ছিল না, বিধবা আধবুড়িকে বিয়ে করল কেন? ভাল লেগেছে, তাই বিয়ে করেছে সে তো প্রেমিকের মতো প্রেমে পড়েছে, সেখানে বাছবিচার নেই। এতদিন পরে শাহনাজকে দেখে এই বিয়ের সাধ জাগল। গত দুটি রাত সেই শাহনাজের

কল্পসাক্ষাতে কেটেছে তার। শাহনাজের সঙ্গে কল্পমিলন হয়েছে তার। দাদা বলতেই পারত, এ আধবুড়ি, একে তালাক দিয়ে ছেড়ে দে, অন্য একজন অল্পবয়সী এর চেয়ে সুন্দরীর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। পাখি পড়া করে বোঝালেও প্রাণ থাকতে শাহনাজকে ছাড়তে পারবে না শফী, লাইব্রেরি ঘরে শাবানা আসার অনতিপূর্ব ঘটনার গর্ভে জায়মান ছিল অনতি ভবিষ্যৎ বাস্তবতা, সেই মিথ্যে, কল্পবাস্তবতায় এখন শফী শাহনাজের প্রেমে মজে থাকে। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যে পারে তার কাছ থেকে শাহনাজকে কেড়ে নিতে। সে ভালবাসে, ভালবেসে ছটফট করে। আজই প্রথম একান্ত সাক্ষাৎ ঘটবে শাহনাজের সঙ্গে। দাদা শওকতউল্লা যতই আপত্তি করুক না কেন, একবার বাড়িতে শাহনাজকে তুলে নিতে পারলেই হল, সব চুকে বুকে যায় ধীরে ধীরে। শাহনাজের রূপ তাকে মজিয়েছে, অন্য কোনো নারীর লোভ তাকে কিছুতেই টলাতে পারবে না।

কাঁচি সড়কে এসে রিকশাটা সালামকে ডান দিকে নিয়ে যাওয়ার ইশারা করে। প্রথমেই পড়ে শাহী পান দোকান। নবাব আমল থেকেই এই পান দোকানটা আছে। আর নবাব আমলের হেকিমি দাওয়াখানার দোকানগুলো, তারপর ঘুড়ির দোকানগুলো। কর্মচারীরা ঘুড়ি বানিয়ে চলেচে হাঁটুমুড়ে মুখগুঁজে বসে। পাহাড়পুর রোড ধরে রিকশাটা একটু এগিয়ে যেতেই সামনে ডানদিকে যে পুরনো মসজিদটা পড়ে সেখানে রিকশাটা থামায় শফী। ততক্ষণে তার কোলে অযোধ্যার নবাবের বংশধর প্রিন্স আঞ্জুম কাদেরের নামে সালামের শিশুপুত্র আঞ্জুম ততক্ষণে ঘুমে এলিয়ে আছে। সেই শিশু আশ্চর্য শিশুর বোধ আসে যাকে দেখে, তাকে তুলে দেয় শফী সালামের কোলে পবিত্র কিছু তুলে দেওয়ার সযত্ন ভঙ্গিতে। শফী চলে যায় নামাজ পড়তে।

নামাজ পড়ার পর শফী ফিরে এলে ঘুমন্ত আঞ্জুমকে আবার কোলে নেয়, আর উঠে বসে রিকশায়।

কিন্তু শফীউল্লা কোথায় যাবে? শেষ কোথায় নামিয়ে দেবে? লোকটাকে সে বিষয়ে শুধনো সুবিধের মনে করল না। বেয়াদবি করলে কথায় কথায় থাপ্পড় কষাবার স্বভাব আছে লোকটার। মৌলবি কাদের মওদুদিকে কদিন আগে বে-ফাঁস কথা বলবার জন্য এ লোকটা সজোরে সকলের চোখের সামনে গালে ঠাশ করে চড় কষিয়েছে। সে জন্য কোনো কথা না বলে রিকশা চালায় সালাম রিকশাওয়ালা। নিজের মতো করে যায় ফিরতি পথে। শফীউল্লা রিকশায় চড়লে, একটু পথ গেলে হুটহাট করে এখানে-ওখানে নেমে পড়া স্বভাব পরিচিতদের মধ্যে। পরিচিতরা তাকায় হাসে কিন্তু শফী দৃষ্টি বিনিময় হাস্য বিনিময় করে না। এ কোন শফীউল্লাকে নিয়ে চলেছে সে? ছাড়া পেলেই বাঁচে সালাম। আর তার ছেলেকে কোলে করে চলেছে বড় বাড়ির ধনী মানুষটা? এই অসঙ্গতি তার ভাল লাগে না।

কারবালার রাস্তার কাছে রিকশাটা এলে সেদিকে ইশারায় যেতে বলে শফী। শফী সেই আশ্চর্য শিশুকে নিয়ে চলেছে। যার মধ্যে সৃষ্টির ঐশ্বরিক ও অলৌকিক এক অনুভব খুঁজে পায়। শিশু, নিষ্পাপ। নারী-পুরুষের মহব্বতের ভিতর ঈশ্বরের এক কুদরত।

কারবালার গোরস্থান আসতেই রিকশা থামিয়ে দেয় শফী। নেমে পড়ে শিশুটিকে তার বাবার কোলে দেয়। পঞ্চাশ টাকা সালামের হাতে গুঁজে দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল শফী গোরস্থানের গেটের দিকে। হাত নেড়ে জানিয়েছে, আর আসতে হবে না। শফী চলেছে যেন অনন্তের পথে। আর কোনোদিন দেখা হবে না।

এখনও আটটা বাজেনি। কোনো ঠেকেই সে যাচ্ছে না এই কথা ভেবে যে শাহনাজকে বিয়ে করা নিয়ে কথা উঠতে পারে। একটা অস্বস্তির জায়গা, বিবি বিধবা ও আধবুড়ি। কেউ বে-ফাঁস কিছু কথা বলে ফেললে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, তাই কোনো ঠেকে, বন্ধু পরিচিতদের সমাগমে যচ্ছে না সে। তাছাড়া শাহনাজের ভাবনায় থাকার মগ্নতা হারিয়েও যাবে, তাই সে একা একা থাকতে ভালবাসছে, একা কোথাও সময় পার করে দিতে ভালবাসছে। শাহনাজের প্রেমে মশগুল থেকে, আর এই কারবালার গোরস্থানই সময় কাটানোর উপযুক্ত জায়গা। এখানেই শাহনাজের পায়ের একাংশ ও মুখের একাংশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, বিবাহবাসনা লাভ করেছিল। আর এখানেই তার সঙ্গে নিকা হয়েছিল।

গোরস্থানের অফিস ঘরে, লাগোয়া চাতালে কেউ নেই। গোরকোনরা আছে বাইরে চা দোকানে এখানে ওখানে। গোরস্থান জুড়ে নিস্তব্ধতা, শুনশান। গোরস্থানের গাছে গাছে বাতাসের মিষ্টি ঝরনা বাজে শুধু। সেই অন্ধকার চাতালের কাছে যায়, যেখানে শাহনাজকে প্রথম দেখেছিল। যেখানে তার সঙ্গে শাহনাজের নিকা হয়েছিল। ইজাব বকুল করেছিল শাহনাজ এখানে বসেই, তার খালা নূরজাহান বানুর পাশে গা ধরে থামের আড়ালে।

সদ্য কোনো মৃতের গোর অনুষ্ঠান ঘটে গেছে। কেন না বাতাসে উগ্র আতর আর আগরবাতির গন্ধ ম ম করছে। যে বাড়ির মাইয়েত এসেছিল, যাকে জানাজা কাফনদাফন করে কবরে শুইয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল, সেই বাড়ির মেয়েরা-আত্মীয় মেয়েরা এই চাতালে এসে বসেছিল একটু আগে পর্যন্ত। কেন না মেয়েদের কাপড়ে থাকা কর্পূরের গন্ধ চাতালে লেগে আছে এখনও, তর্জনীতে ঘষে নাকের কাছে নিয়ে গেলে যে সুরভি পাওয়া যাবে।

সেই রূপ, রূপের মুগ্ধতায়, ইউসুফ পায়গম্বরের রূপে জর জর হয়ে জুলেখার কী দশা হয়েছিল? শফীউল্লা থামে পিঠ ঠেকান দিয়ে বসে সেই কাহিনীর ভিতর মগ্ন হয়ে পড়ল। চোখের সামনে তার অতীত মিশর।

৪

ইউসুফ অপরূপ সুন্দর এক যুবক, হজরত ইয়াকুবের পুত্র। পরে যিনি আল্লার নবি, পায়গম্বর হবে। সৎ ভাইয়েরা ইউসুফের হিংসেয় মরে। একদিন ইউসুফকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ছল করে এক কুয়োয় তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এল। বাড়িতে এসে তাদের পিতাকে জানাল ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে। একদল সওদাগর যাত্রা করছিল, তারা ছাউনি ফেলল সেই কুয়োর পাশে। উদ্ধার হল ইউসুফ। সওদাগরের সর্দার মানেক বিন জেগর মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এই অপরূপ

সুন্দর যুবককে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। এদিকে মিশরের বাজারে আগেই রটনা হয়ে গিয়েছিল, এক আশ্চর্য সুন্দর রূপবান যুবককে নিয়ে আসা হচ্ছে, যাকে বিক্রি করা হবে। চড়া দাম শুনে অনেকেই এগোতে পারল না। অতএব মিশরের বাদশার প্রধানমন্ত্রী আজিজ মিশির তাঁকে কিনে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। এখান থেকে শুরু রূপে মুগ্ধতা ও প্রেমের সেই আশ্চর্যকাহিনী।

আজিজ মিশিরের স্ত্রী হল জুলেখা, জুলেখার হাতেই ইউসুফের রক্ষণাবেক্ষণের ভার। প্রথম দর্শনেই জুলেখা ইউসুফের রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়ে গেল। ব্যস, তার সেবা আত্তি, তার চিত্তজয় করবার জন্য নানাকিছু তৎপরতা শুরু করে দিল জুলেখা। কিছুতেই ইউসুফের মন পায় না। কিছুতেই জুলেখার প্রতি ঝোঁকে না ইউসুফের মন। এভাবে সাত বছর কেটে গেছে, অধৈর্য, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে জুলেখা, ইউসুফকে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়ার সাধ তার মিটছে না। মন কাতর, দেহ জর জর। পৃথিবীতে আর কিছু নেই, যা দিয়ে তার এই রূপজ তৃষ্ণা মেটে। ইউসুফ ছাড়া এমন আর কেউ নেই, যে কিনা তার হৃদয় জুড়োতে পারে।

অবশেষে পাড়ার এক কুটনি বুড়ির শরণাপন্ন হল জুলেখা। সেই বুড়ির পরামর্শে যাতে তার ইউসুফের সঙ্গে মিলন হয়। ইউসুফকে না পেয়ে তার কিছুতেই চলছে না। বাতাস গরম হয়ে উঠছে এই অপ্রাপ্তির অনুভবে। ঠাণ্ডা পানীয় সরবৎ কোনো কিছুতেই তৃষ্ণা মিটছে না তার। বুকের পাটা সারাক্ষণ ওঠানামা করছে। কান মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। বহু মূল্যবান রত্নখচিত অলঙ্কার অঙ্গে ভার মনে হচ্ছে। বুড়ি বলল, 'ও জুলেখা, তোমার হাবভাব তো সুবিধের মনে হচ্ছে না। আহা বাছার মুখের ছিরিছাঁদ কী হল গো! আমাকে লুকোছাপা দিওনি তো। বয়সকালে নিজেও কম কি কিছু করেছি! তোমার বয়েসে এসব কিছু দোষের নয়। ছোঁড়ার দিকে তাকালে আমারও বুকে এই বয়েসে হাতুড়ি পেটায়। বোধহয় বাগে আনতে পারছনি বাছাধনকে? আমার কথা মতো চল, তাহলেই—'

খরচখরচা যা লাগল জুলেখা দিল, বুড়ি একটা সাত মহলা বাড়ি তৈরি করল। পাথর, রত্নখচিত, কারুকার্যময় সেই বাড়ি। মহালের প্রতিটি কক্ষের ভিতর দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকানো হল যৌনউত্তেজক সব ছবি। যেখানেই তাকানো যাক না কেন সেখানেই এ ধরনের চিত্রকলার সমারোহ। যাতে পাষাণহৃদয় ইউসুফের জুলেখার প্রতি মন গলে। যাতে যৌন-লালসার প্রপাত শুরু হয় জুলেখাকে ঘিরে। নানাবিধ বিলাস ব্যসনের মূল্যবান সামগ্রী, উত্তেজক খাদ্য ও সুরভিতে মহাল ভরিয়ে রাখা হল। আর সেখানে ইউসুফকে নিয়ে উঠল জুলেখা।

ইউসুফ বুঝতে পারলেন, তাঁর জন্য এসব ফাঁদ পাতা হয়েছে। এক একটা মহাল জুলেখার সঙ্গে ইউসুফের বাহুবন্ধনের উত্তেজক দৃশ্য দিয়ে ভরা।

জুলেখা বলল, 'এসো, আমাকে তুমি এবার বুকে তুলে নাও।'

'দুটি বিষয় আমাকে বাধা দিচ্ছে তোমার এ প্রস্তাবে রাজি হতে। এক, আজিজ মিশির তোমার স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, দুই, খোদাকে অমান্য করা হবে।'

'আজিজের ব্যাপারটা আমি দেখছি। তার মুখে আমি বিষের পাত্র তুলে দে
আর তার সমস্ত ধনসম্পত্তি তোমার হবে। আর আল্লা তো পরম দয়ালু ও ক্ষমাশী
পরে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিও।'

'জুলেখা, না, তা হয় না।'

'কেন হয় না।'

'হয় না, তুমি জান না পরম মঙ্গলময় খোদাতালার পথ থেকে আমি কখন সরতে পারি না।'

এই কাহিনীর নানা পাঠান্তর। কেউ বলেন, জুলেখার কুপ্রস্তাবে ইউসুফ নিমরা হয়েছিলেন। এক শ্রেণীর আলেমরা কিন্তু ইউসুফের সম্মত হওয়ার কাহিনী বিরোধী। তাঁরা বলেন, আল্লা নবি কখনও কুপ্রস্তাবে রাজি হতে পারেন না। অ আলেমরা বলেন, তখন ইউসুফ নবিত্ব লাভ করেননি, নবযৌবনের ল কামনাবাসনার মানবমাত্র তিনি। যদিও কোনো মতের কাহিনীতেও শেষ পর্য ইউসুফ যৌনমিলনে লিপ্ত হননি। যখন জুলেখা ছিটগ্রস্ত হয়ে উঠেছে, প্রাণত্যা করতে উদ্যোগ নিচ্ছে। সাত মহলা থেকে বেরনোর দ্বার বাইরে থেকে তালা আঁট তিনি তখন রাজি হলেন, কিন্তু পায়জামার দড়িতে সাতটা গেরো এঁটে নিলে একটা গেরো খুললে আর একটা গেরো বেরিয়ে পড়ে। ইত্যবসরে আল্লার গায়ে সেই প্রত্যাদেশ, 'ইউসুফ তুমি এই নারীর সঙ্গে সহবাস করো না। তোমার পা হবে, নবির তালিকা থেকে তোমার নাম মুছে ফেলা হবে।'

তখন তিনি আল্লার ভয়ে ভীত হয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। জুলে মরীয়াভাবে নগ্নশরীরে ছুটে গেল ইউসুফের পেছনে, আর তাঁর পোশাকের পেছ দিকের কাপড় ধরে ফেলল, কাপড় ছিঁড়ে গেল। ইউসুফের মাথার টুপি খসে পেছ পড়ে গেল। আল্লার কুদরতে বন্ধ দরজা খুলে গেল। কিন্তু ইউসুফ আজিজ মিশিরে সামনে গিয়ে পড়লেন। জুলেখা তখন ছল করে নিজেকে বাঁচাবার ও প্রতিহিং নেওয়ার জন্য স্বামীকে বলল, 'তুমি আমাকে আচ্ছা গোলাম উপহার দিয়েছ, দেখতে বাইরে থেকে সুন্দর, কিন্তু পেটে পেটে তার এত শয়তানি কে জান আমার ওপর বলাৎকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাকে বাগে আনতে পারে দেখ আমার দশা কী করেছে! দেখ আমি বাধা দিয়েছি, পোশাক ওর ছেঁড়া

আজিজ মিশির তখন ইউসুফের ওপর রুষ্ট হল, অকৃতজ্ঞ বলে দোষারো করতে লাগল। দুধকলা দিয়ে সে কালসাপ পুষেছে!

ইউসুফ বললেন, 'আমি নির্দোষ, জুলেখাই আমাকে পাপের পথে নিয়ে যাওয়া জন্য প্ররোচিত করেছে, আমি সৎ ও পবিত্র থেকে গেছি, তার প্রস্তাবে রাজি হই বলেই প্রতিহিংসাবশত আমার চরিত্রে কালি ছেটাচ্ছে।'

আজিজ বলল, 'আমি যে তোমার কথা সত্যি মেনে নেব, তার কি তুমি কো উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারবে?'

কাছেই এক দোলনায় ছ মাসের এক শিশু শুয়ে দোল খাচ্ছিল, তার দি আঙুল নির্দেশ করে ইউসুফ বললেন, 'এই শিশুই সাক্ষ্য দেবে।'

'মিথ্যেবাদী তুমি, ছ মাসের শিশু কখনও কথা বলতে পারে যে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে? তার মানে তুমিই যে অপরাধী বুঝে নিতে পারছি।'

আল্লার কুদরতে দোলনার সেই ছ মাসের শিশু কথা বলে উঠল, 'ইউসুফ সত্যি কথাই বলেছে, সে নির্দোষ।'

আজিজ বিস্ময়াভিভূত, শিশুটিকে আবার শুধলো, 'তুমি কী জান বল?'

শিশুটি বলল, 'পুরুষটির পোশাক সামনের দিকে না পেছনের দিকে ছেঁড়া তাতেই তার অপরাধ না-অপরাধ প্রমাণ হয়। সামনের দিকের পোশাক ছিঁড়লে জানবে পুরুষটি দোষী, পেছনের দিকে হলে নারীটি অপরাধী।'

আজিজ প্রমাণ পেয়ে গেল, ইউসুফের জামার পেছনের দিকে ছেঁড়া, অতএব জুলেখা অপরাধী, মিথ্যুক ও পাপীয়সী। তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল আজিজ মিশির। ইউসুফ অনুরোধ জানালেন, মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তাকে যেন ক্ষমা করা হয়। ইউসুফের অনুরোধ মেনে নেয় আজিজ। আর জুলেখার এই অপরাধের কথা গোপন করা হবে, মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু মাস তিন পর ফাঁস হয়ে যায় কথাটা। জুলেখার পাঁচ সখীদের কানে পৌঁছে যায় কথাটা। তাদের মধ্যে একজন মিশরের রানির মদ্য পরিবেশনকারিণী, দ্বিতীয়জন রানির পাচিকা, তৃতীয়জন রানির খাদ্যবাহিকা, চতুর্থজন রানির সংবাদ-বাহিকা, পঞ্চমজন রানির প্রসাধনকারিণী। পাঁচ সখীরা জুলেখার এই অপকর্মের সংবাদ শুনে ছুটে এসে জুলেখাকে তিরস্কার করতে লাগল।

জুলেখা কী করে বোঝাবে তার সেই অনুভবের কথা? এই অপরূপ সুন্দর মানুষটি যে কতখানি আকর্ষক, সেই অনুভূতির কথা কীভাবে তার সখীদের বোঝাবে? সে তো কবিতা লিখতে পারে না! তো সে একদিন তার সখীদের একত্র ডেকে একটা মজলিশে বসাল। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি আর লেবু দেওয়া হল কেটে ফালি করবার জন্য। আর তাদের সামনে সাজিয়ে গুজিয়ে ইউসুফকে বসিয়ে দিল।

সেই পাঁচজন নারী ইউসুফের রূপে মুগ্ধ, চোখ ফেরাতে পারছে না। চোখের পলক পড়ছে না। হাতের ছুরি দিয়ে লেবু কাটতে গিয়ে তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের আঙুল কেটে ফেলেছে। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরে পড়ছে, কিন্তু কোনো হুঁশ নেই তাদের। তখন সখীদের জুলেখা বলল, 'তোমরা নিজেরা নিজেদের আঙুল কেটে ফেললে যে!'

সখীরা স্বীকার করলে, এমন রূপে আত্মহারা মুগ্ধ যে কেউই হতে পারে, তারা জুলেখাকে নিন্দা করে অন্যায় করেছে। এমন অপরূপ সুন্দর মানুষ আগে কখনও দেখেনি তারা

সেই রূপের অতীতকাহিনী, সেই রূপের কথা। সেই মহামানবের অপাপকাহিনী।

শাহনাজের রূপে মুগ্ধতায় তাকে পাওয়া নিয়ে কোনো বাধা নেই। তার প্রেম আর রূপে মুগ্ধতা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, সে যেহেতু শাহনাজকে বিয়ে করেছে। আজই তার ঘরে শাহনাজ আসছে। সেই জন্যই এ রূপের অতীতকাহিনী তার

মনের মধ্যে ছেয়ে এল। শফীউল্লা যে ঘটনায় এখনও যায়নি, সেই ঘটনায়ও ঘনিয়ে এল এই কাহিনী। আদতে লাইব্রেরি ঘরে শাবানার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে শফীউল্লা। এখন সে শাবানার রূপে মুগ্ধ। সাবেক প্রেমবিধুরতাকে সে এভাবে অধুনায় এনে চাখে, তারই ভবিষ্যৎকে বর্তমান করে তোলে। সে এই বিকেলে লাইব্রেরি ঘরে থেকে চলে যায় আগত সন্ধ্যায় কারবালার গোরস্থানে। সেখানে অনেক অনেক অতীতের এক রূপমুগ্ধকাহিনীর কাছে চলে যাওয়া জোটে তার।

সে তো সেই, যে শাবানাকে দেখার পর শাহনাজের রূপে মুগ্ধতার সাতগুণ মুগ্ধতা শাবানাতে পেয়ে, তারই সামনে দাঁড়িয়ে অনতিবিগত শাহনাজের রূপমুগ্ধতার উপলব্ধিকে নিয়ে মেতে ওঠে, অনতিআগত ঘটনায় যায়। হয়তো বা আজ রাতের সেই শাহনাজ সকাশ ঘটনায় চলে যাবে সে। তাতে তো এ কথা প্রমাণ হচ্ছে না সে শাবানাতে বিপুল মুগ্ধ নয়? শাবানার তুলনায় শাহনাজ তুচ্ছ! কোথায় হীরের আংটি কোথায় তামা! তবুও সে শাহনাজে মুগ্ধতার বিগত বোধের থেকে বের করে আগত বোধের মিথ্যে ঘটনায় নিয়ে যায়, যেখানে তার শাহনাজে মুগ্ধতা নিয়ে থাকা, শাহনাজকে পাওয়া নিয়ে তার বিপুল আততি, জর জর হয়ে আছে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার অস্থিরতায়।

এই ভাব-শৃঙ্খলা নষ্ট হবে বলে, ইয়ারবক্সি, আড্ডা-মজলিশ, আসর-বাসর কোথাও না গিয়ে কারবালার গোরস্থানে যায়। অতীত কিস্‌সার আবেশে স্নাত হয়। সে সেই শফীউল্লা যে এখন লাইব্রেরি ঘরে শাবানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এখন সন্ধ্যা না হলেও সন্ধ্যায় তার গোরস্থানে থাকা, একভাবে থাকা।

এখানেই শাহনাজের চিন্তায় বুঁদ হয়ে কাটিয়ে দেবে রাত দশটা পর্যন্ত। তার চিন্তায় কাটানো তার কাছে আর কোনো অন্যায় নয়, অবৈধ নয়, কারণ শাহনাজ তার বিবাহিত। বরং বিবাহিতার সঙ্গে সম্ভোগ ও সম্ভোগচিন্তায় থাকা পুণ্যের। এই যে গোরস্থানে আছে, অথচ নেই, সেই কল্পবাস্তবে থাকা তার একভাবে থাকা, হয়তো বা থাকার মরণ। কেন না সে এখন শাবানার মুগ্ধতায় জর জর।

এই যে সে মিথ্যে বাস্তবতার রাতে গোরস্থানে আছে, সে ঘটনায় যাওয়া যাক, কী মিথ্যে ঘটনা ঘটে জানা যাক।

৫

গোরস্থানের কাছে ভিতে কেউ নেই। রাত আটটা সাড়ে আটটা বাজে। অনেকক্ষণ ধরেই নিমগ্ন ছিল। এর মধ্যে কোনো মৃতকে নিয়ে আসেনি তার বাড়ির প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনরা। যাকে আনতে পারত সে এখনও মরেনি। যে মরেছে, তাকে নিয়ে এখনও এসে পৌঁছতে পারেনি। যদিও এসব মিথ্যে ঘটনার কল্পবাস্তব গর্ভ। তবুও তার বাস্তবতা মেনেই, গোরস্থানের আকাশে চাঁদ উঠে যায়। গোরস্থানের গাছে গাছে শাখা প্রশাখায় বাতাসের গুমর। এই একটু আগে গোর দিতে নিয়ে আসা শবের গায়ে ছড়িয়ে রাখা সুরভির গন্ধ এখনও বাতাস নিয়ে খেলা করে। এখনও

ীউল্লার নাকে এসে বিঁধতে থাকে। যে চাতালে বসে আছে, সেখানে ন্তঃপুরিকারা এসে বসেছিল, তাদের পোশাকের স্পর্শজনিত গন্ধ এখনও জুড়ে ছে, যদিও তারা ফিরে গেছে কয়েক ঘণ্টা আগে। এখন হয়তো তাদের মধ্যে উ কেউ তাদের পুরুষদের সম্ভোগ-চাহনির আভায় আধারিত হয়, আরও তাড়িত র যায়।

এখানেই তো শফীউল্লা তিনদিন আগে শাহনাজকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, বিবাহের কাঙ্ক্ষা কুঁদে উঠেছিল তার শরীরে মনে এত বছর পর। এখানেই তো দুদিন গে তাকে নিকা করেছিল। তার ইজাব কবুল নিয়েছিল গোরকোনরা, যারা দাল শাবল গাঁইতি নিয়ে একটার পর একটা কবর খুঁড়ে যায় প্রতিদিন। কবর াড়াই যাদের কাজ।

শফীউল্লা বসেছিল স্থাণুবৎ অথচ মনে উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে। সেই বিমোহিত ব ও নৈঃশব্দ্যের ভিতর চাতালে কীসের যেন এক অলৌকিক অনুভূতি এসে কে ছেয়ে ধরল। তার পাশে কীসের যেন একটা ছায়া। কীসের যেন একটা াখুশানি। কীসের যেন একটা অব্যক্তবিরক্ত নাতিতিরিক্ত কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর। থমে ভয় পায় শফী। পরে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে স্থিত আত্মস্থ করে র বাঁ পাশে হাত বাড়ায়, শব্দ ধরে হাতড়ায়, খোঁজাখুঁজি করে। স্পর্শ পায়, চ ছোট শরীরের, নরম কাঁচা। এক শিশু, মৃদুস্বরে কাঁদছে, আধ ঘুমে আছে, পাশ ও-পাশ করছে। শিশুটি যে শিশু, আলোর আভায় নজর করা গেল।

শিশুটির ভাব কান্নার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে যেন তার মায়ের কোলের কাছে য়ে আছে, ঘুমিয়েছিল, এখন আধঘুমে অনুযোগে অনুচ্চস্বরে কাঁদছে, যাতে মা কে কোলের কাছে টেনে নিয়ে স্তন দেয়। শিশুটি যে তার মায়ের কোলের পাশে ই এই বোধ পাচ্ছে না বলে সে অমন মৃদু অভিমানভাব নিয়ে কাঁদে, আর্তচিৎকারে দে না। তাতে কি হয়, গোরস্থানের ভিতর সেই নৈঃশব্দ্যের শৃঙ্খলা থাকে, আগে মন ছিল। শিশুটিকে আবছা অন্ধকারে মুখ নামিয়ে আশ্চর্য কিছু দেখার মতো খে শফী।

শিশুটি দু-একবার পা ছুঁড়ল। কিন্তু পা ছুঁড়ে আরাম নেই বুঝতে পেরে দু-র পা ছোঁড়ার পর থামিয়ে দেয়। কেন না বিছানায় পা ছোঁড়ার সঙ্গে এই চাতালে ছোঁড়ার কোনোই মিল নেই, আয়াস দেয় না তাকে। তারপর এপাশ ওপাশ রতে থাকল। এই বুঝি মা তাকে কাছে টানে। শিশুর এই মিথ্যেবোধ দেখে যায় ফী মুখ নীচু করে ঝুঁকে, আশ্চর্য চাহনিতে।

তারপর শিশুটি এপাশ ওপাশ করার গতি বাড়িয়ে দিল। একটু একটু করে রাগ দেখাচ্ছে। বছর আড়াইয়ের বাচ্চা। শিশুপুত্র। একটু একটু করে কান্নার বাড়ছে। গোরস্থানের শান্ত বাতাসগুলো দুলতে লাগল, দুলতে লাগল পালাগুলোর শান্তভাব, ভাঙচুর হচ্ছে গোরস্থানের নৈঃশব্দ্যে। চিৎকার করে দ উঠল শিশুটি। যেন কোনো অলৌকিক সে কান্না। এই রাতে গোরস্থান লাগোয়া

বসবাস শুনতে পায় সেই শিশুর কান্না, তারা মনে করে এ কান্না রহস্য অলৌকিক। গোরস্থানে জীবন্ত শিশু কাঁদতে পারে এই রাতে তাদের বাস্তববকি হয় না। অথচ এ কান্না বাস্তব। শুধু শফীর মনে হয় এ এক অলৌকিক শি

শিশুটিকে কোলে তুলে নেয় শফী। আর অমনি শিশুটির কান্না থেমে য আর এক অদ্ভুত আচরণ করে শিশুটি, শফীর মুখের দিকে চেনা চাহনিতে (ডান করতল দিয়ে গণ্ডে হাত বুলিয়ে দেয়।

শফী শিশুটির সঙ্গে হাসি বিনিময় করে। তার ভাল লাগে শিশুটিকে। ত ঝাঁকুনি দিয়ে আদর করে। দু একবার পাক মারে। শিশুটি হাসতে থাকে ব মজা পায়। চোখে তার এখন আর ঘুম নেই, দিন শুরু হয়েছে নতুন করে। শিশুটি চাতালে বসিয়ে দেয় শফী। শিশুটির কাছে শফী অচেনা কেউ নয়, তার : এক নির্ভরতার অভিব্যক্তি সে মুখে ফুটিয়ে তোলে।

কী করবে বুঝে উঠতে পারে না শফী। শিশুটিকে চাতাল থেকে নামিয়ে দি দাঁড় করিয়ে দেয়। শিশুটি দাঁড়িয়ে পড়ার পর চাতালের অন্ধকারের থেকে হাঁ হাঁটতে গেটের আলো ছড়িয়ে থাকা চত্বরে হেঁটে যেতে থাকে। খুব উৎসাহ হাঁটা হাঁটা খেলায়। পেছু পেছু হেঁটে যায় শফী। শিশুটি খিল খিল হাসে। খে মেতে উঠেছে, মুখ থেকে নানা রকম শব্দ বেরচ্ছে তার। এরকম করে সে শি সঙ্গে হাঁটে, একই জায়গায় ঘোরে। শিশুটি হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যায়, নিজেই দাঁড়ায়। এক সময় শফী নিজেই হাঁপিয়ে উঠল।

শিশুটিকে ধরে উঁচু চাতালের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার খেলাকে খানি জোর করেই থামায় শফী। শিশুটি বোঝে, তার মুখ থেকে আনন্দ সরিয়ে ফে স্থির চাহনিতে তাকিয়ে থাকে।

'তোর বাড়ি কোথায়?'

শিশুটি কিছু বলে না, ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে।

'কে আছে তোর?'

'মা!'

'মা তোকে এনেছিল?'

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে হ্যাঁ জানায় শিশু।

'তোর মা তোকে নিয়ে গেল না কেন?'

শিশুটি তেমনই শান্ত চোখে তাকিয়ে থাকে। তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কোনোভাবেই ভয় পায় না।

'কে তোকে নিয়ে যাবে?'

শিশুটি মুখ তুলে শফীকে দেখায়।

'আমি নিয়ে যাব? আমি কি জানি, তোর বাড়ি কোথায়?'

শিশুটি বলে, 'মা।'

'আর কে? তোর আব্বা?'

'মা!'

'তুই এখানে এভাবে দাঁড়া, দেখি তোর খোঁজে বাইরে কেউ এসেছে কিনা।'

শিশুটি নির্বোধ নয়। সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল।

বাইরে বেরিয়ে এসে শফী চা দোকানে, পান, বিড়ি, খইনির দোকানে রকোনদের খুঁজে বেড়াল। জানা গেল তারা একটু আগে পর্যন্ত ছিল, বড় রাস্তায় টা বাস একজন লোককে চাপা দিয়েছে, ঝামেলা পাকাতে চলে গেছে সেখানে। । একটা পান খায়, পানের বোঁটায় চুন নিয়ে জিভ বুলিয়ে চুন খায়। গোরস্থানের রে কোনো কোনো মুখ খুঁজল, যারা কোনো শিশুর খোঁজে এসেছে। যারা যারা রে আছে, তাদের মুখে নেই কোনো উদ্বেগ, খোঁজাখুঁজি। তেমন কোনো শিশুর ক দেখা গেল না। যেচে কারুকে জিগ্যেস করার সাহস হল না। যাতে কোনো লোক শিশুটির দাবিদার সেজে নিয়ে নেয় শিশুটিকে। শিশুটি যাতে পাচার হয়ে যায় দেখে শফী।

কিন্তু রাত তো বাড়ছে। ফেরার সময় তো হয়ে যাচ্ছে শফীর। শাহনাজ এসেছে ন্ন, তার পক্ষে কি এখানে আর বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব হবে? সে কি শিশুটিকে ভাবে রেখে চলে যাবে? সে শিশুটিকে না দেখলে ওখানেই তো ছিল, তেমনই ল না হয়। সে দেখেনি, তাকে নিয়ে খেলেনি, তাকে কোলে তুলে নেয়নি। টিকে যে কোলে করে মা গোরস্থান থেকে নিয়ে আসেনি, মার যখন মনে বে, তখনই তো মা শিশুটির খোঁজ করবে। মনে পড়বার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা তে দিতেই হয়। তার আগে শিশুটির কোনো উদ্ধার হয় না। পানের স্বাদে ভরে ওঠে শফীর।

শিশুটিকে ছেড়ে যাচ্ছে না এই মনোভাবে, দুর্ঘটনা যেখানে হয়েছে, সেই বড় ার দিকে একটু এগিয়ে যায়। শিশুটিকে রেখে এসেছে সেখানে। কোলাহল তে পায়, জনরোষ। হয়তো বা বাস পোড়াবে একটু পরে। শাহনাজ এসেছে, পক্ষা করার সময় নেই, অথচ অপেক্ষায় সময় কাটায় শফী। বড় রাস্তার াকাছি পর্যন্ত যায়। কিন্তু কাছাকাছিই যায়, অকুস্থলে যায় না, যেতে তার ভয়। ার ফিরতে থাকে। গেটের সামনে ফিরে এসে দেখল তেমন কোনো উৎকণ্ঠিত. নেই যে কিনা শিশুটির খোঁজে এসেছে। বাইরেটা আরও শুনশান হয়ে উঠেছে। তরে ঢুকে চাতালে গিয়ে দেখল শিশুটি তেমনই দাঁড়িয়ে আছে, ভয়হীন, াবনাহীন। যেমনভাবে দাঁড়িয়ে রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। । শিশুটি শফীকে বিশ্বাস করেছে, তার দিক দিয়ে শিশুটির কোনো ক্ষতির াবনা নেই, এ রকমটা বিশ্বাস রেখেছে শিশুটি। শফী অবাক হয়, শিশুটির সঙ্গে । তার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। শিশুটিকে একা ফেলে তার পক্ষে যাওয়া ব হবে না। শিশুটির দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে কোনোভাবে সম্ভব । শিশুটির চোখে চোখ রেখে হাসে। শিশুটিও হাসে।

৬

লাইব্রেরি ঘরে শাবানার সামনে শফী যে সব মিথ্যা ভবিষ্যৎ ঘটনায় যাচ্ছে, তো শাহনাজের প্রতি অনতিবিগত মুগ্ধতায়, প্রেমে। সেই প্রেমের বিগত মুগ্ধ মরা ও অ-অনিবার্য ঘটনাকে বাস্তবতা দিতে সে পৌঁছে গিয়েছিল কারবাল গোরস্থানে। সেখানে পেয়ে গেল এক আশ্চর্য শিশুকে। যে শিশুকে সে এড়া পারে না, তার প্রতি তার কোনো দায়িত্ব নেই বলতে পারে না। বিগত প্রেম মুগ্ধত কল্প ভবিষ্যৎ বাস্তবতায় সে মাত্র গেছে, তার মুগ্ধতা প্রেমের আসল সত্য এখন শাবানা, তবুও কি সে পারছে শিশুটির দায়িত্ব থেকে সরে যেতে? মিথ্যে ঘটনায় সে তো শাহনাজকে ভালবাসে, শাহনাজকে পাওয়ার জন্য ছট করে।

শিশুটিকে কাঁধে বসিয়ে মেটিয়াবুরুজের পথে পথে রাতেরবেলা ঘুরতে লা শফী। এ ঘটনা কল্পনা, দায়িত্ব যতদূর পর্যন্ত নেওয়া যায় যাক, রাত বাড় শাহনাজকে পাওয়ার সময় বিলম্বিত হচ্ছে, বিরহে কাতর হয়ে পড়ছে, এ ঘ কল্প হলেও, যত বেশি বিরহে কাতর হওয়া যায় যাক না, যতদূর অনতিবিগ মজে থাকা মুগ্ধতায় থাকা যায় যাক না, সেই মিথ্যেকে প্রাণ মনে করলে ক্ষ কী?

নিশুতি রাতে শিশু কাঁধে চলতে চলতে পথচারীদের দেখার ভিতর শিশুটি চেনে এমন কেউ বেরিয়ে পড়ে যদি তাই তার এই শিশু প্রদর্শনী। যে পথ দি ফেরার কথা সে পথ দিয়ে না ফিরে অন্য পথ ঘুরে চলতে থাকে সে। শিশুটি নিয়ে চলমান এই প্রদর্শনী, পথে পথে ফেরা, শিশুটির ঘর শিশুটিকে চিনে যাতে, যাতে তার ঘর চিনিয়ে দেওয়া যায়। একবার ভাবে শিশুটিকে এভাবে নি যেতে যেতে ফিরিওয়ালাদের মতো হেঁকে হেঁকে যাবে কিনা। 'কার খোকা, ক খোকা?' এই ভঙ্গিই তাকে ফিরিওয়ালার ডাক ডাকতে মনে পড়ায়, উছলিয়ে কিন্তু ডেকে উঠতে পারে না। চুল খামচে বসে থাকে কাঁধের ওপর শিশুটি। ভার, তার দায়িত্ব বহন করে শফী। কোথাও কোনোখানে ফেলে রেখে যেতে পার না। অথচ তা কত সহজ, শিশুটি তার প্রতি এতই বিশ্বাসী যে তাকে যদি বসি রেখে বলা হয় একটু আসছি, সে বিশ্বাসভরে অপেক্ষায় থাকবে।

রাত দশটা বেজে গেছে, মেটিয়াবুরুজের রাস্তায় রাস্তায় অদ্ভুত টহল দেয় শি কাঁধে নিয়ে। পাশ দিয়ে লোক গলা তুলে দেখে শফীকে, কিছু বলে না। শফ সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবার সাহস মেটিয়াবুরুজের ক-জনের আছে? তারা অ কিছু দেখলেও প্রশ্ন করে না। চুপ করে দেখে যায়। এ দৃশ্য যারা দেখছে, তা মধ্যে দু-চারজন রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা করে, কথা বলে, ভেদ করতে প না রহস্য।

এই জটলার মানুষদের মনোভাব বুঝতে পারে শফী, সেও তাদের সঙ্গে ত বাড়িয়ে কথা বলে উঠছে না, শিশুটির বিষয়ে সংবাদ তাদেরকে দিচ্ছে না,

শিশুটিকে নিয়ে কী করা যায় সে বিষয়ে কোনো আলাপ আলোচনা তাদের সঙ্গে করছে না, এ রকম তার স্বভাব নয়। শিশু কাঁধে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুধু সে ফিরিওয়ালাদের মতো হেঁকে উঠবে কিনা 'এ শিশু কার? এ শিশু কার?'

বেশ কিছু রাস্তা শিশু কাঁধে হেঁটে যাওয়ার পর কাজটাতে তার ইচ্ছে প্রণোদিত হয়। মজা পায়। চলতে চলতে তার চলা হয়। বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধ ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধ বদলায়। চেনাজানা দু-একজন লোকদের দেখে শফী, চেনারাও শফীর সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারে না, তার দিকে এগিয়ে গিয়ে আগ বাড়িয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না, শিশুটির বিষয়ে। তারা ভাবে, হয়তো শিশুটির ব্যাপারে শফীর কোনো অপকর্ম আছে, প্রশ্ন করে শফীকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। আর অমন মানী লোক, অমন একজন বড়লোককে প্রশ্ন করে অস্বস্তিতে ফেলা ঠিক হবে না মনে করে তারা কথা বলে না, সালাম বিনিময় করে না। শফী হেঁটে যায়, এগিয়ে যায়।

আর দেখে সকলে আশ্চর্য হল, শিশুটি বিস্ময়কর, সে ঘুমিয়ে পড়ছে না, ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। আর শিশুটির যে অচেনা নয় শফীউল্লা সে ব্যাপারটাও বুঝে যাচ্ছে শিশুর অভিব্যক্তিতে। এক ঐশ্বরিক হাসি নাকি লেগে আছে শিশুটির মুখে। যেন মেটিয়াবুরুজের মানুষজন অলৌকিক কিছু দেখছে। যেন এ দৃশ্যের মধ্যে বাস্তব ঘটনা নেই কোনো কিছু।

রাত বাড়ে, চাঁদ ওঠে, চাঁদের আলোয় হেঁটে যায় শফীউল্লা শিশুটিকে নিয়ে। রাত বাড়া মানে আর এক রকম ফেরায় যেতে পারে শফী। ভাবিদের অন্দরমহলে ঢুকতে হবে না। কেন না এত রাতে খাওয়া দাওয়ার পাট নেই, ভাবি ভাত আগলে বসে থাকলেও সে আর ওখানে যাবে না। সে জানে শাহনাজকে এতক্ষণে বাড়ির অফিসঘরের দিকের অংশের সিঁড়ি দিয়ে কেউ তিনতলার দখিন দিকের ঘরে উঠিয়ে দিয়ে গেছে। সে ঘরের চাবি একটা তো শফীর সঙ্গেই থাকে, আরেকটা থাকে ভাবির কাছে।

যাক বাঁচোয়া! শিশুটিকে নিয়ে অন্দরমহলে তোলা মানে অনেকের কাছে অনেক প্রশ্ন কৌতূহলের উত্তর দিতে দিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠত, যাক রাত হয়েছে বলে ওখানে না ফেরার বাস্তবতা পাচ্ছে। আর শাহনাজের আগমনজনিত কারণে বাড়ির মধ্যে যে অস্বস্তি তার মধ্যে গিয়ে পড়ছে না, একে একে তিনতলার তার নিজস্ব ঘরে চুপি চুপি উঠে যাওয়া হবে। আর পৌছনোমাত্র শাহনাজকে পাওয়া হবে।

সে যখন তার পাড়ায় ফিরল, তখন রাত বারোটা। কর্মচারীরা মেশিন চালিয়ে তেমনই তখনও কাজ করে চলেছে। কিন্তু বাইরে কেউ নেই, তাকে দেখতে পায়। নীচের থেকেই দেখা যায় তেতলার ঘরে রাত আলো জ্বলছে, তার মানে ঘরে পৌছে গেছে তার নতুন বিবাহিত বিবি শাহনাজ। শিশুটিকে কাঁধে নিয়ে তেমনই ভঙ্গিতে উঠতে লাগল শফী একটা একটা করে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে।

বাইরে থেকে দরজায় মৃদু ঠেলা মারতেই দরজাটা খুলে গেল। ঘরের ভেতর রাত আলো ও চাঁদের আলোয় মেলামেশা এক অদ্ভুত আলোকিত রূপ, শফী দেখে বিছানায় সেই আকাঙ্ক্ষার নারী শুয়ে আছে পাশ ফিরে। পরনে এক লালরঙা বেনারসী। বাঁ পাটা পালঙ্কের প্রান্ত ছাপিয়ে রয়েছে। কি কমনীয় ধপধপে লোভনীয় সেই পা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একটু মুখের অংশ দেখা যায়। আহ্ কী রূপ! শিশুটিকে নামিয়ে দিয়ে বিস্ময়াভিভূত চোখে দেখতে থাকে শাহনাজের রূপ। ঘুমিয়ে আছে না ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে আছে বোঝা যায় না। ঘরের ভিতর ঢুকে কোনো শব্দ করেনি সে। হয়তো শাহনাজ বুঝতে পারেনি সে এসেছে। শিশুটিও সেই পালঙ্কে শুয়ে থাকা নারীর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। শফী হাত বাড়িয়ে ঘরের টিউবলাইট জ্বালায়, দুধের মতো শাদা আলোয় ঘর ভেসে যায়, চোখ ঝলসে ওঠে শাহনাজের রূপে।

শিশুটি ডেকে ওঠে, 'মা!'

শাহনাজ তড়িৎচমকে মুখ তুলে দেখে, শিশুটিকে দেখতে থাকে বিস্ময়াভিভূত চোখে। সে স্বপ্নে না জাগরণে বুঝতে পারে না। সে যে শফীউল্লার ঘরে এসেছে, এই সজ্ঞানতা আছে, কিন্তু এই ঘরে 'মা' ডাক ডেকে উঠতে শোনা আর এই শিশুটিকে দেখার মধ্যে মনে হয় কোনো মায়ালোকে পৌঁছে গেছে সে। কিন্তু এই তো সেই ঘর, এক দেড় ঘণ্টা আগে শফীর ভাবি আর শওকতউল্লার দুই পুত্রবধূ তাকে তুলে দিয়ে গেল। সে যে মায়ালোকে নেই এই সত্যজ্ঞান তাকে কম বিভ্রান্তিতে ফেলছে না। কে এই শিশু, যাকে তার সদ্যবিবাহিত স্বামী বাসরঘরে নিয়ে উঠেছে? আর এই শিশু তাকে 'মা' বলে ডেকে উঠেছে? খানিকটা উঠে বসে আলুলায়িত বেশে শিশুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শাহনাজ। যেন সে অদ্ভুত কিছু দেখছে।

শফী দেখছে শাহনাজকে, শাহনাজের রূপ। ঘোমটা খসে যাওয়ায় নরম গ্রীবা উছলে এসেছে চোখে। গলার হারটা চিক চিক করছে আলোয়। শিশুটিকে দেখার ভিতর এক হিংসাচাহনি ফুটে উঠেছে তার চোখে, তার ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে এক ক্রোধজনিত ব্যবহার।

শিশুটি আবার ডাকল, 'মা!'

'কে তুই রে?' শুধিয়ে উঠল শাহনাজ। নববধূর ভঙ্গি তার হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে নববধূর লজ্জাকমনীয়তা, হারিয়ে গেছে লজ্জারমণীয়তার ছাঁদ।

শিশুটি এগিয়ে যেতে থাকে শাহনাজের দিকে।

শাহনাজ ভয়ে কাঁপে, তার শরীরে এক আশ্চর্য কাঁপুনি। 'কে তুই?'

শিশুটি এগিয়ে গিয়ে, বিছানার প্রান্ত আঁকড়ে ধরা শাহনাজের বাঁ হাতের ওপর হাত ছোঁয়।

শাহনাজ শিউরে ওঠে সেই স্পর্শে।

শফী মৃদু হাসে। একটু শব্দও হয়। সেই হাসির প্রতিক্রিয়ায় শাহনাজ প্রতারিত ভঙ্গি আনে মুখে। বাঁ হাতটা তুলে নিয়ে শিশুর স্পর্শ প্রত্যাখ্যান করে শাহনাজ।

বসে থাকা শাহনাজের দুই হাঁটুর ফাঁকে শিশুটি নিজের মুখটা গুঁজে দেয়। শাহনাজ কিছুই করতে পারে না, স্থির তাকিয়ে থাকে, স্থির হয়ে বসে থাকে। কেন জানি শিশুটির স্পর্শ সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু শিশুটির মাথাটা তার দুই হাঁটুর ফাঁক থেকে তুলে সরিয়ে দিলে, শিশুটি হুলস্থুল কাণ্ড ঘটাবে। সে সব অস্বস্তিকর ঘটনা এড়াতে চায় বলে সয় এ স্পর্শ। আর এই ঘটনায় এসেছে বলে শফীর সঙ্গে এক ধরনের সহজ সম্পর্কের দৃষ্টিবিনিময়তা পায়। পরমুহূর্তে শাহনাজ দৃষ্টি নামিয়ে নিল, সে শফীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়েনি, সেই ভাবকে ধরে রাখতে সেই লজ্জাশীলতা আনে। আর শিশুটিকে না খেপিয়ে অন্য পন্থা অবলম্বন করে। শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়। এ শিশু নিশ্চয় শফীর কোনো গোপন পাপের ফসল, এ কথা মনে করে শফীর বিবাহিত প্রস্তাবে অসম্মত শাহনাজ, বিবাহিত হয়ে দাম্পত্যে অসম্মতবিরক্ত আকাঙ্ক্ষাহীন ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে, স্বামী কলঙ্কের জ্বালায় জ্বলতে থাকে।

শিশুটিকে শুইয়ে দেয় শাহনাজ। শিশুটি কিন্তু ঘুমোয়নি। আর শাহনাজ মাথায় ঘোমটা টেনে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বিছানায় বসে থাকে। শফীর দিক থেকে উলটোমুখো হয়ে।

শিশুটি ঘুমিয়েছে কিনা বোঝা যায় না, তবে চুপ করে আছে মনে হয় শফীর। শাহনাজের পাশে চুপ করে পড়ে আছে।

ঘরের মাঝখানে শিলিংফ্যানের সোজাসুজি এসে দাঁড়ায় শফী। স্থির দাঁড়িয়ে থাকে, গা হাত পা নড়ে না তার। লাল বেনারসীতে মোড়া শাহনাজের শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। পা দুটিও শাড়িতে ঢাকা দিয়ে ফেলেছে, মুখ একেবারে ঢেকে ফেলেছে। যেন সে ঘুমিয়ে থাকার ভান করে রাগ করে পড়ে আছে।

কেমন করে শাহনাজের সঙ্গে ভাব জমাবে বুঝে উঠতে পারে না শফী। যেন ভাব জমাতে, ঘনিষ্ঠ হওয়ার পথে এই শিশুটাই একটা বাধা। হয়তো বা ঘনিষ্ঠ আলাপ জমাবার এক স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি পাওয়া যেত। তৃতীয় ব্যক্তি আছে, এই বাধা দূরত্ব গড়ে দিচ্ছে।

একটু সাহস সঞ্চয় করেই শাহনাজের গায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাঁ হাতটা বিদ্যুতায়িত নিশপিশ করে উঠছে শাহনাজের পিঠে হাত রাখার জন্য, কিন্তু কিছুতেই সাহস করতে পারছে না। কণ্ঠের কাছটা ধক ধক করে উঠছে, বুক ধড়ফড় করছে। মনের মধ্যে অনেক কথা এসে ভিড় করছে, কিন্তু শিশুটির উপস্থিতির জন্য সে-সব কথা বের হতে পারছে না। শফী বলল, 'কখন এলে?'

শাহনাজ কিছু বলে না। নাকে হাত দিয়ে নথটা নিয়ে ঘোরায় ফেরায়। অনেকদিন পরে নথ পরেছে, ব্যথা আর অস্বস্তি। কষ্ট খুব তার।

পাশ থেকে শাহনাজকে দেখছে শফী। দেখার ভিতর তার এক রমণীয় অনুভূতি হয়।

শাহনাজ কিছু না বলে টেবিলের দিকে আঙুল তুলে কী নির্দেশ করে।

টেবিলে চোখ যায় শফীর। প্লেটে প্লেটে সাজানো খাবার দাবার।

তখন শফী পোশাক খোলে। লুঙি পরে। তারপর বাথরুমে গিয়ে মুখে হাতে পায়ে জল দিয়ে আসে। তারপর পশ্চিমমুখো হয়ে নামাজ পড়তে বসে। তেমনই বিছানায় বসে থাকে শাহনাজ।

না এত তাড়াহুড়োর কিছু প্রয়োজন নেই, শাহনাজের সঙ্গে ভাব জমাতে সারা রাত পড়ে আছে। নামাজ পড়া শেষ করে মাদুর পেতে খাবার নিয়ে বসে। আর অমনি বিছানা থেকে শিশুটি নিজের থেকেই নেমে গিয়ে শফীর পাতে বসে পড়ে তারা দুজনে খায়। বরং শিশুটির সঙ্গে বেশি ভাবসাব হয়ে গেছে।

কিন্তু শাহনাজেরও যে খাওয়ার কথা, শফী জান না। শফী মনে করেছে শাহনাজ খেয়ে নিয়েছে। সদ্য বিবাহিত স্বামী বাড়ি ফেরেনি, খায়নি, কী করে শাহনাজ খেতে পারে? জা, ভাশুরঝি, ভাশুরের বউরা খাওয়ার জন্য জেদাজেদি করেছিল, পরে খাবে জানিয়েছে তাদের। এতক্ষণ শফীর জন্যই না খেয়ে থাকল, এখন শফী তাকে না ডেকে খেতে শুরু করে দিয়েছে? শিশুটি পাতে পড়ে যত খাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি ছড়াচ্ছে। বিরিয়ানি, কোপ্তা, কালিয়া। বিছানায় থেকে খাবারের সুঘ্রাণ পায় খিদেয় ছটফট করছে কিন্তু সে নিরুপায়। অভিমান হয় মানুষটার প্রতি। এই মানুষটাকে নিয়ে সারা জীবন কাটাবে নাকি?

৭

অতএব শিশুটি একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল শাহনাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ গড়বার ক্ষেত্রে। আলাপ যদি নাও চায়, নারীটির কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিলে শফীর কোনো অন্যায় হয় না, পাপ হয় না। আর আলাপ-ব্যতিরেকেই এই নারীটিকে সপাটে চুম্বন করতে পারবে, জড়িয়ে ধরতে পারবে, তাতে তার কোনো দোষ হবে না জড়িয়ে ধরে কাছে নিয়ে শুয়ে পড়তে পারবে। আর কাছে শুয়ে সে যেমন করে নারীটিকে পেতে চাইবে তেমন তেমন করে পাবে সে। তবুও শফী চেয়েছিল আলাপ। কিন্তু এই ঘটনায় যেতে পারছে না শিশুটির জন্য। শিশুটি শাহনাজের গায়ের পাশে বসে তাকিয়ে আছে শফীর দিকে।

শফী শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়। তারপর ঘুম পাড়ানোর ভঙ্গিতে পিঠে ফেলে দরজা থেকে বেরিয়ে চলে যায় জ্যোৎস্নার ঝুল বারান্দায়। গা দুলিয়ে দুলিয়ে, তাকে ঘুম পাড়ায়। ঘাড়ের ওপর অদ্ভুত বাধ্যতায় ও আরামে পড়ে থাকে শিশুটি। পারে না শফী শিশুটির দায়িত্ব থেকে সরে যেতে। এ ঘটনা মিথ্যা হলেও পারে না মিথ্যা এই শাহনাজের সঙ্গে ভাবসাব করার আকুতি, মিথ্যা এই শিশু, শিশুর বিঘ্নসৃষ্টি, মিথ্যা এই শিশুর গায়ে ঝুল বারান্দার জ্যোৎস্না, মিথ্যা এই শিশুকে কাঁধে ফেলে ঘুম পাড়ানো। তবুও শিশুর প্রতি এক মানবিক বোধ শফীকে পবিত্র করে রাখে।

অনেকক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করবার পর শফীর মনে হয় শিশুটি ঘুমিয়েছে

তখন শফী ধীরে ধীরে পাছাকোলা করে বারান্দার জ্যোৎস্নায় নামিয়ে দেয় শিশুটিকে। অপূর্ব দেখাচ্ছে শিশুটিকে চাঁদের আলোয়। শিশুটির মুখে চোখে শরীরে পড়েছে সেই ঈশ্বরপ্রদত্ত আলো। শিশুটিকে তাই মনে হয় অলৌকিক, ঈশ্বরের দূত। পবিত্র সে, পবিত্র তার মন ও শরীর। শিশুটিকে অবহেলা করলে তার পাপ হবে।

শিশুটিকে জ্যোৎস্নায় রেখে ঘরের ভেতর ফিরে যায় সে। ঘরের ভেতর নিভৃত শাহনাজের রূপ ও সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা, সেই টানেই ফিরে এল ঘরে। তেমনই বিছানায় পাশ ফিরে বসে আছে শাহনাজ। তাড়িত আগ্রহে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, এই সেই কামনাবাসনার নারী, ধরা হয়ে বসে আছে তারই বিছানার পাশে? কিন্তু মুহূর্তে বিচলিত হয়, মন টেনে ধরে জ্যোৎস্নায় শুয়ে থাকা শিশুটি। একবার তাড়িত হয় শাহনাজের পিঠে বাঁ হাতটা আলতো রাখতে, এই স্পর্শই তো সূচনা হবে শাহনাজে তার মিলনসম্ভোগ। শাহনাজের সমস্ত শরীরটা পেয়ে যাবে তার শরীরের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। কিন্তু এই অলৌকিক শিশু তাকে থমকে দিচ্ছে, জ্যোৎস্নায় তার শুয়ে ঘুমিয়ে থাকার অলৌকিক ঐশ্বরিক মহিমাবোধ তাকে বিচলিত করে। ফিরে যায় আবার সে জ্যোৎস্নার বারান্দায়। মুখ তুলে দেখে চাঁদ। দেখে অনন্ত আকাশ, সৃষ্টির রহস্য দেখে।

শাহনাজ ক্ষুধার্ত। খিদে সয়ে চুপ করে বসে থাকে। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না শফীউল্লা তার গায়ের গাছে এসে বার বার দাঁড়ায় অথচ গায়ে হাত দেয় না। সে তো পুরুষসম্ভোগে ধরা দেওয়ার জীবন আবার পেয়েছে, আবার তাকে পুরুষের হাতে ধরা পড়তে হবে জেনে গিয়েছিল, অস্বস্তি থাকলেও মেনে নিয়েছিল, যেহেতু সে শফীউল্লার বিবাহিত বিবি হয়েছে। সেজন্য মনে মনে নিজেকে তৈরি করছিল সম্ভোগের নারী হিসেবে। যখনই শফী তার গায়ে হাত দেবে, সে চলে যাবে তার অধিকারে। শফী কাছে আছে অথচ গায়ে হাত দেয় না, সে সেই ঘটনায় প্রস্তুত হয়ে পড়ে, অথচ তার প্রস্তুতির অপচয় হচ্ছে। বহুদিন পরে নতুন করে জাগিয়ে তোলা প্রতিকামনার বোধে তার বিঘ্নতা আসছে। মানসিক এক নিগ্রহ যেন পায় সে। স্পর্শের আগত শিহরনে সে তো সম্মত হয়ে ওঠে, একটু একটু করে সম্ভোগের অনুভূতিতে জেগেও ওঠে সে। যতই খিদে পাক না তার। কোনো আলাপ কথোপকথন ছাড়াই তার চলে যাওয়া হতে পারে শফীর বাহুবন্ধনে। এই আশঙ্কার অনুভূতি বার বার শরীরে ও মনে গড়ে তোলার জন্য কামার্ত হয়ে ওঠে বার বার শফীর দাঁড়ানোর ভিতর। বার বার এ দৃশ্যের সামনে যাওয়া তার অপমান শাহনাজের মনে হয়। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। শরীরের মার সইতে হবে না, স্থিত শান্ত থাকা যাবে। কিন্তু আবার তো আসে শফী, আবার তার কাছে এসে দাঁড়ায়।

বারান্দা থেকে শফীর এসে দাঁড়ানোর ঠিক পর পর শিশুটি হেঁটে এল ঘরের ভিতর। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছে।

শিশুটির দিকে শফীর চোখ পড়ে যায়, শিশুর দিকে তাকিয়ে হাসে। এগিয়ে

গিয়ে হাত ধরে। কোলে তুলে নিয়ে বিছানার কাছে বসানো চেয়ারটায় তুলে বসিয়ে দেয় শিশুটিকে।

শিশুটি আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। চোখে ঘুম নেই। শফীর একবার মনে হয়, হাত ধরে টানতে টানতে ক্রোধবশত দেয় শিশুটিকে দরজার বাইরে বার করে ভেতর থেকে দরজা এঁটে। শিশুটি দরজার বাইরে কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে পাড়া মাত করলেও তার কিছু যায় আসে না। তার আকাঙ্ক্ষার নারী তারই বিছানার পাশে ব্রীড়ানম্র ভঙ্গিতে বসে আছে, এখন তাকে নিয়েই তার সবকিছু। তার জন্য অপেক্ষায় সময় অতিবাহিত করার জন্য গোরস্থানে গিয়ে বসে থেকেছে, তাকে পাওয়ার চিন্তায় একাগ্র থাকার জন্য নিয়মিত আড্ডায় সে যায়নি, আর সে কিনা একটি শিশুর জন্য সে সব বিসর্জন দেবে? এই শাহনাজের পিঠে হাত দেওয়া, ঘোমটা টান মেরে খুলে ফেলা, জড়িয়ে ধরা, চুম্বন করা, কাছে টেনে নেওয়া, শেষমেষ সঙ্গমে যাওয়া হবে তার। কিন্তু সে ঘটনায় যেতে পারে না শফী। যেহেতু এটা একটা মিথ্যা ঘটনা তাই শিশুটির প্রতি তার দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে যায়। শিশুটির সঙ্গে হাস্যবিনিময় করে।

শিশুটির কাছে এল, তার থুতনি ধরে আদর করে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। শিশুটির প্রতি স্নেহব্যবহারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে তো শাহনাজের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তেই মিলনের প্রাক প্রস্তুতিতে আছে। আর সেই রূপে মজে ওঠা কামনাবাসনার সূত্র ধরে বিয়ে, আজ এই বাসর। সেই আকাঙ্ক্ষিত বাসররাত দিয়ে শুরু হবে শাহনাজকে পাওয়া। নারীর প্রতি তার আসক্তি জন্মেছে, বিবাহিত হয়েছে। মধ্যচল্লিশ বয়সে নতুন এক জীবনে ঢুকে পড়েছে সে। ভেতরে ভেতরে সেই আকাঙ্ক্ষার আকুতি বোধ করে সে। সে কোনো অল্পবয়সী সুন্দরীকে বিয়ে করেনি, সে বিয়ে করেছে একজন বছর চল্লিশের বিধবাকে। যার রূপ দেখে সে প্রেমে পড়েছে। তার জন্য সে ক্ষুণ্ণ নয়, যেহেতু সে শাহনাজের প্রতি মুগ্ধতার বোধ থেকে মিথ্যা অনতি বাস্তবতার যাচ্ছে, সেহেতু এই নারীই তার চরম আকাঙ্ক্ষিত। শিশুটি ঘুমিয়ে পড়লে, নির্দ্বিধচিত্ত হতে পারলে মিলন হবে তার এই নারীর সঙ্গে। এখনও রাত আরও খানিকটা বাকি আছে। কল্প মিথ্যা ঘটনা বলে প্রতীক্ষায় সে যেতে পারছে।

তাই শিশুটি বাধা হয়ে ওঠে শাহনাজ আর তার মিলনে। তাদের মিলনের নানা বিরোধ ঘটনা আনে, সে-সব ঘটনা কল্পনা করতে ভালবাসে। শিশুর লালার গন্ধ নিয়ে আসে, নিয়ে আসে তার কোঁকড়ানো চুলে আঙুল বুলিয়ে যাওয়া জনিত সুঘ্রাণ। ঘাড়ে পিঠে গালে বাহুতে দেখে কোনো জন্মজড়ুল। হাঁটুতে ছড়ে যাওয়ার দাগগুলো পরখ করে।

শাহনাজের পক্ষে কতক্ষণ ধরে আর নববিবাহিতা বধূবেশের ব্রীড়াবনত স্পর্শ আশঙ্কায় থরো থরো ভঙ্গি নিয়ে কাটানো যায় এই বয়সের দ্বিতীয় বিবাহে? ভঙ্গি বদলাতে তার খুব ইচ্ছে করে। একবার মনে করে বেনারসীটা টান মেরে খুলে ফেলে, ঘরে কেউ নেই এই বাস্তবতাবোধ নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে, আর নিশ্চিন্তে

ঘুমিয়ে পড়ে। দুরছাই এসব সজ্জা কি সে চেয়েছিল? নাকি স্পর্শ আশঙ্কার ছলাকলাতে সে স্বতই যাচ্ছে? নববিবাহিতার এমনই রীত, সজ্জা মনে করেই এই ভঙ্গিতে যাওয়া তার। শফীউল্লা আগে কখনও বিয়ে করেনি, তার জন্যই তার এই রূপ। বরং অনেকদিন দাম্পত্যে আছে এই ভঙ্গিতে মিশতে পারলে সহজ হত শাহনাজের পক্ষে। মনে মনে গালাগাল দেয় লোকটাকে।

শাহনাজের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, কিছুতেই এই ঘটনায় যেতে পারল না শফীউল্লা। শাহনাজের সঙ্গে মিলনসঙ্গম রোধ করে বুঝি।

শিশুটিকে কোলে নিয়ে ঘোরে ঘরের ভেতর। শূন্যে তোলে, লোফে, হাসায়, খেলায় ও খেলে। ঘুম পাড়ানোর জন্য কাঁধে ফেলে, আবার চিমটি কেটে ঘুম তার ভাঙিয়ে দিতে চায়। মেতে থাকে, উৎসাহ তার শিশুটিকে নিয়ে মেতে থাকা। কিছুতেই শাহনাজের সঙ্গে মিলনে যাচ্ছে না। এক এক বার কাছে যাচ্ছে, কিন্তু গায়ে হাত রাখছে না, তার আগেই শিশুটির উপস্থিতি বাধা মনে করছে। আর সারাক্ষণই তো পাওয়ার আগের মুহূর্তের সজ্জায় পায়, সেই মুখে ঘোমটা টেনে পাশ ফিরে লজ্জারাঙা হয়ে বসে আছে, অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও সেই ভঙ্গি অটুট অনড় থাকছে, সেহেতু তার পাওয়ার মুহূর্তের ভঙ্গি খোয়া যাচ্ছে না বলে শিশুটিকে নিয়ে থাকার যে ঘটনা, ঘটনামাত্র, শাহনাজ তারই থাকছে, শাহনাজে তারই অধিকার, তাই তার শিশুটিকে নিয়ে মেতে থাকা চলে। তার পক্ষে তো বুঝে নেওয়া অসুবিধে হয় না, শাহনাজের সঙ্গে তার মিলন ঘটছে না।

৮

পাঠক, আমরা বরং শফীউল্লাকে নতুন করে শাবানার প্রতি প্রেমমুগ্ধতার ঘটনার বাস্তবে ফিরিয়ে আনি। শাহনাজের প্রতি সাবেক প্রেমমুগ্ধতার কল্প ঘটনায় গিয়েছিল মাত্র শফী। শাবানাকে দেখামাত্র তীব্রভাবে তাতেই মুগ্ধ হয়েছে সে। এই বাস্তব সত্যই এ কাহিনীর সত্য। যে ঘটনায় আমরা একটু আগে গেছি, সে ঘটনা ঘটতে পারত, যদি শাহনাজের প্রতিই শফীউল্লার মুগ্ধতা অটুট থাকত। কিন্তু চরিত্রের নিজস্ব কল্পনাকে আমাদের মূল্য দিতেই হয়। শফীউল্লা শাহনাজের প্রতি বিগত মুগ্ধতার কল্পবাস্তবতায় যেতে চেয়েছে, আমরা তাকে অনুসরণ করেছি মাত্র। কথকের বেশি কিছু করারও থাকে না।

এখন এই লাইব্রেরি ঘরে শাবানার সামনে দাঁড়িয়ে সে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সে সমস্যা তারই। এক্ষেত্রে আমরা তাকে অনুসরণ করতে পারি, তার ক্রিয়াকলাপ ও ভাবনা বিবৃত করতে পারি।

শফীউল্লা চোখ ফেরাতে পারে না শাবানার দিক থেকে। শাবানার প্রতি ভাললাগা প্রেমবোধ কীভাবে ফিরিয়ে নেবে? শাহনাজ বিবি, যাকে সে সদ্য বিয়ে করেছে, যে আজ তারই ঘরে উঠছে, তারই মেয়ে শাবানার প্রেমে পড়ে গেল সে? তার থেকে উদ্ধারের পথ কী আছে? এত বছর কোনো নারীর প্রতি আসক্তি

ছিল না বেশ ছিল, আসক্তি এল তো এমনি করে এল কেন? শাহ্‌নাজেই শেষ থাকত, না হলে শাহ্‌নাজকে বাদ দিয়ে শাবানাতেই একে এক মুগ্ধতা যদি পেত তাহলে এমন একটা সঙ্কটের মধ্যে পড়ত না শফীউল্লা। সব তো ঠিক, জিয়াদ তার বিবিকে সঙ্গে করে শাহ্‌নাজকে আনতে চলে গেছে। শাহ্‌নাজ তার ঘরে উঠবে সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। কিন্তু শাহ্‌নাজকে নিয়ে করবে কী? শাবানাকে দেখার পর শাহ্‌নাজ তো তুচ্ছ হয়ে উঠল।

আর একটা সে বিয়ে করতেই পারে, তার টাকা পয়সা আছে, এমন আকছার অনেকেই করে থাকে। কিন্তু মাকে বিয়ে করার পর মেয়েকে কীভাবে বিয়ে করবে? তওবা তওবা! আসতাগফেরুল্লা, দোজখে জ্বলবে সে। সে ঘোরতর পাপ হবে। তার পক্ষে ধর্মবিরুদ্ধ কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না। সে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে, ধর্মে তার মতি, সে আল্লাকে বিশ্বাস করে, আল্লার এবাদত সে করে যেতে চায়, আমলনামা দিয়ে পরলোক আবাদ করতে চায়, সে পাপ করতে পারবে না কিছুতেই।

শফী বলল, 'বল, কী বলতে এসেছ বল?'

'আপনি আমার মাকে আজ আনতে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সে ব্যাপারেই বলতে এসেছি, কদিন পরে যদি যেত!'

'কেন?'

'একটু অসুবিধে আছে।'

শফী মনে করল শাহ্‌নাজের না যাওয়াতে বিশেষ কিছু লাভ হচ্ছে না, বরং শাহ্‌নাজ গেলে তাকে নিয়ে করবেটা কী? শাবানাই তো তার আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে। সে চট করে রাজি হয়ে গেল। বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমার ম্যানেজার জিয়াদকে বল, আমি নিয়ে যেতে বারণ করেছি।'

'আমার কথায় বিশ্বাস করবে?'

পাঞ্জাবির বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে তসবিটা টেনে বের করে শফী, 'এই তসবিটা তাকে দেবে, তবে বিশ্বাস করবে।'

হাত বাড়িয়ে তসবিটা নেয় শাবানা, শাবানার হাতের স্পর্শ পায় শফী। শফীর হাত পুড়ে যায়। শাবানাকে বুঝতে দেয় না তার মনের সেই তাড়স।

'চাচাজান, যাই।' দ্রুত চলে যাচ্ছিল নারীটি।

'শোন।' শফী থামিয়ে দেয় তাকে।

শাবানা আবার শফীর চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। শফী পাপী মানুষটা ভেতরে ভেতরে পুড়ে যাচ্ছে, এত বছরের কর্মফল সব কি তার নষ্ট হয়ে যাবে? নারীটি তেমনভাবেই তাকে আকর্ষণ করে। নিজেকে সামলে নেয়। বলে, 'আমাকে কখনও কোনোদিন চাচাজান বলবে না।'

'তবে কী বলব?'

'কিছুই না।'

মাথা নেড়ে সম্মত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল।

পেছন থেকে আবার ডাকে শফী, এবার নাম ধরে, 'শাবানা!'

শাবানা চৌকাঠের কাছ থেকে উঠে আবার ফিরে আসে। সামনে এসে আবার দাঁড়ায়।

শফীউল্লার বুকে হাতুড়ি পেটে। কিছুই বলতে পারে না। শুধু দেখে। দেখা তার অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে। তার ভাগ্যে বোধহয় বেহেস্ত নেই। নিজের প্রেমে পড়ার মুগ্ধ চাহনিকে কিছুতেই সামাল দিতে পারছে না। আবার একটু দেখে নিল, তারপর বলল, 'আচ্ছা যাও।' শাবানাকে ফিরে যেতে দিল।

শাবানা চলে গেল। শফীউল্লার কাছ থেকে সম্মতি আদায় করে নিয়েছে যে তার মা আরও কিছুদিন এ বাড়িতে থাকবে। তার মা কেন থাকুক আরও কিছুদিন, সে কথা তো ভেঙে ফুটে বলা যায়নি, বলতে বললে বলতেও পারত না। কেন না সেটা হত লজ্জার কথা, তার যে বিয়ের কথা চলছে, সে-সব মিটে গেলেই ভাল হয়।

সন্ধ্যার সময় মাকে নিয়ে যাওয়ার কথা। এখনও সন্ধ্যা হতে বাকি আছে, তার আগেই পৌঁছে যাবে। তবুও জোরে জোরে হেঁটে ফিরতে থাকে সে। আজই সন্ধ্যার পর তারই বিয়ের দিনস্থির করতে আসার কথা। গতকাল আসার কথা ছিল। একদিন পিছিয়ে দেওয়' হয়েছে। কেন না মায়ের বিয়ে হয়েছে, তার ধকল সইবার জন্য একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়। আর আজই আম্মিকে নিয়ে যেতে লোক এল? তার আম্মির তাই থাকার দরকার। আম্মির বিয়ে হয়েছে, সে কথা মেটিয়াবুরুজে চাউড় হয়েছে, সকলেই জানে, তার হবু স্বামী আলম আর তার রিস্তেদারদেরও কানে নিশ্চয় পৌঁছেছে। কিন্তু আজকের দিনই যদি আম্মি তার শ্বশুরবাড়ি চলে যায় তাহলে যে সব অতিথিরা এসে বিয়ের দিনস্থির করবে, তারা অপমান বোধ করতে পারে। রেগে গিয়ে বিয়ে ভেঙে দিতেও পারে। তাই আম্মিকে আটকাচ্ছে শাবানা। বিকেলে আম্মিকে আনতে গাড়ি নিয়ে লোক যখন এল, তখন শাবানা ভেবেই নিয়েছিল, তার এই বিয়ে ভাঙছেই। তবুও চুপি চুপি লাইব্রেরিতে এসে একটা শেষ চেষ্টা করেছিল, যদি এখানে মানুষটাকে পাওয়া যায়। পাওয়া গেল আর সম্মতিও আদায় করা গেল। নিয়মিত লাইব্রেরিতে যাওয়া আসা আছে জানতো লোকটার।

ভিড় রাস্তা দিয়ে ফিরছিল। একটু ত্বরা তার চলায়। পথ বেশি দূরের নয়, কিন্তু উদ্বেগ, যদি দেরি হয়ে যায়! সাইকেল রিকশা, অটো রিকশা, মোটর সাইকেলগুলো কানের পাশ দিয়ে পাঁই পাঁই ছুটছে। রাস্তা একটু ফাঁকা পেলেই এখানে যানবাহনরা অদ্ভুত গতিমান হয়। কেন না প্রায়শ যানজট থাকে। ফলে পথচারীদের হেনস্তার শেষ থাকে না। এই বুঝি কোনো অটোরিকশা তার ওপর চড়াও হল, এই বুঝি কোনো মোটর সাইকেল ধাক্কা দিয়ে বসে। একটা অটোরিকশা

পেছন থেকে এমনই চড়াও হল যে শাবানা রাস্তার কিনারে লাফিয়ে উঠতে গেল, আর একটা গর্তে পা পড়ে ছিটকে পড়ে গেল সে। খুব একটা লাগেনি তার, কিন্তু তার ডান হাতে ধরা তসবিখানা গেছে ছিটকে, ছিটকে গিয়ে অটোরিকশার ভেতরে পড়েছে কোথায়ও।

দু-চারজন লোক তার এই পড়ে যাওয়া দেখেছে, দেখেছে অটোরিকশাটার জন্যই সে পড়েছে। দু-চারজন হই হই করে উঠল অটোরিকশাটার প্রতি জনরোষ জানাতে; তাই প্রাণভয়ে অটো রিকশাটা দিল জোরে ছুট। শাবানার হাতের মুঠোয় ভরা তসবিটা তখন অটোরিকশার ভিতর চলে গেছে, যাত্রীদের কারুর গায়ে, বুকে অথবা কোলের ওপর পড়েছে। চোখের নিমেষে অটোরিকশাটা উধাও হয়ে গেল।

শাবানার কান্না পেল। কাউকেই বোঝাতে পারল না কী তার খোয়া গেছে কিছুটা ছোটার চেষ্টা করল, কিন্তু গাড়িঘোড়া এমনভাবে চলাচল করছে যে ছোটা যায় না। কপালে করাঘাত করবার মতো সঙ্কটে পড়ল শাবানা। ওই তসবিটা যে এখন তার কাছে কতখানি মহার্ঘ, মূল্যবান, কে বুঝবে সে কথা?

সেই মহামূল্যবান তসবিখানা পেয়ে হারিয়েছে শাবানা মেটিয়াবুরুজের পথে সেই তসবিখানা দেখালে তার মায়ের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া রুখে দেওয়া যেত। শাবানা যে সত্যি কথা বলছে, তার কথার সাক্ষ্য দিত তসবিখানা। হায় আশ্চর্যজনকভাবে সে তসবিখানা খোয়া গেছে পথে। তসবিখানা পেয়ে হারিয়েছে সে। অন্তরের অঝোর কান্নায় কাঁদতে লাগল সে। কাঁদতে লাগল, শুধু কাঁদতে লাগল।

৯

গভীর রাতে তিনতলার সিঁড়িতে পায়ের চপ্পল দিয়ে ম্যানেজার জিয়াদকে বেদম পেটাচ্ছে শফীউল্লা। তার সেই মার আর চিৎকারে মহল্লা কেঁপে কেঁপে উঠছে বাড়ির অন্য অংশের মানুষজন জেগে উঠেছে। ভেবে নিয়েছে ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে জিয়াদ তেমন কোনো গুরুতর ভুলচুক করে বসেছে, তাই এই মারধোর শফীউল্লার মাথায় রক্ত চড়লে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তার ক্রোধের সামনে যাওয়ার সাহস কারুরই নেই।

রাত করেই বাড়ি ফিরেছিল, আজ আর বাড়ির ভিতর খেতে যায়নি। নিজের সঙ্গে লড়াই করার জন্য গোরস্থানে একা পড়েছিল। তারপর শিশুটিকে গোরস্থানে আবিষ্কার, তাকে ফেলে চলে গেছে তার বাড়ির লোকজন এ ঘটনা ঘটেনি, তাকে কাঁধে করে অনেক হেঁটেছে মেটিয়াবুরুজের পথে পথে, এ ঘটনায় যায়নি। তবে হোটেলে খেয়ে একে এক নিঃসাড়ে আত্মগোপন করার মতো তার তেতলার ঘরে এল আর তড়িদাহত হল শফীউল্লা। যথারীতি শাহনাজ এসেছে। তার তসবিখানাকে অপমান করেছে জিয়াদ। এত বড় স্পর্ধা!

এক তলায় তার ইউনিটের জাভেদ ওস্তাগরকে দিয়ে জিয়াদের বাড়ি থেকে তুলে আনতে পাঠাল তক্ষুণি শফী। জিয়াদ ঘুম থেকে উঠে এসেছে, অমনি পায়ের

জুতো খুলে মার আর চিৎকার। 'তসবিখানা কোথা? তসবিখানা কোথা?'

জিয়াদ ভেবে উঠতে পারছে না মালিক তার ওপর হঠাৎ এ রকম খেপে গেল কেন, আর তসবিখানার ব্যাপারটা কী? মুখ বুজে জুতোর মার আর অশ্রাব্য গালাগাল হজম করছে। চুপি চুপি যে কিনা তার বিবি ঘরে তুলে দিল তার কিনা এই হেনস্থা? তসবিখানার কথা কী বলছে? মালিকের মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো?

পেটাতে পেটাতে হাতের জুতোজোড়া যখন আর আস্ত থাকল না তখনই ক্ষান্ত হয় শফী। জিয়াদের মুখের ওপর জুতোজোড়া ছুঁড়ে মেরে লাফিয়ে ঘরের ভেতর উঠে যায়। দেখে বিছানায় শাহনাজ বেনারসী পরে বসে আছে দেওয়ালমুখো হয়ে লজ্জাবনত ভঙ্গিতে।

আজকের রাতটাই মাটি গেল শফীর। তার ঘরে যে সদ্য বিয়ে করা বিবি এসেছে, যে কিনা পুরুষের স্পর্শের আশঙ্কা শিহরনে লজ্জাতুর হয়ে আছে। কিন্তু এই নারী বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষিত নেই এখন আর। বিন্দুমাত্র মুগ্ধ করছে না। তারই মেয়ে শাবানার প্রতি আসক্ত হয়েছে সে। আর শাবানার রূপে মুগ্ধতার জন্যই শাহনাজের আগমন সে তসবিখানা দিয়ে রুখে দিতে চেয়েছিল। সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল নিশ্চিত রুখে গেছে শাহনাজের আগমন। কী করে কীভাবে শাহনাজ চলে এল আবার? গোরস্থান থেকে ফিরতে ফিরতে ঘুণাক্ষরেও আশঙ্কা করেনি যে, তার তেতলার শোবার ঘরের বিছানায় শুয়ে থাকবে শাহনাজ। যদি একবার টের পেত জিয়াদ কেলেঙ্কারি করেছে, তাহলে তেতলা পর্যন্ত সিঁড়ি ভেঙে উঠত না, দেখত না সেই অনভিপ্রেত দৃশ্য, শাহনাজ শুয়ে আছে তারই বিছানায়। নীচের থেকেই ফিরে যেত সে ফের গোরস্থানে।

কিছুতেই শাহনাজকে তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কিছুতেই শাহনাজের পিঠে হাত রাখতে পারবে না। জড়িয়ে ধরতে পারবে না। পাশে নিয়ে শুতে পারবে না। সম্ভোগসঙ্গমে যেতে পারবে না। তাহলে পাপ হবে। শাহনাজ তার বিবাহিত ঠিকই, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গম করলে আর শাবানাকে পাওয়া জুটবে না তার, সে পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। সে শাবানাকেই পাবে অথচ অধর্ম করবে না, যদি সে শাহনাজের সঙ্গে একটিবারের জন্যও সঙ্গম না করে, তারপর তালাক দেয়, তাহলে তার পক্ষে জায়েজ হবে শাবানাকে বিয়ে করা। ধর্মের এই বিধান তার কণ্ঠস্থ। তাই শাহনাজের আগমনে শফীউল্লা এত ক্ষুব্ধ, এত আতঙ্কিত। লাইব্রেরি ঘরে শাবানাকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার প্রথমে শাহনাজের আগমন রুখে দিয়েছিল তসবিখানা দিয়ে। তারপর গোরস্থানে গিয়ে বিধিবিধান হাতড়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, শাহনাজের সঙ্গে সঙ্গমে যাওয়ার আগেই শাহনাজকে সে তালাক দেবে।

বেশ ফুরফুরে মন নিয়ে উঠে এসেছিল সে তেতলার ঘরে। কিন্তু দরজা খোলা, ভেতরে শাহনাজকে দেখেই তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে দেখল, না তসবিখানা তার পকেটে ভুলক্রমেও একটি বারের জন্যও নেই।

তসবিখানা ঠিক ঠিক শাবানার হাতে দিয়েছে সে। তারপর জিয়াদকে ধরে আনবা এত্তেলা পাঠাল, আর মারধোর করে উঠে এসেছে সবে নিজের ঘরে। বিছানা উঠে বসেছে ততক্ষণে শাহনাজ।

খুব বিমর্ষ দেখায় শফীকে, যেন তার চেয়ে দুঃখী মানুষ পৃথিবীতে নেই। এ ঘরে তারই বিছানায় শাহনাজ থাকা মানে তো প্রলোভনের সামনে থাকা। হা বুলিয়ে কপালের ঘাম মোছে। শবীরের পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে এক ক্লান্তি

কী করবে এখন শফীউল্লা? পোশাক বদলায়। বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জ দেয়। তারপর ফিরে এসে শাহনাজ-ত্রাসে পড়ে। কিছুতেই প্রলোভনে পড়া চলে না। শিশুটিকে খোঁজে। মনে হয় ঝুল বারান্দায় শুয়ে আছে জ্যোৎস্নায়। যেন এখন তুলে আনতে পারবে ঘরের ভিতর। এখনই সে শিশুটির সঙ্গে খেলবে ঘরে ভিতর। তার সঙ্গে হাঁটবে ঘরের ভিতর। কোলে তুলে নেবে। শূন্যে তুলে লু নেবে। শিশুটা নেই, না নেই।

শাহনাজকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেয়, ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখে খোলা দরজ দিয়ে বেরিয়ে আসে শফীউল্লা। বেরিয়ে সিঁড়িতে নামতে নামতে হাঁকে শফী, 'হান্না হান্নান।' দোতলায় দাদা শওকতউল্লার ইউনিটের ওস্তাগর হান্নানকে ডাকে।

ডাক শুনে হান্নান ও কলওয়ালারা বেরিয়ে আসে দরজার মুখে। দরজা দি কারখানা ঘরে তাদের মধ্যে ঢুকে যায় শফী। হান্নানকে বলে, 'আমার কারখা ঘরের সবাইকে ডাক, জাভেদকেও ডাকিস।'

খবর চলে যায়।

মোছামুছি করে সরেস চেয়ারটা বাড়িয়ে দেওয়া হল শফীকে। তাতে আয়ে করে বসল শফী। পিঠটা ঠেসিয়ে দিল চেয়ারে। কিন্তু নীচের কর্মচারীদের স তার ম্যানেজার জিয়াদকে ঢুকতে দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার। 'বেরো, বেরে তুই মুখের সামনে একদম আসবি না। খুন করে ফেলব তোকে।'

মাথা নিচু করে দ্রুত বেরিয়ে গেল জিয়াদ।

তবে মুখ প্রসন্ন হয় শফীর। প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন কর্মচারী, তার সাম জড় হয়েছে। সবাইকে হাত থাবড়ে বসতে বলে শফী। সবাই সেলাই মেশিনে ফাঁকফোঁকরে, কাজ কামের স্তূপের গায়ে গায়ে বিক্ষিপ্তভাবে বসে পড়েছে। সব মুখে ক্লান্তি, চোখে কালি, ঘুমের জন্য ছটফট করছে। কিন্তু এ বাড়ির ছোট মালি ক্রোধান্বিত, তাদের শৃঙ্খলা তাই ভেঙে গেছে, ঘুমোতে যাওয়ার সময় অনেকক্ষ হল পেরিয়ে গেছে।

শফী যে তার শোবার ঘরে কাটাচ্ছে না, সে যে শাহনাজের সঙ্গে মিলিত হ না, এটা প্রমাণ করবার জন্যই এই পঁয়তাল্লিশ জন লোকের কাছে দোতলায় ত নেমে আসা, এই পঁয়তাল্লিশ জনকে সাক্ষী হিসেবে পাওয়া হবে তার।

কিন্তু কর্মচারীদের যে ডাকল কী বলবে তাদের? মুখে চোখে জল দেওয় পর বেশ তাজা ঝরঝরে লাগছে নিজেকে শফীউল্লার। সামনের জনসমষ্টি নীঃ

নিথর। দু-একজনের বেশ ঘুম পেয়েছে, ঢুলছে, চোখ খোলা রাখতে পারছে না। পরিবেশটা অত্যন্ত অনুকূল ও মনোমুগ্ধকর। শফী দু-একবার গলা খাকারি দিয়ে নিল। 'তোমাদের এক সত্যি ঘটনার কথা বলব। আজ আমি দেখেছি কারবালার গোরস্থানে এক গায়েবি শিশুকে। সে এক আশ্চর্য শিশু!'

শিশুটি ঘুমিয়েছিল। তারপর উঠে বসে। তার গায়ে স্পর্শ করেছে শফী। সেই কল্পঘটনা, যা সে কল্পনা করে, সেই ঘটনাই বিবৃত করে যায় শফী। আর এই কল্পঘটনা তার নিজেরই মনে হয় ভীষণ সত্যি।

শিশুটি হেঁটে বেড়ায় গোরস্থানের ভিতর। শিশুটির হাত ধরেছে, শিশুটির সঙ্গে হেঁটেছে। কখনও কখনও শিশুটি নিজে থেকে শফীর হাত ধরেছে, কখনও হাত ছেড়ে দিয়েছে। কখনও একা হেঁটেছে, কখনও সঙ্গে নিয়ে হেঁটেছে। অদ্ভুত চোখে মুখে দ্যুতি তার। অদ্ভুত তার পবিত্র হাসি। সে খেলে অবিরত শুধু খেলে বেড়ায়। হাওয়ায় খেলে বেড়ায়, আলোয় খেলে বেড়ায়, জ্যোৎস্নায় খেলে বেড়ায়, অন্ধকারে খেলে বেড়ায়। সে নিজে শিশুটিকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার মুখের লালা শফীর আঙুলের ডগায় এখনও আঘ্রাণ পাওয়া যাবে।

এই শিশু কল্পনায় থাকতে থাকতে এই শিশু সত্যিই শফীর জীবনে বাস্তব এক চরিত্র হয়ে উঠেছে। যাকে সে হাত বাড়ালেই পায়, দেখে, তার সঙ্গে খেলাধূলা করে। সে সকলকে শোনায় সেই শিশুর কথা, তার নিজেরই মনে হয় না সেই শিশু কল্পঘটনার শিশু। যেন সে দেখে, তার সঙ্গে থাকে। ঘুম থেকে উঠে তার কথা মনে পড়ে যেতে পারে।

সেই আশ্চর্য শিশুর গল্প বলে চলে শফীউল্লা। বিস্ফারিত চোখে কর্মচারীরা শুনছে সে ঘটনার কথা। শিহরিত হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাদের। আর রাত ফুরিয়ে যেতে থাকল তাদের চোখের সামনে দিয়ে। এই মিথ্যা ঘটনার বিবরণের শেষে কর্মচারীদের সাক্ষী রেখে তার নববিবাহিত বিবি শাহনাজকে তালাক দিল। তালাক! তালাক! তালাক!

১০

সিঁড়িতে নেমে আড়ি পেতে শাহনাজ শুনছিল শফীউল্লার কাহিনী। যেই তাকে তালাক দিয়ে দিল শফী, অমনি দরজার কাছে এসে মুখ ছোটাল শাহনাজ। 'কে তোর বিবি হতে চেয়েছিল? ধরে বেঁধে বিয়ে করলি, এখন ঘরে না তুলতে তুলতে তালাক দিলি? তালাক দিয়ে আমার কিছুই করতে পারবি না। আমার সুখ, তোর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে।' মাথা থেকে বেনারসীর আঁচলটা টান মেরে খুলে ফেলে। 'এই তোর ঘর আমি নিজেই ছাড়লাম।' গহনাগুলো অঙ্গ থেকে টক টক খুলতে থাকে শাহনাজ। হাতের গলারটা সহজে খোলা হয়ে যায়। কানের দুটো খুলতে বেশ খানিকটা দেরি হয়। তারপর নথে এসে একেবারে ঠেকে গেল। নাকে হাত দিয়ে নথ খুলছে যে ভঙ্গিতে সেই ভঙ্গিতে খুব মানায় শাহনাজকে। অনেকটা সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

নথটা এইবার খোলা হয়ে যায়। 'আমি চললাম, এমন মানুষের সংসারের মাথায় মুড়ো ঝাঁটা!'

'যাও তো জাভেদ, দিয়ে এস।' শফী বলে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শাহনাজ থমকে যায়। 'থাক, কাউকে আর যেতে হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব।' হিংস্র নাগিনীর মতো শাহনাজের চোখ দুটি ধারালো হয়ে উঠেছে। দ্রুত পায়ে নেমে গেল নীচে।

যদিও জাভেদ পরে পরেই নেমে গেল, পেছু পেছু আর কারুর নেমে যাওয়ার অধিকার ছিল না।

পেছন পেছন জাভেদকে নেমে আসতে দেখে, খানিকটা এগিয়ে যাবার পর, থমকে দাঁড়ায় শাহনাজ। 'আমার পেছু নিওনি বলচি, মুখ ছোটাব তাহলে। আমাকে ঘরে পৌঁছে দেবার ভদ্দরলোকপনা হচ্ছে! দশবার এ পথে দুবেলা যাই আমি—যদি পেছু আসবি তো পাড়ার লোকদের ঘুম ভাঙাব চিল্লিয়ে। ছোটলোক, বদ, ঢ্যামনা, বিয়ে করতে তর সয় না, আবার ছাড়তেও তর সয় না।'

ক্রমশ শাহনাজের চিৎকার মিলিয়ে যাচ্ছে, দূরাগত হয়ে উঠছে। দোতলার জানালা দিয়ে শাহনাজের ফিরে যাওয়া দেখছিল শফীউল্লা। মোড়ের বাঁকে হারিয়ে যায়, মিলিয়ে যায় শাহনাজ।

কারিগরদের দিকে না তাকিয়ে বুক চিতিয়ে কারখানা ঘর ছাড়ল শফীউল্লা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল তিনতলায়। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। পালঙ্ক ফুল দিয়ে সাজানো, এখনও তার থেকে তাজা সুরভি ছড়াচ্ছে ঘরের বাতাসে। বিছানায় পাতা আছে নতুন চাদর। বালিশে নতুন কভার লাগানো হয়েছে। বিছানার যে অংশে শাহনাজ বসেছিল, সে জায়গাটার চাদর কুঁচকে মুচকে আছে। টেবিলে প্লেটে ঢাকা থরে থরে খাবার। জলভরা জগ, গেলাস দুটি।

ভোর হয়ে গেছে। আলো ফুটতে শুরু করেছে। বারান্দার টাটকা ভোরের হাওয়ায় এসে দাঁড়ায় শফী। ফুসফুস ভরে নিশ্বাস নেয়। আরাম বোধ হয়। স্বাদ পায়। বাঁচার এক পরিতৃপ্তি বোধ। আজ বিকেল থেকে মনের ভেতর যে খচখচানিটা শুরু হয়েছিল, যে অস্বস্তিবোধে জেরবার ছিল, সে সব তার আর নেই।

চোখে ঘুম ছেয়ে এসেছে তার। পায়ে পায়ে বিছানায় চলে যায়। কিন্তু জিয়াদ কী বুঝল তসবিখানার ব্যাপারে? তসবিখানার ব্যাপারে জিয়াদ যে কিছু জানে না, তার প্রমাণ তো শাহনাজের স্বামীগৃহে আসা। কেন জানল না জিয়াদ তসবির ব্যাপারটা? শাহনাজকে বিয়ে করে ফেলার পর তার মেয়ে শাবানাকে দেখে তার রূপে মজে আর প্রেমে পড়ে প্রাণান্তকর অবস্থা ঘনিয়ে এসেছিল শফীর। সে জন্যই তসবিখানা দিয়ে শাহনাজের সঙ্গে মিলনসম্ভোগ রুখে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শাহনাজের আগমন ঘটেছে, রাতে ফিরে জানতে পেরে বুঝল তসবিখানা কাজ করেনি। তার মানে তসবিখানা কাজে লাগায়নি জিয়াদ।

তসবিটা শাবানা জিয়াদের হাতে দিয়ে বলেছে যে শাহনাজকে আজ নিয়ে যেতে

বারণ করেছে শফীউল্লা, এই তসবিখানা এই কথার প্রমাণ। তসবিটা শফীউল্লার কিনা শুধু চিনতে হবে আপনাকে। এবং বুঝতে হবে, এই কথাটি সর্বৈব সত্য। সেই তসবিখানা কেন কাজ করল না, কোথায় গেল তসবিটা?

তন্দ্রার ভেতর এই কথার আন্দোলন হয় শফীর। বিড়বিড় করে। স্বপ্নে তসবিখানা শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। কত মানুষের উৎসাহ ও আকুতি সেই অধরা উড়ন্ত তসবিটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলার।

শফীউল্লা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ভিতর তসবিখানা নিয়ে বেশ মেতে থাকে। স্বপ্নের ভিতর বেশ তার উৎসাহ আর আনন্দবোধ। জিয়াদকে লাথি মেরে শূন্যে তুলে দিয়েছে শফী, জিয়াদ উড়ন্ত তসবির পেছু পেছু আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। উড়ন্ত জিয়াদকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে, যেন কোনো সুন্দরী নারী। যাকে ভালবাসে, যাকে নিয়ে কামনাবাসানা তার, সে যেন জিয়াদ, এই উড়ন্তবেশী জিয়াদ। দু হাত বাতাসে ভাসিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে মেটিয়াবুরুজের আকাশে।

রাস্তায় রাস্তায় জমে উঠেছে অসংখ্য মানুষ। তারা সব হাত তুলে দেখছে জিয়াদের ওড়া। বহুদিন থেকে যেন তার জিয়াদের সঙ্গে প্রেম চলছে। জিয়াদের ওড়া দেখতে দেখতে প্রেমে আরও আকুল হয় শফী। কখনও জিয়াদ পাখি হয়ে যাচ্ছে, কখনও মাছ, কখনও কোনো আগাগোড়া সুন্দরী মেয়েমানুষ। জিয়াদ কোনো পুরুষ নয়, মেয়েমানুষ, যাকে সে বহুদিন ধরে ভালবাসছে।

এদিকে ভোর হতেই জিয়াদ সত্যি সত্যিই শফীর তসবিটার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। জিয়াদ বুঝতেই পারে না তসবিখানার ব্যাপারটা কী? যে তসবির ব্যাপারটা জিয়াদ ও অন্যান্যরা কেউ কিছু জানে না, সেই তসবিখানার ঘটনা নিজের মতো করে ঘটে। লোকে তসবিখানার ঘটনা নিজের মতো করে বুঝে নেয়। তসবিটা মঙ্গলস্বরূপ, বিবির আগমনের সঙ্গে তসবির একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল, বিবি এসেছে অথচ বিবির সঙ্গে তসবি আসেনি, ব্যস সঙ্গে সঙ্গেই রাশভারী ধনী মানুষটা নববিবাহিতাকে তালাক দিয়ে ফেলল। নববিবাহিতাকে তালাক দেওয়ার ঘটনা বিশেষ ও বিরল, কেন না মানুষটাই তো বিশেষ এক মানুষ, মহল্লায় যাকে সকলে এক ডাকে চেনে। সে বোধহয় বিবি-আবির্ভাবের শুরুতেই ভবিষ্যতে কোনো অমঙ্গলের পূর্বাভাস পেয়েছিল, তাই তাকে ত্যাগ করতে হয়, সেই নারীকে স্পর্শমাত্র না করে।

তসবি খুঁজতে পথে বেরিয়ে পড়েছে জিয়াদ। সে বুঝে উঠতে পারে না, তসবিটা তাকে কখন দিল শফীউল্লা? আর কখন বলল বিবির আঁচলে বেঁধে আনতে? নিজের পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ায়, নেই। নিশ্চয় তার হাতে তুলে দিয়েছিল শফী তসবিখানা, যে ঘটনা সে বেমালুম ভুলে গেছে। নিশ্চয় বলেছিল, বিবির আঁচলে বেঁধে দিতে। এমন একটা ঘটনা ঘটল অথচ জিয়াদের বিস্মরণ হল কী করে?

এমন তো হয়, এমন অনেক কথা কানের পাশ গিয়ে বেরিয়ে যায়, শোনা হয় না, অনেক ঘটনায় চোখ মেলে তাকায়, অথচ দেখা হয় না। তেমনি বিলীয়মান এক ঘটনার খপ্পড়ে পড়েছিল জিয়াদ।

কালকে যে ঘটনায় গেছে, কিছুতেই তসবিখানা তার কাছে ছিল না। লিচুতলায় মালিকের বিবিকে আনতে গিয়ে অন্তত বিশ পঁচিশবার পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়েছে, যা তার পকেটে কোনোদিন থাকে না, উটকো জিনিস বলে, ঠিক ঠিক উঠে আসতো হাতে। তার মানে মনে আছে যে সব ঘটনা, যে সব ঘটনায় সে গেছে, তার মধ্যে এই তসবিখানাকে খোঁজা বৃথা হবে।

তাই তসবি অনুসন্ধানের অভিযানটা অভিনবপন্থায় সাজায় জিয়াদ। চেনা ও মনে পড়ার বাইরে ছিল তসবি সমর্পণের ঘটনা, এবং তার নির্দেশাবলি, তাই চেনা পরিচিত মানুষদের মধ্যে নয় এবং সচরাচর যে সব ঘটনায় যায়, তার বাইরে তসবিটাকে খুঁজতে হবে বুঝে নিল জিয়াদ।

প্রথমে গেল মোড়ের মাথায় বসে বসে ভিক্ষে করা কুষ্ঠরোগীর কাছে। কোনোদিন লোকটাকে সে ভিক্ষে দেয়নি। কুষ্ঠরোগের প্রতি আজন্ম ভয় সত্ত্বেও লোকটার মগ বাসন ওলটালো, পুঁটুলি ধরে টানাটানি করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল তার সব কিছু। লোকটা হায় হায় করে উঠল। লাঠি উঁচিয়ে জিয়াদের পিঠে মারে এই অবস্থা। দ্রুত দেখে দুখে লাঠির বাড়ির থেকে নিজেকে পিছলে নেয়। না নেই। স্পষ্ট দেখেছে, লোকটার ঝুলিতে হেমামালিনীর একটা ফটো আছে।

তারপর গিয়ে দাঁড়াল সে চাঁদসীর চিকিৎসা ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে। এখানে বিনা অপারেশনে অর্শ ভগন্দর নালী ঘা ভাল করা হয়, যা তার কোনোদিন হয়নি, কোনোদিন আসেনি এখানে। পুরনো চেয়ার টেবিল আলমারি শো-কেস। টুক করে দোকানের ভেতর ঢুকে গেল শফী। ভেতরে গিয়ে দেখল, টুলে বসা একজন বুড়ো লোক মুখ ঝুঁকিয়ে কোলের ওপর রাখা একটা অতি পুরনো বহু হাত ফেরতা চটি বইয়ের খোলা পাতায় আতস কাচ ধরে ধরে অতি কষ্টে পড়ছে। বইটির নাম 'বিবাহের পরে', হলুদ পাতার মোড়কে বাজারি একটা কামশাস্ত্র।

সামনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে মুহূর্তে বুঝতে পেরে যায় বৃদ্ধলোকটি। আর বইটা লুকোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সামনের ড্রয়ারটা খুলে ক্যাসবাক্সর মধ্যে গুঁজে দেয়। মুখ তোলে, 'বলুন অর্শ না ভগন্দর'?

জিয়াদ বলল, 'কিছু না।'

বৃদ্ধ বলল, 'কানচটা?'

বৃদ্ধলোকটি কানে কালা বুঝতে অসুবিধে হল না। এই সমস্ত রোগীর সংখ্যা কম, যদি কেউ আসে, সচরাচর এই সাত সকালে আসে না বলে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে কামশাস্ত্র পড়ছিল।

জিয়াদ বৃদ্ধটিকে আর কিছু বলতে দেয় না, তাকে খানিকটা ঠেলে ড্রয়ারটা টেনে খোলে আর হাতড়ায়। কামশাস্ত্র বেরিয়ে এল, বেশ কিছু খুচরো পয়সা, এক দেড়শোর মতো টাকা, তিনটে কড়ি, একটা গোটা সুপুরি, পুরনো ব্লেড গোটা সাতেক, চিরুনি একটি, ইলেকট্রিকের বিল একতাড়া, 'বাবলু ফিরে এস' একটা খবরের কাগজের কাটিং যা নিরুদ্দিষ্টের প্রতি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।

া উঠে দাঁড়িয়ে দু-একবার অব্যক্ত স্বরে 'হা-হা-হা-' করেছে অমনি ক্যাসবাক্সের বকিছু দেখা হয়ে যায় জিয়াদের। ততক্ষণে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নেমে হাঁটতে রু করে দিয়েছে। যখন বৃদ্ধটি আতস কাচটাই ছুঁড়ে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। াতসকাচটা পিঠে লাগল না, দোকানের সামনে পড়ল। একজন বাঁ হাতে সিগারেট রা মানুষ আতসকাচটা হাতে তুলে নিয়ে রোদে ধরে সিগারেট জ্বালাতে চেষ্টা রতে লাগল।

দুপুরে চলে গেল আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মসজিদে নামাজ পড়তে। যে ম্প্রদায়ের মানুষদের নামাজ পড়ার ধরনটা অন্যরকম বলে একই সুন্নী সম্প্রদায়ের ানুষরাও তাদের মসজিদে নামাজ পড়তে যায় না। নামাজ পড়ার সময়, নয়, ামাজ পড়ার আগে ও পরে যদি কারুর পকেট থেকে খোয়া যাওয়া তসবিটা বরিয়ে আছে দেখতে পায়, হাতিয়ে নেবে স্রেফ। মালিকের তসবিটা চেনে জিয়াদ। যমন করে হোক ম্যানেজারের চাকরিটা তার বাঁচাতে হবে। নামাজ পড়ার পর াস্তায় বেরিয়ে এসে এক সঙ্গে নামাজ পড়া একজন লোকের ওপর সন্দেহ দানা াঁধল জিয়াদের। পাঞ্জাবির বাঁ পকেট কেমন যেন ফোলা ফোলা। দিল হাতিয়ে। কটা রুমালের পুঁটুলি। তার ভেতরে কি যেন একটা জ্যান্ত জিনিস ছটফট করছে। াসলে রুমালের ভেতর বাঁধা একটা পায়রা, এটা বুঝে ওঠার আগেই, রুমালের াঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পায়রাটা ফরফরিয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল আকাশে। লাকটা বুঝে উঠে জিয়াদের কলার চেপে ধরার মুহূর্তেই জিয়াদ চলন্ত বাসের ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল।

এত কিছুর পর তবুও তার তসবি সন্ধানের অভিযানে সমাপ্তি টানছে না। ন্ধ্যাবেলা ধানখেতির জুয়োর আড্ডায় চলে গেল। সেখানে সত্তর টাকা মতো হেরে একজন লোকের সন্দেহজনক বুটজোড়ার একখানি নিয়ে ফিরল। গলির মধ্যেই ত গলিয়ে দেখল কিছু পায় কিনা। পেল জুতোর মধ্যে অদ্ভুত খোপের ভিতর াখা একটা ধারালো ক্ষুর।

সেই ক্ষুরটা পকেটে করে চলে গেল সে একটা শুঁড়িখানায়। পকেটে ক্ষুরটা থাকায় স্বভাব বদলে গেল। টেবিলে টেবিলে মাতালদের মাতলামি আর তম্বি হম্বি। চঁচিয়ে মেচিয়ে জল চাইল। একজন বেয়ারা জল দিতে এসে গেলাসের জল চলকে ফলল জিয়াদের ডান কবজিতে। মুহূর্তের মধ্যে সটান চড় কষিয়ে দিল বেয়ারাটার াম গালে।

মদের অর্ডার দিল না, অথচ সে একটা গোটা টেবিল দখল করে রেখেছে। দ খায় যে অর্ডার দেবে সে? সে তো এসেছে তসবি উদ্ধারের সন্ধানে। শুধু ক্ষুরটা পকেটে থাকায় মাস্তানদের মতো মেজাজ পেয়ে গেছে।

জল খেল টেবিল চাপড়াল, আবার জল এল।

একটা গেলাসকে শূন্যে ছুঁড়ছিল, লুফছিল।

মালিক ছুটে এল, 'কী দেব, বিলিতি?'

মদের দোকানের পোষা মাস্তান ছুটে এল। বলল, 'কী চাই?'

'একটা তসবি খোয়া গেছে। সবার পকেট সার্চ করতে হবে।' তারপর পকে থেকে ক্ষুরটা বের করে শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে লুফতে লাগল ভয়ংকর হিংস্র ভঙ্গিতে

মদের দোকানের খদ্দেরদের চোখ গেল জিয়াদের দিকে, তারা সবাই ভয় চোখে তাকিয়ে আছে জিয়াদের দিকে। তাদের মধ্যে কিছু ছোটখাটো মাস্তানও আছে

মালিক বলল, 'আপনি করুন পকেট সার্চ!'

'না আপনারা দুজন করুন। আমার শুধু তসবিটা পেলেই কাজ মিটে যাবে রক্তপাত ঘটাতে হবে না।'

অমনি শুরু হয়ে গেল পকেট হাতড়ানো অভিযান।

একজন লোক উলটোমুখো হয়ে বসে মদ খাচ্ছিল, পরিস্থিতির ওপর সে নজর রাখেনি, মালিক তার পকেটে হাত ঢোকাতেই চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

অমনি ক্ষুরটার ফলা বের করে ডান হাতে কায়দা করে ধরে দু পা ফাঁক করে ভয়ংকর ভঙ্গিতে দাঁড়াল জিয়াদ। 'আবে বাচ্চা চুপ যা! বাচ্চা আছিস তুই!'

টুকটাক করে সব লোকদের পকেট থেকে বেরিয়ে পড়ল কতকিছু। মানিব্যাগ চিরুনি, কন্ডোম, দাদের মলম, তাবিজ, আমলকি পাচক, সেফটিপিন, বোতাম মুখশুদ্ধি, মোদক, পান মশালা, তেরঙ্গা, কানখুশকি, ঘোড়ার নালের টুকরো জালকাঠি, কোরেক্স সিরাফের সিলকরা ফাইল, সিনেমা আর্টিস্ট কাজলের ফটো সাট্টার কাগজ, সিনেমার টিকিট, জাল রাবার স্ট্যাম্প, কত কি নানাকিছু। অথ তসবিখানাই নেই।

১১

পাঠক, আমরা এখন আর শফীউল্লার ম্যানেজার জিয়াদের তসবি উদ্ধারে অভিযানে যাব না। শাহনাজ সাত সকালে তার খালার বাড়ি লিচুতলায় ফিরে গেছে, সেখানে কী ঘটনা ঘটছে, সেই বাস্তব সত্য ঘটনায় আমরা এখন যাব না সুবিধে মতো পরে যেতেও পারি, নাও পারি।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠল শফীউল্লা। স্নান খাওয়া দাওয়া করে নামাজ কালা পড়ল। তাকে খুব গম্ভীর ও নিশ্চুপ দেখা গেল। স্বাভাবিক। এত বছর বয়সে এত বছর পর যাহোক একটা বিয়ে করেছিল, সেই বিবি হোক না আধবুড়ি বিধ ও হতদরিদ্র, তাকে স্পর্শ না করেই, বিচ্ছেদ দিতে হয়েছে। এমন দুঃখী মানুষকে ঘাটানো চলে না। তাকে দুঃখযাপন করতে দেওয়াই উচিত। বাড়ির কাজের মেয়ে ফারজানা চা-নাস্তা খাবারদাবার দিয়ে গেছে তার তেতলার ঘরে। বাড়ির লোকজ এ কথা মনে করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে না সেজন্য।

দাদা শওকতউল্লা যে কিনা এই বিয়ের ঘোরতর বিরোধী, এই কদিন মনম ছিল, ব্যবসাপত্র দেখায় বিশেষ জোশ পাচ্ছিল না, সহসা এই বিবি বিচ্ছেদের সংবা মনে মনে প্রবল উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, কাজে দ্বিগুণ তার উৎসাহ ফিরে পেয়েছে

তার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী বন্ধুবান্ধব, রিস্তেদারদের সঙ্গে দাপটের স্বরে কোলাকুলি করতে শুরু করে দিল এই সাত সকালে। দু-চারজনকে অনাবশ্যক দাওয়াতও জানিয়ে দিল বাড়িতে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বের করে দিল বাজার করতে। এমনিতে প্রতিদিন গোস্ত আসে কষাইখানা থেকে আট কিলো করে। তার ওপর খাসির মাংস, মাছ, মুরগি, দই-মিষ্টির এক এলাহি ফর্দ তৈরি করে ফেলল।

শফীউল্লার তালাক দেওয়ার আচমকা সংবাদটা কিন্তু বাড়ির অন্তঃপুরের মেয়েরা গিলতে পারছে না। কেমন যেন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ঘিরে ধরেছে সবাইকে। অন্যদিনের মতো তারা নিজেদের মধ্যে যে স্বরে ও ভঙ্গিতে কথা বলে, তেমন ভাবটা আর আসছে না। কেউ কথা বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে। কেউ প্রথমেই তোতলাচ্ছে।

শওকতউল্লার স্ত্রী কিসমত ও বাড়ির কর্ত্রী। খুব একটা কথাই বলতে পারছে না। হাত থেকে এটা ওটা পড়ে যাচ্ছে। বড় পুত্রবধূ সাকিলা ঘটখটে শরীরে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকালীন সমস্ত কাজ সারল, এমনকী ফজরের নামাজ পর্যন্ত পড়ল, হঠাৎ করে তার কোমরের ব্যথা শুরু হয়েছে। এখন বিছানায় চুপচাপ পড়ে আছে। মেয়ে নাফিসার কানে ব্যথা শুরু হয়েছে এই সাত সকাল থেকে। আর ছোট মা নিগার বানুর তো প্রেসারের অসুখ। আজ আবার এমন প্রেসার বেড়েছে যে বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারছে না, মাথা তুলতে গেলেই বন বন করে ঘুরে উঠছে মাথা।

মেজ পুত্রবধূ পরভিন বলল অন্য উপসর্গের কথা, তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অন্দরমহলের বাতাসে শ্বাস নিতে পারছে না, ভারি ভারি লাগছে, যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। শাশুড়িকে বলেছিল, বাপের বাড়ি যদি যেতে পারত! শাশুড়ি তার কথার গুরুত্ব দেয়নি, গুরুত্ব দেওয়ার কথাও নয়। যেতে হলে যায় অনেক অনেক দিন পরে বাপের বাড়ি, তাও ছুতোনাতায়। আর আত্মীয়দের বাড়ি যায় বিয়ে শাদি মোছলমানি পানচিনি নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে। তাও নিজেদের গাড়ি করে বোরখা পরে। সে সব জায়গায় যাওয়ারও কোনো অনুষ্ঠান এই মুহূর্তে নেই।

কাজের মেয়ে ফারজানা একটা কাচের গেলাস ভেঙেছে সাত সকালে। মাঝে মাঝেই কিসমতের গায়ে তার পা লেগে যাচ্ছে, আর সে সালাম করছে। এক অস্বস্তির মধ্যে আছে সেও।

বাড়ির পুরুষরা যথারীতি কাজে কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাঁড়ি কাঁড়ি শুধু বাজার পাঠাচ্ছে শওকতউল্লা। কিসমত মনে মনে বলছে, এসব অন্যায়, এতসব বাজার সামলাবে কী করে, কী করে এতসব পদ রান্না করা সম্ভব হবে? যেন বাড়িতে আজ কোনো মহোৎসব। চুপ করে থাকাই তার স্বভাব, চুপ করেই থাকে।

শফীউল্লাকে একা থাকতে দেওয়া হচ্ছে। তার তেতলা ঘরে খাবার দাবার এটা ওটা যাচ্ছে। কিন্তু শফীউল্লা মনের কী রকম অবস্থায় আছে বাড়ির লোকজন জানতে পারছে না। কী এমন ঘটনা ঘটল যে স্পর্শ না করেই নতুন শাদি করা বিবিকে শফীউল্লা তালাক দিতে বাধ্য হল?

শফীর প্রতি আর্দ্র হয়ে ওঠাই তাদের কর্তব্যবোধ। ওভাবেই থাকতে দেওয়া হোক শফীকে, শওকতউল্লা এই নির্দেশ পঠিয়েছে বাইরের ঘর থেকে অন্দরমহলে। বাড়ির মেয়েদের রান্নার আয়োজন করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

অথচ এই বিচ্ছেদের পেছনে মাত্র একটি তসবি জড়িত। কী সেই তসবির রহস্য? সেই রহস্যময় কিস্‌সাই তাদের জানা হচ্ছে না। অথচ বিচ্ছেদ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তারা নানা রকম অসুবিধেয় কাটাচ্ছে। রাতে জিয়াদকে জুতো পেটার শব্দ শুনেছিল, সকলে মনে করেছিল, ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে শফীউল্লা কোনো গরমিল করেছে, তা নিয়ে মারধর করছে উগ্রচণ্ড মানুষটা। কিন্তু ভোরবেলা তেতলা থেকে বেরিয়ে শাহনাজের গালমন্দ করতে করতে চলে যাওয়ার ঘটনা তারা সবাই বিস্ফারিত চোখে রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তায় দেখেছে। এই দেখার পর থেকে কিছু জটিলতা ও বেশ কিছু প্রশ্ন মনে মনে তৈরি হল তাদের। কিছু দ্বিধা আর কিছু সাংসারিক নিরুৎসাহে মন ভরে উঠল তাদের। যেন তারা সুখী নয়। যেন তাদের মনের সমস্ত ভার দেহ বইতে পারছে না।

শওকতউল্লার বড় পুত্রবধূ সাকিলা মেজ জা পরভিনের মতো শিক্ষিত নয়। কিন্তু তার স্বভাবগুণ হল, যেমন সে সরল, পেটের কথা বলে ফেলে, তেমনি ঠোঁট কাটা। সত্যি কথায় বন্ধু বিগড়ালেও সত্যি কথা বলে দেয়। সংসারে তার কথা নিয়ে ছোটখাটো অশান্তি মনোমালিন্য লেগেই থাকে। কারুর সঙ্গে তার কথা বন্ধ থাকে দু-চারদিন। কারু কথা নিয়ে এমন সব মন্তব্য করে ফেলে, ভজানা-ভজানি, কসম কিরে, মসজিদে ওঠাউঠি, ছেলের মাথায় হাত দেওয়া, পবিত্র কোরাণ শরিফ স্পর্শ করা, এসব ঘটনা প্রায়ই ঘটে সাকিলাকে নিয়ে। এসব ঘটনার মীমাংসা পুরুষরা জানে না, বাড়ির মেয়েরাই মেটায়, মেয়েদের এক্তিয়ারেই থাকে সবকিছু।

সন্ধেবেলা এল শাহনাজ। সেই সাকিলাই শাহনাজের সঙ্গে আপন করে মিশেছে বেশি। শাহনাজের অনেক পেটের কথা টেনে বের করেছে। কে কী কী পদ রান্না করতে পারে, কে কী কী পিঠেপানা বানাতে পারে তার একটা বিনিময় করেছিল নিজেদের মধ্যে। আজ এটা খেতে সাধ যাচ্ছে এ কথা সংসারে সাকিলাই বলে থাকে। শাহনাজ আসার পর থেকেই কতকগুলো খাবার দাবারের প্রতি সাধ তৈরি হয়েছিল সাকিলার, সকালবেলা শাহনাজ চিরকালের জন্য চলে যাওয়ার পর কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে যায় সাকিলা। সকাল থেকেই কোমরের ব্যথায় ছটফট করছে। শাহনাজ চলে যাওয়ায় মনে আঘাত পেয়েছে দারুণ।

পরভিনের চাশশ্বশুর এই বয়েসে বিয়ে করেছিল আচমকা, সেটা একটা এ সংসারে গোলোযোগই বটে, কিন্তু শাহনাজকে মারুতি করে জিয়াদ ম্যানেজার ও তার বিবি এ বাড়িতে তোলার পর বেশ মজা পেয়েছিল পরভিন। ওদের দুজনের সংসার কেমনভাবে হবে তার প্রতি যেমন জন্মেছিল কৌতূহল, তেমনি মজা পাওয়া হবে। শাহনাজ আধবুড়ি বয়েসে বউ সেজে এসেছে। আর তাদের যে শ্বশুরমশাই কোনো মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাত না তার বউয়ের প্রতি কী ধরনের

্যবহার করবে, তার চেহারাটা কেমন হবে, এইসব রহস্য ঘনিয়ে উঠবে সংসারে, এমনটা আশা করেছিল পরভিন। আর কী আছে সংসারে, শুধু তো রান্না খাওয়া, আর কিছু নেই। এমন একটা ব্যাপার ঘটতে থাকলে একটু বৈচিত্র্য আসত এই বদ্ধজীবনে। কিন্তু সেই ঘটনার তো আর কোনো আশা নেই।

কিন্তু বউ বাড়িতে নিয়ে এসে হঠাৎ করে তালাক দিয়ে ফেলার এই পাগলামো বা খামখেয়ালিপনা অত্যন্ত ভয়ংকর। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে পরভিনের। তার মনে হয়, এ বাড়ির সমস্ত পুরুষমানুষদের মাথায় কিছু না কিছু ছিট আছে। এমন কি তার স্বামী আশিকেরও। যদি মানুষ পুরো পাগল হয়, তার একটা মানে আছে, সামান্য কিছু পাগলামোতে আক্রান্ত হয়ে এমন কিছু আচরণ করে বসে প্রকৃতিস্থ মানুষের পরিচয়ে যে প্রকৃতিস্থ মানুষের সংজ্ঞাই বদলে দেয়। তার অন্যতম উদাহরণ শফীউল্লার বিয়ে করা ও বিচ্ছেদ দেওয়ার পূর্বাপর ঘটনাবলি। যদি বিচার করা যায় সে সব ঘটনাবলি আকাট পাগলামিই বলতে হবে।

পরভিনের কেমন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অন্তঃপুরে থেকে ফুসফুস ভরে পুরো বাতাস নিতে পারে না। বুকের ভেতর থেকেই একটা বাধা তৈরি হচ্ছে, স্বেচ্ছাবিরোধ যেন। হাঁটে, চলে, কাজ করে, কথা বলে কিন্তু শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

শাহনাজের আগমনের চেয়ে তার চলে যাওয়া, ঘটনা হিসেবে অনেক বেশি চাঞ্চল্যকর, অনেক বেশি মর্মান্তিক, অনেক বেশি অপমানজনক। তার কারণ কী, সেই কারণের পেছনে যুক্তি কী, কেউই সে-সব জানে না, কেউই সে সব জানার জন্য প্রশ্ন করছে না শফীউল্লাকে। তাই বুঝি বাতাসের ভার বাড়ে অন্তঃপুরে।

কিন্তু প্রশ্ন করবে নিগারবানু। যত তাড়াতাড়ি জেনে নিতে পারে শাহনাজকে তার তালাক দেওয়ার কারণ ও যুক্তিগুলি, তত তাড়াতাড়ি মনের প্রলয় থেমে যাবে। যে মেয়েকে বিয়ে না করলে শফীর পাপ হত এ কথা স্বীকারোক্তি দেয় যে শফী, সেই শফী কী কারণে তাকে তালাক দেয়? যে এত বছর বয়সের মধ্যে কোনোদিন বিয়ে করতে চায়নি, তার বিয়ের ব্যাপারে বাড়ির সমস্ত আয়োজন ভেস্তে গেছে, সেই শফী এমন একটা বিয়ে করে ফেলল, তারপরও তাকে তালাক দিয়ে বসল, তার ভেতর শফীর কোনো খামখেয়ালিপনা কাজ করছে না তো? এসব নিয়ে শফীর সঙ্গে বোঝাপড়া তাকেই করতে হবে। শফী তার আদরের সন্তান, তার কোনো অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেলে তার কোনো বিপদ সইতে পারবে না নিগারবানু। যদি সত্যিই শফীর কোনো অপরাধ থাকে, সেটা জেনে নিয়ে তাকে শাসন করা দরকার, তাকে বাড়তে দেওয়া যাবে না। শফীকে রক্ষা করার সদিচ্ছা নিয়েই শফীর সঙ্গে কথা বলতে হবে প্রথমেই। সৎ বড়ভাই শওকতের সঙ্গে বিবাদ হোক, চায় না নিগারবানু।

কিন্তু নিগারবানু মাথা তুলতেই পারছে না। প্রেসারের ওষুধ খেয়েছে, অপেক্ষা করছে, কখন একটু ভাল হবে, তখনই শফীর তেতলায় শফীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

শফীউল্লার তালাকের নাটকে একটা তসবির ব্যাপার আছে, এই ঘটনার সঙ্গে

একটি মাত্র তসবি জড়িত। ফলে লোকজন এক বিশ্বাসযোগ্যতা পাচ্ছে তালাবে
ক্ষেত্রে। কিন্তু তসবিখানার কী কাহিনী সে ব্যাপারে কিছু জানছে না, কিছু অনুমানে
ভিত্তিতে কিছু তসবি সংক্রান্ত কাহিনী লোকমানসে প্রচারিত হতে থাকে। স
ঘটনা নয়, মিথ্যা ঘটনায় মোড়া সে কাহিনী। জিয়াদ যে কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভা
জড়িত, সেই জিয়াদের কাছ থেকে তসবিসংক্রান্ত কোনো গল্পই উদ্ধার করা
পারছে না লোকসমাজ। জিয়াদকে প্রশ্ন করা হলে জিয়াদ শুধু অব্যক্ত স্বরে ছাগলে
মতো ব্যা ব্যা করছে। কথায়, ভাষায়, সে গল্প ব্যাখ্যান করতে পারছে না।

একটা গল্প চালু হয়েছে, তসবিটা সামান্য কিছু নয়, মক্কার কাবা বা আজমি
এর পবিত্র কোনো কিছুর স্পর্শপূত, বিবি সেই তসবিখানা হাতে নিয়ে স্বামীগৃ
প্রবেশ করবে। সেই আদেশ অমান্য করেছে বিবি। তসবিটাকে অবহেলা করে
অযত্নে কোথায় রেখে দিয়েছিল, ব্যস তসবিখানা গায়েব হয়ে গেছে, যে-সে তস
নয়, তার অনাদর করা হয়েছে বলেই শাহনাজ বিবির কিসমত থেকে সরে গে
কোথায় যে গায়েব হয়েছে, আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জিয়াদ ম্যানেজার ত
খোঁজে জুয়োর আড্ডা ও শুঁড়িখানার ঠেকে পর্যন্ত গেছে, তবুও পাওয়া যায়নি
যে সে স্পর্শপূত সামান্য তসবি নয় সেটা, তাই তাকে ধরে রাখা যায়নি। বিবি
সঙ্গে বসবাস যে মঙ্গলজনক হবে না, পরলোককে যে বিনষ্ট করবে তার এ
পূর্বাভাস পেয়ে যায় শফী, এই তসবির গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনার ভিতর দিয়ে
আর তসবিখানা ঠিক ঠিক ইস্তেমাল করা হয়নি বলে, শিখিয়ে পড়িয়ে দেও
জিয়াদ ম্যানেজারের ওপর অমন চটে গিয়েছিল, সেজন্যই অমন ক্রোধান্বিত হ
জুতোপেটা করেছে। যে ভুলের জন্য সদ্য বিবাহিত প্যারের বিবিকে ছাড়তে হয়ে
যে ভুলের জন্য অমন পবিত্র ও মূল্যবান তসবিখানা বেহাত হয়েছে, সেই অপ্রা
ও প্রত্যাখ্যানের নিরুপায়তার ক্রোধে জিয়াদকে জুতোপেটা করেছে। তার কোন
দোষ নেই এই বিচ্ছেদে।

শফী এখন দুঃখে শোকে বিরহে বেদনায় তার তেতলা ঘর থেকে বেরতে পার
না। বড়ই আঘাত পেয়েছে সে। এমন একটা বিচ্ছেদ তার ভাগ্যে লেখা ছি
যার বেদনা অসহনীয়, যার শোকে মুহ্যমান।

শফীউল্লা ভাবল, বেশ তো সেই মিথ্যে ঘটনার অনুভবে থাকা কি এমন খারাপ
বেশ বিরহ বিচ্ছেদে থাকা যাবে। একা একা তেতলার ঘরে পড়ে থাকার নতু
অভিজ্ঞতা লাভ করবে। যে অনুভবে শাহনাজের বেদনায় কাতর, কষ্ট পাচে
তার চোখে ঘুম নেই, পেটে খিদে নেই। কারবার দেখছে না, পরিচিতদের আড্ড
মজলিশে যাচ্ছে না। তেতলা থেকে নেমে আসার ইচ্ছেটুকুও তার নিঃশেষি
হয়েছে। অমন সাধের বিবিকে সে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে? আহা, এই বিচ্ছেদে
বেদনা সইবে কী করে শফীউল্লা। হায় হায় শাহনাজ, হায় হায় শাহনাজ, বুক চাপ
কাঁদছে শফীউল্লা। একা একা অশ্রুপাত করে চলেছে।

এমন অনুভবের মিথ্যার ভিতর থাকতে তার ভালই লাগছে। নিজেকে নি

থ্যা সব ঘটনা। যে বিবিকে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে হায়! সেই বিবি বিচ্ছেদের দনায় সে মরে যাচ্ছে। কোনো কিছুতে তার সুখ নেই?

'শফী। কী হয়েছে?'

মায়ের কণ্ঠস্বর পেছনে, চমকে ওঠে শফী। কিন্তু সে তো বিরহকাতর একজন প্রমিক, তার পক্ষে চাঞ্চল্য দেখানো সম্ভব নয়। তেমনই পালঙ্কের ওপর লম্বা য়ে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। তেমনই শান্ত, ভারাক্রান্ত।

কাছাকাছি আসে, কিন্তু একটু তফাৎ নিয়ে দাঁড়ায় নিগারবানু। 'কী হয়েছে?'

'মা!' এতক্ষণ যেন কোনো কথা শুনতে পায়নি, মা এসেছে এই মাত্র বুঝতে পরে আর্দ্রহৃদয়ে তাকিয়েছে।

'আমার কথার ঠিক ঠিক উত্তর দিবি শফী?'

'বল মা!'

'কী ঘটেছিল যে বিবিকে তালাক দিলি?'

'আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল ওকে বিয়ে করে।'

'কীসের ভুল?'

'আমি মহা ভুল করেছিলাম, ওর সঙ্গে সংসার করলে আমার পাপ হত।'

'কী সে পাপ, আমাকে বল।'

'আমি বলতে পারব না। তুমি আমার মা যে, তোমার সামনে কি ওসব কথা'—

'লোকে কী জানবে, কেন তুই তাকে তালাক দিয়েছিস?'

'সে এমনই, সে আমার স্ত্রীত্বে থাকলে আমাকে পাপের পথে নিয়ে যেত!'

'এত দূর সে মেয়েমানুষ? বাইরে থেকে দেখে তো কিছুই বোঝা যায় না!'

'হ্যাঁ সে যে কী ক্ষতিকারক ছিল আমার জীবনের পক্ষে'—

'তাহলে তো ঠিক করেছিস'

'তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিনি, তার আগে তাকে তালাক দিয়েছি।'

'আল্লা যা করে ভালই করে, ওসব ভুলে যা।'

'ভুলব কী করে সেই তাকে?' বেদনার ভাব নিয়ে কথাটা বলে ওঠে শফী।

'শান্ত হ, শান্ত হ'

'কী করে শান্ত হব মা। কালকে তাকে দেখার পর তার প্রেমে পড়ে গেছি।'

'শান্ত তো হতেই হবে।'

'না আমি যা চাই আমাকে আমার পথে এগিয়ে যেতেই হবে।' তার মানে তাকে, শাবানাকে বিয়ে করার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

নিগারবানু ভাবল, শফী তার দুঃখের ও বিরহের বিষণ্ন জীবন্মৃত পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছে। 'ভুলে যা তাকে।'

'কিছুতেই ভুলতে পারব না তাকে।'

'ভুলতেই হয় সংসারের নিয়ম। শান্ত হ বেটা।'

'আমাকে আমার ব্যবস্থা করে নিতে হবে।'

'সময় পেরিয়ে গেলে সব ভুলে যাবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'না ভুলে যেতে পারব না।' তার পথ সে সাফ করেছে, শাবনাকে বিয়ে করা আর কোনো বাধা নেই, যত তাড়াতাড়ি পারবে বিয়ে করে নেবে। তাকে ভুলবার কোনো প্রশ্নই নেই। কী করে সে বিয়েটা সম্ভব হবে সে কথাই ভা সে।

১২

শাবানাকে পাওয়া নিয়ে তার ভবিষ্যতে বিস্তর প্রতিকূলতা বিরুদ্ধতার ঘটনা পেরি যেতে হতে পারে। পাওয়া নিয়ে তার আকুলতাও এক সত্য ঘটনা হবে। সমা তার জন্য কত বিরোধিতা ওৎ পেতে আছে, কতখানি সে কাতর উদ্যোগী হ উঠবে সে ব্যাপারে, এখন সেসব ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না শফী। কি মা ও মেয়ের একই ব্যক্তি স্বামী হয়ে উঠছে, এই ঘটনা সমাজের চোখে খুব ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য আপাতদৃষ্টিতে, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে তার ন্যায্য ও পবি বিধান আছে, তাই এক সংঘর্ষ ঘটবেই। মাকে বিয়ে করার পর মেয়েকে আবা বিয়ে করছে, সমাজমানসের বিরুদ্ধ ধারণা নিয়ে তো আর তার চললে হবে ন তাকে ধর্মের পথে যেতে হবে। মাকে বিয়ে করেছে, তারপর আবার মেয়েকে বি করছে, এই ঘটনা তো এই মুহূর্তে ঘটছে না, বা আজ ঘটছে না, তাই তার সমাজে অন্ধবিরোধ এখনই প্রত্যাসন্ন হয়ে ওঠেনি শফীউল্লার সামনে। তাই সে সব নি তার দুশ্চিন্তা না করলেই চলে। বরং মিথ্যে ঘটনায় যেতে তার ভাল লা ভালবাসছে। যে ঘটনা কোনোদিন ঘটছে না, ঘটবে না। বেশ চনমনে মেতে থা যায়। কেমন সত্যি সত্যি শিহরন আসে। সেই কল্পঘটনায় কি সুন্দর সৎ ন্যায়পরা দায়িত্বশীল থাকা যায়।

সেই শিশু, সেই শিশুটি নিয়ে শাহনাজের আগমনের রাতে তাকে কোলে-পি নিয়ে, তার সঙ্গে খেলাধূলা করে কেটেছিল শফীর। তারপর এমনভাবে ভাব তারপর তো কী হল শিশুটির, সকলের তো সব জানা!

অনেক রাত পর্যন্ত মায়েরও কোনো খেয়াল নেই, তার কোলের শিশুটি বাড়ি কোথাও নেই। অথচ সে যে শ্বশুরের কাফন দাফনে গোরস্থানে শিশুটিকে নি গিয়েছিল, সে খেয়াল তার ছিল না। কেন না একবার তার কোল থেকে শিশুটি তার ননদ নিয়েছিল। আর সে কারণেই তার মনে এই মিথ্যে ধারণা বদ্ধমূ হয়েছিল, শিশুটি তার কাছে নেই, তার দায়িত্বে নেই। না হলে জা ননদ আত্মী প্রতিবেশী মহিলাদের সঙ্গে গোরস্থানের চাতালে বসে কেঁদেছে, নানা কথা বলেছে কোলের ঘুমন্ত শিশুটিতে যে চাতালে শুইয়ে দিয়েছে সে খেয়াল ছিল আনারকলির। খোকা সাঈদ তার সঙ্গে নেই মনে করে তাকে কোলে নিয়ে থেকে

ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে বুকের দুধ দিয়েছে, সে তার কোলে নেই মনে করে আত্মীয় প্রতিবেশী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছে, কেঁদেছে। তারপর অন্ধকার চাতালে ঘুমন্ত অবস্থায় সাঈদকে ফেলে রেখে চলে এসেছে নারী মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে।

সাঈদ বাড়ির ভেতর কারুর কোলে বা কোনো বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে হয়তো। মৃত্যু বাড়িতে অনেক লোকজন, যেভাবে সচরাচর বাড়িতে কাটে, তেমনটা আজ আর নেই। অনিয়ম তো ঘটবেই, বাড়িতে এত মানুষ, সাঈদকে কোলে নেওয়ার লোকের অভাব নেই। সে যদি ঘুমিয়ে যায় কারুর একটা বিছানায় তাকে শুইয়ে দেওয়ার অভাব নেই। আর তাদের মৃত্যু বাড়ি, রান্না করা খাবার প্রতিবেশী বাড়ি, আত্মীয় বাড়ি থেকে আসছে, আত্মীয় প্রতিবেশীরা তাদের সেধে খাওয়াচ্ছে, খাইয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সেই যে সকাল থেকে শ্বশুরমশাইয়ের টাল খাওয়া শুরু হল, তারপর ডাক্তার ওষুধ ইঞ্জেকশন করতে করতেই বেলা দশটায় মারা গেল। তারপর আত্মীয়দের খবরাখবর, তাদের আসা, কান্নাকাটি। গোরস্থানে কবর দিতে নিয়ে যেতে সেই বিকেল হয়ে গেল। সবে সন্ধ্যা। সেই সময় কবর দিয়ে ফেরা হল। সেই সকাল থেকেই ধকল যাচ্ছে। তারপর তো এক একজন করে মানুষজন আসছে, নতুন করে কাঁদতে হচ্ছে। রাতের বেলাও কেউ কেউ আসে, নতুন করে আবার কান্না শুরু করতে হয়, নতুন করে কান্নারোল পড়ে আবার বাড়িতে। এত কিছুর জন্যই তো সাঈদ একটা সময় তার কাছে নেই, সে কোথায় আছে খোঁজ নেওয়া, এসব কোনো কথাই তার মনে পড়েনি।

অথচ সেই শিশুকে অত বড় গোরস্থানে একা ফেলে চলে এসেছে। শিশু ঘুমিয়ে গেছে সিমেন্টের চাতালে। সেই দুর্ঘটনার কথা মাও জানতে পারে না। আত্মীয়দের সঙ্গে কান্নাকাটিতে কাটায়, তাদের ব্যাখ্যান দেয়, শ্বশুরের মৃত্যুর আগে কী কী ঘটনা ঘটেছিল, সে-সব আনুপূর্বিক ব্যাখ্যান যে নতুন করে আসছে, তাকেই দিতে হচ্ছে।

সাড়ে বারোটার সময় ক্লান্ত শরীরে যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে। ভাশুরের ঘরে দুই ননদাই, ভাশুর, এক দেওর শুয়েছে। ছোট দেওরের ঘরে তার স্বামী দেওর আরও সব পুরুষ আত্মীয়রা শুয়েছে। তাদের ঘরটায় একদল মেয়ে শুয়েছে। তার মধ্যে আনারকলি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটু পরেই ঘুমের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে, সাঈদ পেচ্ছাপ করেনি তো, কোলের কাছে হাত দিয়ে খুঁজতে গিয়েই পেল না। ভাশুরঝি ননদঝি ননদাইয়ের বোন এরা যারা কমবয়সীরা বৈঠকখানা ঘরে শুয়েছিল, মনে করেছিল, তাদের কাছে সাঈদ শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। এমন নিশ্চিন্ততা ছিল আনারকলির অনুমানে। কিন্তু একটু-ঘুমের তন্দ্রার ভেতর আশঙ্কা জড়িয়ে ধরল জননীর মনকে।

তারপর রাত একটা নাগাদ ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বৈঠকখানার ঘরে গিয়ে

সাঈদকে খুঁজেছে, পায়নি। একটার পর একটা ঘরে গিয়ে খুঁজেছে। দেওরের ঘরে খুঁজে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কুক দিয়ে কেঁদে উঠল আনারকলি।

দেওর উঠল, স্বামী উঠল, তারা খোঁজাখুঁজি করল সাঈদকে। পাশের ঘরে তার খুঁজতে গেলে ভাশুর উঠল ননদাইরা উঠল। সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা চলতে লাগল, সাঈদ কোথায় থাকতে পারে! কোনো আত্মীয় এসে নিয়ে গেছে কিনা? আনারকলির মা এসেছিল ট্যাক্সি করে তার জাকে সঙ্গে করে, ট্যাক্সি করেই ফিরে গেছে, ফিরে যাওয়ার সময় নাতিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে কি? যারা দেখেছে তারা সাক্ষী দিল, না নিয়ে যায়নি। তবে গেল কোথায় সাঈদ? ছোট জা বলল 'নিয়ে তো গেছলে তুমি গোরস্থানে।'

আঁক করে ওঠে আনারকলি, আর সে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে। জল, হাতপাখা কানে ঘোরানোর জন্য পালক খোঁজাখুঁজি, দাপাদাপি, হুলস্থুল কাণ্ড। শিশু সাঈদকে গোরস্থানে ফেলে রেখে সকলে ফিরে এসেছে। সে ঘটনা ঘটেছে সন্ধে সাতটার সময়, এখন রাত একটা দেড়টা।

তক্ষুণি একটা দল বেরিয়ে পড়ল শিশু উদ্ধারের অভিযানে। তাদের মধ্যে মেয়েদের একটা দলও ছিল। আনারকলিকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তার ছোট জা আর মেজ ননদ। তারা আনারকলিকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তার শিশুর কিছু হবে না, কেন না শিশুরা সব আল্লার ফেরেস্তা, ফেরেস্তারা বিপদ থেকে ঠিক উদ্ধার পায়। গোরস্থান তার কাছে ফুলের বিছানা হয়ে গেছে এখন।

দু-চারবার পুলিশ আটকালো এই দলটাকে। কিন্তু দলটা অপ্রতিরোধ্য, পুলিশের বাধা ডিঙিয়েই এগিয়ে গেল। ডিফেন্স পার্টি সামনে পড়ল, তাদের কাছে শিশুর খোঁজ করল। এমন অদ্ভুত ঘটনায় তারা অবাক হল। একদল নারী-পুরুষ রাতের মেটিয়াবুরুজে রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে, এ দৃশ্য অদ্ভুত মায়াবী, অলৌকিক। যেন এরা কোনো মানব মানবী নয়। যেন এরা সবাই মৃত সময়ের মানুষ, অনুপ্রবেশ করেছে মেটিয়াবুরুজের অধুনা জীবনে। যে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্চে, সে পথকে দিন করে তুলছে। ঘুম ভেঙে যাওয়া মানুষ ঘরের জানালা দিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখে যেমন করে দেখে টিভি সিরিয়াল, সিনেমা, যে সবের সঙ্গে তাদের জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ নেই, তেমন ভঙ্গিতে দেখে। যেন অবাস্তব এ ঘটনা। মেটিয়াবুরুজের বাড়ির লোক-ব্যতিরেকেই দলটার একটা নিজস্ব উদ্যোগ আছে, ক্রিয়া আছে, স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে, আত্মনির্ভরতা আছে। এক বিচ্ছিন্ন স্বকীয়তায় তারা পথ দিয়ে হেঁটে যায় মেটিয়াবুরুজের জানালায় জানালায় টিভি স্ক্রিন হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হলে দেখ, না হলে জানালা বন্ধ করে দিলেই দেখা রোধ করা যাবে।

গোরস্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি করা গেল। না কোথাও নেই। অনেক কবর পর্যন্ত খোঁজা হয়ে গেছে। যেসব কবরের মাটি ধসে ধসে গর্ত হয়ে গেছে এক হাঁটু পর্যন্ত সে সব গর্তে কোনোভাবে যদি শিশুটি গিয়ে পড়ে, টর্চ জ্বেলে জ্বেলে খোঁজা হল

ই, কোথাও নেই। শেয়ালেরা যদি ধরে নিয়ে গিয়ে কোনো ঝোপে ঝাড়ে খায়, ।-সব সম্ভাব্য জায়গাগুলো খোঁজা হল, নেই, না নেই। পরে সেই চাতালে এক াড়া জুতো পাওয়া গেল, সেই জুতো জোড়া বুকে জড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদতে ।গল আনারকলি সেই মিথ্যা ঘটনায়। সেখানে সাঈদ নেই, না নেই।

সেই মিথ্যা ঘটনায় গোরস্থানের আশপাশের ঘর বাড়ির মানুষ জনের সেই ান্না ও কথোপকথন আজগুবি, অলৌকিক মনে হল। মনে করল, মৃত মানুষদের াত্মার হাট বসেছে। তারা যেন কোনো মৃত সময়ের অকাঙ্ক্ষা ও আশাহত বেদনা য়ে উপস্থিত হয়েছে রাতের জনহীন গোরস্থানে।

কারখানার রাতের শিফট থেকে কেউ কেউ ফিরছিল, তাদের কারুর কারুর ঙ্গে দেখা হয়ে যায় মেটিয়াবুরুজের পথে। তখন তাদের মুখ থেকে জানতে পারে, াতের পথে একটি শিশুকে কাঁধে করে কে একজন ঘুরে বেড়িয়েছে। যে পথে খা গেছে সেই পথের কথা বলে দিল। দলটা হেঁটে হেঁটে সে পথে যায়, হাঁটে। । যে পথে শিশুকে নিয়ে হাঁটতে দেখা গেছে, সেই সেই পথে দলটা হাঁটার অনুষ্ঠান রে যায়।

তারপর খোঁজ করে কে তাকে কাঁধে নিয়ে মেটিয়াবুরুজের পথে পথে হেঁটেছিল? া দেখতে কেমন, রোগা না মোটা, লম্বা না বেঁটে, কালো না ধলো, গরিব না নী? বিরল পথচারীদের মধ্যে একজন দলের সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি ল। সে জানাল, সেই লোকটির নাম শফীউল্লা।

অতএব ভোর তিনটের সময় তারা দাঁড়াল সেই তিনতলা বাড়ির সামনে। নীচে থকে নাম ধরে ডাকা হল 'শফীউল্লাভাই' বলে। তারপর সাড়া মিলল। তেতলা থকে নীচের কথোপকথন চলল।

আনারকলির মেজ ননদাই হাঁকল, 'শফীউল্লা ভাই, আপনি কি কোনো শিশুকে ড়িয়ে পেয়েছেন?'

পাল্টা প্রশ্ন শফীর, 'আপনারা কারা? এ কথা শুধোচ্ছেন?'

'আমরা সেই শিশুর বাড়ির আত্মীয়রা।'

'কোন শিশুর?'

'যে শিশু হারিয়ে গেছে।'

'যে শিশু আমি কুড়িয়ে পেয়েছি, সে শিশুর যে আপনারা আত্মীয় তার প্রমাণ তক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ আপনারা এই শিশুর আত্মীয় নন, আমার কাছে ফালতু য়ে উঠবেন আপনারা।'

'আমরা আমাদের শিশুকে চিনতে পারব।'

'তাহলে হবে না, শিশু আপনাদের কাউকে চিনতে পারলে তবে হবে। আসুন, ততলায় উঠে এসে তবে নিয়ে যান।'

ননদাই বলল, 'আমি খালু হই, আমাকে চেনে।'

বারান্দায় গ্রিল ধরে মাথা ঠেকিয়ে সাঈদ তখন নীচের জটলার দিকে তাকিয়ে আছে। সে দলের মধ্যে তার মাকে চিনে ফেলে। চেঁচায়, 'মা, আমি এখেন দিয়ে মুতব?'

'সাঈদ, সাঈদ' করে ওঠে আনারকলি। 'ওরে তুই যে আমার জানে জিগর রে' বুক চাপড়ে কেঁদে ওঠে আনারকলি।

শাহ্‌নাজ ঘরের বিছানায় লজ্জাবনত ভঙ্গিতে বসেছিল, শিশুর এই কথায় হেসে ফেলে। তারপর সেও বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে থাকে সব কিছু।

আনারকলি এল, তার কাছে সাঈদ গেল। কোলে জড়িয়ে ধরল আনারকলি। আনারকলি বলল, 'আপনি আমার দাদা, মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও বাড়া। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন।'

'সবই আল্লার হুকুম বহিন।'

'আজ থেকে আপনার আমি বোন হলাম, বলুন কোনোদিন আমাকে ভুলবে না?'

'না। তুমি তো আমার বোন, তাই না?'

'হ্যাঁ। বোনের কাছে নিয়মিত যেয়ে যেয়ে খপর নিতে হবে। মোর সুনাদাদাকে চোখ ভরে দেখব মুই। যেও গো দাদা—আচ্ছা, তালে একটা শুলুক দিয়ে যাই শুলুক ভেঙে আরও নতুন শুলুকের টানে যেও।

"দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায়।।
মরণে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ হে পণ্ডিত ভাই সভামাঝে বৈসে।।'

চলি গো দাদা, শুলুকটা ভেঙে দিতে যেও, হেঁর লতুন শুলুক পাবে।'

অদ্ভুত এক শুলুক পেল, শুনল শফীউল্লা। কি ভাল এই শুলুকটা। তার চেয়ে ভাল, শুলুক দিয়ে তাকে সম্পর্কে বাঁধা। তার চেয়ে ভাই বোনের সম্পর্কের মিথ্যা ঘটনাটা কম ভাল নয়। সে মজে ওঠে মেতে ওঠে জেগে ওঠে শুলুকের ভিতর অদ্ভুত বিমোহিত ভাব তার, অদ্ভুত সম্পর্কের আনন্দে চনমনে হয়ে উঠেছে।

১৩

কদিন যেন? সাতদিন। সাতদিন ধরে ভাবল বহিনের দেওয়া শুলুকটার কথা শুলুকটার মানে খুঁজতে কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, কখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কখনও গাছের দিকে তাকিয়ে গাছের পাখির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কখনও পথ দিয়ে যেতে যেতে মগ্ন হয়ে ভাবতে লাগল; কখনও কারবারের হিসেব বুঝে নিতে নিতে শুলুকটার মানে ধরবার জন্য ভাবতে লাগল। শুলুকটার মানে ধরতে পারলেই

াজই সে চলে যাবে বহিনের বাড়ি দেখা করতে। সেই আশ্চর্য শিশুটির মা, বহিন ানারকলি।

বাড়িতে হয়তো কেউ তার খোঁজে এসেছে, বাড়ির লোক হয়তো বলল, সে গছে মালিপাড়ায় বহিনের বাড়ি। শফীউল্লার সঙ্গে বহিনের এই সম্পর্কের সংবাদ বার জানা হয়ে গেছে, স্বাভাবিক এক ঘটনা। শফী প্রায় দিনই যায় বহিনের ঙ্গে দেখা করতে। সেই শিশুর সঙ্গে তার মোলাকাত হয়। এমন এক পবিত্র ও ধুর সম্পর্কের মধ্যে আছে শফীউল্লা। বহিন আনারকলি হয়েছে তার শুলুকবহিন। ার একটা করে শুলুকের অর্থ বলে আসে আর নতুন শুলুক নিয়ে ফেরে। নতুন ুলুকের কাটান খুঁজতে বুঁদ হয়ে থাকে। বেশ থাকা হয় তার।

এই ভাবনায় থাকার ফলে কতবার কত মজলিশ আড্ডা থেকে বেরিয়ে অন্যের টি পরে বেরিয়ে এসেছে, অন্যের চটি পরে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে, বুঝতেই ারেনি। খদ্দেরদের 'রোকরা' হাত-চিঠি স্টিলের আলমারিতে তুলে না রেখে কেট থেকে তুলে নিয়ে পাকিয়ে কতবার ভুলক্রমে কানে গুঁজেছে। রোকরা হল সই প্রমাণপত্র খদ্দের কত ডজন ধারে মাল নিয়ে গেল গোপন লেনদেনের পদ্ধতি। স-সব সংকেতে লেখা থাকে, 'আঠার ডজন কাঁচা লঙ্কা', এই টুকু লেখা থাকলেই বোঝা যাবে কোন সাইজের কত ডজন বাবাসুট নিয়ে গেছে সেই খদ্দের। পরের াটে সেই খদ্দেরের কাছ থেকে এই টাকা আদায় করা যাবে এই 'রোকরা' দেখালে। কিংবা গদিতে তাগাদায় পাঠিয়ে আদায় আনা যাবে। সেই রোকরা পাকিয়ে ভুলক্রমে ানে আরাম খায় পর্যন্ত শফীউল্লা, সেই বহিনের দেওয়া শুলুকে মজে থাকার ভিতর। পরে বুঝতে পেরে রোকরা সাবধানে তুলে রাখে আলমারিতে। রোকরার ংকেতগুলো অদ্ভুত রকম নাম দিয়ে হয়। যেমন আঠার ডজন আলপিন, চোদ্দ জন পেয়ারা পাতা, সাতাশ ডজন সর্ষে ইত্যাদি ইত্যাদি। রোকরার সংকেত এককে দ্দেরের এককে রকম। এক ধরনের চেক্ বলা যেতে পারে। কোনো খদ্দের হাটে া টাকা এনেছিল, সব খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু দরকার আরও কিছু মাল নেওয়ার। খন রোকরা লিখে দিয়ে মাল নিয়ে চলে গেল। পরের হাটে সেই রোকরা সেই দ্দরকে দেখালেই পেমেন্ট পেয়ে যাবে। আবার বাইরের পার্টি কলকাতার কোনো াটেলে উঠেছে, মাল কিনতে এসেছে। ক্যাশ টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করা বিপদ, । রোকরা লিখে দিল, সন্ধ্যায় তার হোটেল থেকে ক্যাশ আদায় করা যাবে। কে কেন পেমেন্ট করে না? উরিব্বাস সে মহা হুজ্জতি. সেলট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স নাতানার হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে যাওয়া।

তবে এই রোকরা কানে পাকিয়ে বাজে কাগজের মতো নর্দমায় ফেলে দিলে মন আট দশ হাজার টাকা নর্দমায় পড়ে যাবে, তার আর আদায় হবে না। শফীউল্লা মন একটা রোকরাকে পাকিয়ে কানে ঘুরিয়েছিল শুলুকের মানে খুঁজতে থাকার

খামখেয়ালিতে। কিন্তু তবুও মানে বার করতে পারছে না এত ভেবে ভেবে। এত ভেবে ভেবেও কিছুতেই উদ্ধার করতে পারছে না শুলুকের অর্থ।

ভাল মজা, শফী নামাজ কালাম করেছে, ব্যবসার হিসেব বুঝছে আর শুলকের মানে খুঁজছে সাতদিন ধরে। লোকে ভাবে শফীউল্লা বিশেষ কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন। খুব কঠিন সে চিন্তা, খুব কঠিন সে চিন্তার বিষয়, যা সাধারণের ভাবনার বাইরে। কিংবা তেমন কোনো কিস্‌সায় মেতে আছে, যা শোনায় সে মাঝে মাঝে চেনা অচেনা মানুষদের, সে-সব ধর্মের কথা ও কাহিনী সমাজ জীবনে প্রচলিত না সে শুলুকের মানে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে কোনো শুলুক অনেকবার ভাবলে অনেকবার আওড়ালে তবে তো উত্তরটা মাথায় আসে। শুলুকের মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে আছে। বহিন তাকে খুব সুন্দর আর কঠিন একখানা শুলুক দিয়েছে। সে তার বহিন, তার প্রতি কত স্নেহ শফীউল্লার। শফীউল্লার প্রতি বহিনের কত শ্রদ্ধা মাঝখানে শুলুক বলা ও উত্তর দেওয়ার সম্পর্ক তাদের। সে তো এই সাতদিন এই পবিত্র সম্পর্কের ভিতর খুঁজছে সে শুলুকের উত্তর। এই ভাবনায় থাকা মানে কত সৎ ও পবিত্র থাকা।

বার বার আওড়ায় শুলুকটা।

দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায়।।
মরণে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ হে পণ্ডিত ভাই সভা মাঝে বৈসে।।

উত্তর পেয়েছে। যে ঘটনায় এই শুলুক পেয়েছে, সে ঘটনা শফীর জীবনে ঘটেনি সেই শিশু নেই কোথাও, সেই শিশুর মা আনারকলিও কোথাও নেই। সেই শুলুক বহিন আনারকলি যে শুলুক দেয়, সে শুলুকও সত্য নয়, সেহেতু সমস্ত ঘটনাগুলি কল্পনায় ঘটে যায়, মিথ্যা, যেহেতু সেই মিথ্যা ঘটনার ভিতর বহিনের যে শুলুক তার উত্তরটা নিজেই পায়, যেহেতু কল্পনাটা তার, বহিনের শুলুক প্রশ্নটা তার সেই মিথ্যা ঘটনায় শুলুক বহিনের মুখে নিজেই শুলুকটা বসিয়েছে, সেহেতু শুলুকের সেই উত্তরও জানে। শুধু মিথ্যা ঘটনা বলে, সেই আশ্রয়ে চলে গিয়ে শুলুকের উত্তর খোঁজার ব্যাপারে সাতদিন পর্যন্ত ভাবছে, এই কালাতিপাতটা স্বেচ্ছায় গুঁজে দেয়। তখনই সাতদিন পর্যন্ত ভেবেও শফীউল্লা পায় না শুলুকের উত্তর। সন্ধ্যার সময় পেয়ে গেল তবে উত্তর। শুলুকের উত্তর, উনুন।

চলেছে সে শুলুক বাহিনের বাড়ি মিথ্যা ঘটনায়। চলেছে সে আর একটা শুলুকের প্রাপ্তিতে। বেশ মজে থাকা যাবে আবার একটা শুলুকের উত্তর খুঁজতে ভাববে, আর ভেবে ভেবে হয়রান হবে।

আনারকলি বহিনের বাড়ি যাওয়া হল সন্ধ্যায়। শুলুক বহিন এসে পায়ে সালাম করে। বাড়ির খবরাখবর নেয়। কারবারের কথা জিগায়। শফীর শরীর কেমন

ছিল সেসব শুধোয়। তারপর শরবৎ এনে খেতে দেয়। নিজে পান সেজে এনে খেতে দেয়।

সেই শিশুটি আসে। তাকে কখনও সে কোলে নেয়, কখনও জানুতে বসায়, কখনও শূন্যে তোলে, লোফে, কখনও কাঁধে বসিয়ে দোলায়। শিশুর সঙ্গে হাসে, কথা বলে, হাঁটা হাঁটা খেলায় মাতে। হাতে হাত ধরে হাঁটে।

শুলুকবহিন হাতের কাজ সারতে যায়। এক একবার ফিরে এসে দেখে যায়, দাদাভাইয়ের যাওয়ার সময় হল কিনা? যাওয়ার আগে তাকে আর একটা শুলুক দিতে হবে।

তারপর আসে শফীউল্লার ফিরে যাওয়ার সময়।

সামনে এসে দাঁড়ায় আনারকলি বহিন। একটু মচুকি হাসল। তারপর তার নতুন শুলুকটা বলতে শুরু করল।

"বিধাতার নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার।
তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহার।।
যখন পুরুষ-বর হয় বলবান।
বিধাতার সৃজন ঘর করে খান খান।"

নতুন শুলুক নিয়ে ফিরে গেল শফীউল্লা। মিথ্যা ঘটনার ভিতর আনারকলি বহিনের মুখের সামনেই উত্তরটা বলে দিয়ে আসতে পারত। কিন্তু তার মিথ্যা ঘটনার কল্পনা তো অন্যরকম। সে পারল না তখনই উত্তর দিতে। সময় নিল। দু-চারদিন সাতদিন পর্যন্ত ভেবে পেল তবে উত্তর। তার মিথ্যা ঘটনায় শুলুক নিয়ে মগ্নভাবনা খুবই জরুরি। সে শুলুকের জন্যই ভাবনায় কাটিয়ে দিচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সে জানে, এইসব ঘটনা মিথ্যা, অনেক কিছু মিথ্যা। শিশুটি মিথ্যা, তার মা আনারকলি বহিন মিথ্যা, বহিনের শুলুকও মিথ্যা। এগুলো সে কল্পনা করেছে, ভেবেছে, কল্পনায় একভাবে আশ্রয় নিয়েছে।

এখানে শাহনাজের প্রসঙ্গের সত্য, শাহনাজকে সেদিনই রাতে তালাক দেয়, যেদিন রাতে তার সঙ্গে জীবন কাটাতে এসেছিল শাহনাজ, শাহনাজকেই সম্মানের সঙ্গে আনতে পাঠিয়েছিল শফীউল্লা। কিন্তু এদিন বিকেলে শাহনাজের মেয়ে শাবনাকে লাইব্রেরি ঘরে দেখে শাহনাজের চেয়েও প্রচুর মুগ্ধ হয়ে পড়ে। শাহনাজকে পাওয়া যাতে সম্ভব হয়, ধর্মসম্মত হয়, অপাপ হয়, সেহেতু বিবাহিত শাহনাজের সঙ্গে সঙ্গমের আগেই তালাক দিতে চেয়েছে। যে নারীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে অথচ দেহের মিলন হয়নি, তাকে টানা তিন তালাক দেওয়া যেমন বৈধ, তেমনই তারই গর্ভজাত কন্যাকে শফীর বিয়ে করার ব্যাপারে কোনো ধর্মবিরোধী কিছু নেই। বরং বৈধ বা স্বীকৃত।

শাবানাকে পাওয়া নিয়ে তার এখন প্রচুর আকাঙ্ক্ষা, অতীব কামানাবাসনা এখন সে আদতে সেই বাস্তবতা ও অনুভবের সামনে দাঁড়িয়ে। সামনে অনে সত্য ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে, যে সব ঘটনার ভিতর সে শাবানাকে লাভ করবে সেই আসন্ন সত্য ঘটনার পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে শফীউল্লা মিথ্যা ঘটনায় গেছে শিশু এসেছে, শিশুকে নিয়ে নানা মিথ্যা ঘটনা, শুলুক বহিন ওরফে আনারকলি বহিনকে নিয়ে ইত্যাকার মিথ্যা ঘটনায় যাওয়া গেল। এসব সত্য নয় অথচ কাহিনী সত্য। কেন না আমরা কাহিনীর চরিত্রের কল্পনাকে অস্বীকার করতে পারি ন অস্বীকার করতে পারি কি সেই শিশুকে? সেই শিশু, যে শিশু গোরস্থানের চত্বরে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে। তাকে তার মা ভুলক্রমে ফেলে রেখে গেছে। তাকে পা শফীউল্লা। তার ঘর খুঁজে দিতে মেটিয়াবুরুজের পথে পথে কাঁধে নিয়ে ফিরিওয়ালা মতো হেঁটে বেড়ায় এদিক থেকে ওদিকে, এ পথ থেকে অন্যপথে। সেই শি শফীর ঘরে শাহনাজের সঙ্গে তার মিলনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, জ্যোৎস্নার বারান্দা জ্যোৎস্নায় শুয়ে থাকে। তার আনারকলি মা, শফীউল্লার শুলুকবহিন এসব ি সব মিথ্যা?

কল্পনা পর্ব

মেটিয়াবুরুজে এই কদিনে দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ধনী ব্যবসায়ী শফীউল্লা তিনদিন আগে শাহনাজ নাম্নী এক গরিব বিধবাকে চকিতে বিয়ে করে ফেলে। দুই, তিনদিন পর তাকে তালাক দিয়ে ছেড়ে দেয়। একই মানুষ দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়েছে। সেই নিয়ে মেটিয়াবুরুজ সরগরম। বাড়িতে বাড়িতে, আসরে বাসরে, রাস্তা ঘাটে, হাট বাজারে সেই কথার আন্দোলন। মাঝবয়সী গরিব বিধবা শাহনাজকে অমন মানী শিক্ষিত লোকের পক্ষে বিয়ে করা সত্যিই বিরল ঘটনা ছিল। সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনার রেশ থাকতে থাকতেই সেই শাহনাজ সুন্দরীকে তালাকও দিয়ে দেয়, আরেক নতুন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়ে।

এত কম সময়ের মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটেছে, মেটিয়াবুরুজের সমাজের পক্ষে গিলতে অসুবিধে হচ্ছে। সমাজ থমকে যায়। দুটি ঘটনার শুরুতেই প্রথমে সমাজের মুখ থেকে কোনো রা বেরয় না। প্রথম ঘটনায় একটু সময় লেগেছিল, একবেলা আধবেলা, একটু বুঝতে, কথা বলতে। কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে যাওয়ার একবেলা কেটে গেল, কোনো রা ফুটল না, স্তব্ধতা জারি থাকল।

দুটি ঘটনার পাত্র-পাত্রী এক, দুটি ঘটনার মধ্যে পারম্পর্য আছে। যাকে বিয়ে করেছিল শফী তাকেই তালাক দিয়েছে। এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে শফী এতদিনে কেন যে আগে একটাও বিয়ে করেছিল না, জনসমাজে সে-প্রশ্ন তো ছিলই। আর যদিও বিয়ে করল, চিলে ছোঁ মেরে শিকার ধরবার মতো কায়দায়। কাকে ছোঁ মারল, না চল্লিশ বছর বয়সের এক মাঝবয়সী বিধবাকে।

জনসমাজ জানতে পারল, শাহনাজের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছে শফী। সেখানে বয়স, পাত্রীর অর্থনৈতিক অবস্থান, এই সমস্ত গৌণ-তুচ্ছ হয়ে যায়। সে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, বিয়েতে এযিন দিয়ে রাজি হতে হয়েছে।

বিয়ের তিন দিন পর যে রাতে শাহনাজ বেনারসী পরে গা ভরা গয়না চড়িয়ে শফীর ঘরে পৌঁছয়, শাহনাজকে স্পর্শ না করেই, শাহনাজকে তালাক দিয়ে দেয় শফী। সেদিন ছিল আকাশভরা জ্যোৎস্না। ভোর রাতে এক পাল কাজ-কামের লোকদের সাক্ষী রেখে অনস্পর্শ শাহনাজকে তালাক দেয় শফী ঠাণ্ডা মাথায়।

কেন তালাক দিল, মেটিয়াবুরুজের সমাজ তার সূত্র খুঁজেছে। সমাজ জেনেছে, শাহনাজকে নির্বাচন করে বিয়ে করেছে শফী এ ঘটনা সত্য, তাকে নিয়ে যে সংসার করবে সে ব্যাপারেও কোনো খামতি ছিল না। বিবি পরিত্যাগের একটাই কারণ, যে সন্ধ্যায় বিবি এসে পৌঁছয়, বিবির সঙ্গে তার পাঠানো একটা তসবি আসার কথা ছিল। তসবিটা শুধু একটা তসবি নয়, সমাজ জানল পূতপবিত্র কিছু, যার সঙ্গে দাম্পত্যজীবনের সন্ধিক্ষণে শুভমঙ্গলের প্রশ্ন জড়িত, সেই হেতু বিবির কাছ থেকে সেই তসবি ফিরে না পাওয়ায়, বিবাহের পরবর্তী দাম্পত্যজীবন এই ঘটনার

সূত্রে অমঙ্গল কলঙ্কিত হয়ে উঠবে, সেই পবিত্রতা রক্ষার্থে শফী তাকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। না হলে কোনো নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করবার পর এক কণা স্পর্শনন্দিত হবার আগেই কে তালাক দেয়? ধর্মরক্ষার্থে মানুষ অনেক কিছু ত্যাগ করতে বাধ্য হয় সেখানে লোভ স্বার্থচিন্তা কিছুই নয়। একবেলা, একটি রাতের সহশয্যার পর তো তালাক দিতে পারত, কিন্তু তা করেনি শফী। সমাজ জানল, শফী কতখানি সংযমী ধর্মপ্রাণ মানুষ।

মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে শফী একটা দৃষ্টান্ত, একজন বিরল মানুষ। দিনের পর দিন তার কথা দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, ঘটনা দিয়ে নিজেকে মহিমান্বিত করে চলেছে। সমাজও তার দৌলতে কম জানছে না, কম বুঝছে না, কম উপকৃত হচ্ছে না। ধর্মের ঠিক-ঠাক মশালা যেমন দেয়, তেমনি ভুল মশালা কেউ দিলে তাকে খণ্ডন করার এলেম একমাত্র শফীরই আছে। শফী ধর্মপ্রাণ জ্ঞানী-গুণী ও মানী লোক সমাজ তার কাজে উপকৃত হয়েই চলেছে।

তার ঘটনা বলেই আরও চাঞ্চল্যকর। শাহনাজকে বিয়ে করে এক রাতের জন্যও তাকে শয্যাসঙ্গী না করেই তালাক দিয়েছে। ভোরবেলা শাহনাজ ফিরে যায় তার লিচুতলার বাড়িতে, নিজে একা পায়ে হেঁটে।

শাহনাজকে কেন তালাক দিতে বাধ্য হল শফী, তার সঙ্গে তসবির ঘটনার সত্যাসত্য কী, সে সব একমাত্র শফীই জানতে পারে। আসলে তসবির মধ্যে কোনো মহিমা গুণ ছিল না। কাবা বা আজমিঢ়-এর পবিত্র স্থানের স্পর্শপূত নয়। সাধারণ একটা তসবি। তবে দামি। অন্ধকার রাতে পুঁতিগুলো জ্বলজ্বল করে। একটা আলোর কণার মালা হয়ে ওঠে। শফীর পিরানের পকেটে ছিল। তার কারবারের ম্যানেজার ও ম্যানেজারের বিবিকে পাঠিয়েছিল শাহনাজকে আনতে, শাহনাজকে তার ঘরে তুলতে। চুপি চুপিই কাজটা সারতে চেয়েছিল। বাড়ির আর কেউ জানবে না, একে একে সবাইকে চমকে দিয়ে শাহনাজ তার সংসারে এসে উঠবে। বাড়ির সকলে চমকে যাবে কোনো আড়ম্বর খরচ করতে হবে না। রাতেই শাহনাজকে পেয়ে যাবে শফী, তার আকাঙ্ক্ষার নারী, যাকে আলটপকা বিয়ে করে বসে। আর তাকে পাওয়ার ব্যাপারে তর তো সইবে না। চুপি চুপি ম্যানেজার জিয়াদ আর তার বিবিকে শাহনাজকে আনতে পাঠিয়ে বাইরে বাইরে শাহনাজের আসার অপেক্ষায় কালাতিপাত করছিল শফী। দুপুরে পৌঁছয় বড়তলার লাইব্রেরিতে।

পাঠক, আর সেই লাইব্রেরি ঘরে বিকেলের মরা আলোর ভিতর শাহনাজের কন্যা শাবানার সঙ্গে শফীর আলাপ হয়। শাবানা এসেছিল, তার মায়ের শফীর বাড়িতে যাওয়া রুখে দিতে, সেই অনুরোধ জানাতে। শফী শাবানাকে দেখে, তার রূপে মুগ্ধ হয়ে শাহনাজকে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য যাওয়া রুখে দিতে। কেন না শাহনাজকে পাওয়ার ব্যাপারে যতখানি সে মুগ্ধতা পেয়েছিল, তার শতগুণ মুগ্ধতা শাবানার জন্য সেই মুহূর্তে জন্মায় তার। মাকে বিয়ে করবার পর মেয়েকে বিয়ে করা অসম্ভব হয়, যদি মায়ের সঙ্গে একবারের জন্য তার সহবাস ঘটে যায়। শাবানাকে দেখার পর তার মা তুচ্ছ হয়ে যায়। শাবানাই তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষার

নারী হয়ে ওঠে। মনে মনে এই মীমাংসা বিচার সে করে ফেলে, শাবানাকে পেতেই হবে তাকে। তার জন্য তাকে সাবধানী ও সৎ হতে হবে। শাহনাজের সঙ্গে সে সহবাস ঘটতে দিতে পারবে না। পাঠক, শাবানাও এসেছিল শফীর কাছে এই অনুরোধ করতে, আজ তার মা যেন না যায়। কেন না আজ তার বিয়ের পাকা কথা। সন্ধ্যায় লোকজন আসবে। এই ঘটনার সামনে পাত্রপক্ষ বিগড়ে যেতে পারে, তাই অনুরোধ, তার মা আজ না যায়, তার ব্যবস্থা করে দিতে এসেছে শাবানা। শফী যে জিয়াদকে নিয়ে যেতে বারণ করছে, শাবানার মুখে শুনে যাতে বিশ্বাস করে, তার জন্য পকেট থেকে শফী তার প্রিয় তসবিটা নিয়ে শাবানাকে পাঠায়। কিন্তু তসবিটা রাস্তায় খোয়া যায়। ফলে জিয়াদ শাবানার কথা বিশ্বাস করে না। রীতিমতো শাহনাজ পৌঁছে যায় শফীর তেতলা ঘরে। আর সেই রাতেই শাহনাজকে তালাক দিতে বাধ্য হয় শফী। পাঠক, আসল ঘটনা তো এই।

পাঠক, আমরা এখন অপেক্ষা করব না কি, শফী কীভাবে সুন্দরী কমবয়সী শাবানাকে পাবে? শফী তাকে পাওয়ার জন্যই শাহনাজ তার মাকে তালাক দিয়েছে। এবার আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, সেই সব ঘটনাক্রমের দিকে নজর দিতে হবে, শাবানাকে শফী পাবে কি পাবে না? পাঠক, রচনাকারের পক্ষেও এটা জানা সম্ভব নয়। কেন না ঘটনার পারম্পর্যের মধ্যেই থাকে কী ঘটবে, কী ঘটতে পারে, সেই সব মুহূর্তের আন্দোলন আগে থেকে ধরা যায় না। সেই ঘটনার পারম্পর্যে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

সংগোপন বাসনায় বুঁদ হয়ে তেতলার ঘরে একা একা থাকে শফী। বাড়ির লোক ভাবছে, নতুন বউকে তালাক দিতে বাধ্য হওয়ার জন্য শোকাতুর স্তব্ধ হয়ে আছে, কাজে বেরুচ্ছে না, স্বাভাবিক জীবনযাপনে যেতে পারছে না। এতদিন অবিবাহিত থাকার পর যদিও বা বিয়ে করল, শুধু ধর্ম রক্ষার তাগিদে তাকে সেই নারীকে ত্যাগ করতে হল, তার সাধকে সে গলা টিপে মারল। তার তো বেদনা হবেই, দুঃখ হবেই। পারবে না বেরতে। সহজ জীবনযাপনে মিশে যেতে পারবে না সহজে।

কাজের মেয়ে ফারজানা খাবার দিয়ে যায় তার তেতলা ঘরে, সে খায়। একবার মা নিগার বানু এসে দেখা করে গেছে। তাকে শফী বুঝিয়েছে, শাহনাজের সঙ্গে দাম্পত্যে থাকলে তার ইহকাল পরকাল দুইই বরবাদ হত, সেজন্য তাকে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে।

প্রায় সকাল পর্যন্ত না ঘুমিয়ে থেকেছে শফী। তাই সকালের চা নাস্তা খেয়ে দিব্যি আয়েস করে ঘুমিয়েছে। দুপুরবেলা ঘুম থেকে উঠে জোহরের নামাজ পড়ে ফের ঘুমিয়ে পড়েছে বিকেল পর্যন্ত। তারপর আবার নামাজ। এই সবের মধ্যে কিন্তু শাবানার ভাবনা তার সঙ্গ ছাড়েনি। এই সেই নারীই তার আকাঙ্ক্ষিত, যাকে না দেখে তার মাকে দেখে প্রলুব্ধ হয়েছিল আগে। তার জন্য তাকে কম গুণাগার দিতে হয়নি। বিয়ে করল, বাড়িতে তুলল বেনারসী পরিয়ে গহনায় সাজিয়ে। একটা

রাত তারই ঘরে কাটাল শাহনাজ বেগম। এখন শাহনাজের রূপে মুগ্ধতা ভুলে গেছে শফী, সরিয়ে ফেলেছে, যেমন করে আগাছা সমূলে তুলে ফেলা হয়।

শাহনাজের মুখ মনে করলে এখন তড়িদাহত হয় শফী, বিভীষিকার মতো আতঙ্কিত হয়। এখন শাহনাজ তার কেউ নয়, আর পাঁচটা অনাত্মীয় নারীর মতো শাহনাজও একজন নারী। আর পাঁচটা অনাত্মীয় নারীরা যেমন যে-যার ঘরে থাকে, খায়-দায়-ঘুমোয়। শাহনাজও তাদের মতো একজন, সে তার লিচুতলার খালার বাড়িতে খায় দায় ঘুমোয়। কোনো সম্বন্ধ নেই তার সঙ্গে। বরং তার ছায়া মাড়ানো পাপ হবে। আর পাঁচজন নারীর দিকে তাকালে প্রলুব্ধ হলে হবে। বরং আর পাঁচজন নারীকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারবে, কিন্তু শাহনাজকে পুনর্বিবাহ করতে গেলে এক শর্তসাপেক্ষে বিয়ে করা চলে। কেউ যদি আবার শাহনাজকে বিয়ে করে, তারপর তাকে তালাক দেয়, তবেই বিয়ে করতে পারবে। এখন শাহনাজ শফীর পরিত্যাজ্যা বিবি। তার প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া মস্ত গোনাহ্‌র কাজ।

তা বলে কি শাবানার প্রতি মুগ্ধতা বয়ে বেড়ানো উচিত অপাপ কাজ হবে শফীর পক্ষে? কক্ষনো না। শাবানার প্রতি মুগ্ধ হয়ে থাকা শফীর পাপ হয়। এই মুগ্ধতা কি শফী হারিয়ে ফেলতে পারে, নাকি শাবানাকে ভুলে যেতে পারে? লাইব্রেরি ঘরে প্রথম দেখার মুহূর্তের আগে শাবানা যেমনটা অনাকাঙ্ক্ষিত বাসনারহিত ছিল, তেমনটা কিছুতেই থাকছে না শাবানা। এখন মা নয়, মেয়ে তার ভালোবাসার পাত্রী। শুধুই বুকের ভেতরটা শাবানা শাবানা করছে। একটুতে জলতেষ্টা পায়। বুকের ভেতর ধক ধক করে ওঠে মাঝে মধ্যে। ঘুমের মধ্যে সেই মুখ, সেই কথা, সেই সবকিছু। এসব ভাবনায় পাপ হয়ে চলে জানে শফী। কিন্তু সে নিরুপায়। যত তাড়াতাড়ি পারে বিয়ে করে নিলে সে আর পাপ হবে না। বিয়ে সে করবেই শাবানাকে। না হলে তার ইহকাল পরকাল বরবাদ হবে।

আজ আর সারাদিন মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েনি, বাড়িতে বসেই নামাজ পড়েছে। কেউ তাকে বিরক্ত করতেও আসেনি। সবাই ভাবছে, তার শোক হয়েছে শাহনাজকে তালাক দিয়ে, একা একা থাকতে দিয়েছে। এই একা একা নিপাট নিভৃতে থাকার জন্য গত রাতের ঘুম পূরণও হল তার, আর ভেবে ভেবে ঠিক করে গেল ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথা। ঘাপটি মেরে ভেবেছে, কীভাবে বিয়ে করা যায় শাবানাকে—তার বিপরীতে বাধাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায় সেই সব রণনীতি ভেবে ভেবে একরকম তৈরি করে চলে শফীউল্লা।

ঘরের ভেতর হাওয়া-বাতাস খুলবে বলে দরজা হাট করে খুলে রেখেছে শফী। অনেকক্ষণ থেকে একা একা থাকছে, সেজন্য কেমন এক গা ছমছমানি। একটু অস্থিরতাও মনের মধ্যে, বেরিয়ে পড়বার। কিন্তু গা উঠছে না, শাবানার ভাবনায় ভাবনার আনন্দে থাকে, ভাবনায় তার সমাধান করে, কিন্তু জানে তা বাস্তব সমাধান নয়, তাই সে ঝিম মেরে থাকে। পাবে, পেতেই হবে তাকে শাবানাকে। আহা তার কি নাক চোখ কপাল, কি রমণীয় শরীরের গড়ন। ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো কাবা শরীফের ছবির দিকে তাকিয়েছিল একদৃষ্টে। কি অপূর্ব এ

দৃশ্য, মুসলমানদের কাছে কাবা হল পবিত্র স্থান।

'চাচা!'

স্পষ্ট শোনে, পেছনে কে তাকে ডেকেছে।

'চাচা!'

পেছন ফেরে শফী। এ যে শাবানা। শোভান আল্লা!

দরজা দিয়ে শাবানা ঢুকছে। সালোয়োর কামিজ পরা। মাথার ওপর একটা ফিরোজা রঙের ওড়না। অপূর্ব দেখাচ্ছে শাবানাকে। 'এস, এস। কিন্তু আমাকে চাচা বলবে না বলে দিয়েছি না।'

'তাহলে কী বলব?'

'কিছুই বলবে না।'

'আপনি আমার চাচার বয়সী, আপনাকে চাচাই বলব।'

'খবরদার! বলছি না, ও নামে ডাকবে না। আমি তোমার দিকে তাকাতে পারছি না, তোমার এত রূপ!'

'কই, আমি তো জানি না, আমার এত রূপ!'

'তোমার রূপ, তুমি কী করে বুঝবে। আমার চোখ বললে তবেই তুমি জানতে পার।'

'আমার মাকে কেন তালাক দিয়েছেন?'

'জানি না।'

'বলুন।'

'বলব না।'

'কেন বলবেন না।'

'তুমি পরে জানতে পারবে, তাই এখন আর বলব না।'

'আপনি কোনো কিছু গোপন করছেন।'

'হ্যাঁ, গোপন করছি, সময় হলে জানতে পারবে।'

'আমি যদি বলি আমার এখনই সময় হয়েছে শোনার।'

'আমার এখনও সময় হয়নি, আমি বলব না।'

'আপনার পায়ে পড়ছি, আপনার হাতে ধরছি, আমার মায়ের কী দোষ বলুন।'

'খবরদার তুমি আমার পায়ে পড়বে না, হাতে ধরবে না, তাহলে আমার পাপ হবে। তুমি আমার বিবি নয় এখন।'

'হ্যাঁ, আপনি আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন, মা আপনার বিবি ছিল। আমি আপনার কেউ না, তাই না? কিন্তু আপনার যে বিবি হয়েছিল, যাকে আপনি আজ ভোরে তালাক দিয়েছেন, সে তো আমারই মা। সেই সূত্রে আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ ছিল, সেই সূত্রেই আমি জানতে এসেছি, মায়ের অপরাধ কি?'

'বলছি তো বলব না, বলার এখনও সময় হয়নি। আর যত তাড়াতাড়ি পার, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, আমার পাপ হচ্ছে।'

'আমি কি আপনার কাছে ঘৃণার পাত্রী?'

'না।'

'তবে কেন আমার দিকে তাকাচ্ছেন না, বেরিয়ে যেতে বলছেন?'

'তুমি আমার প্যারের পাত্রী, তোমাকে কি ঘৃণা করতে পারি! তবে আমি আল্লার এবাদতে বিশ্বাস করি, আল্লার নির্দেশ মতো পথে চলতে ভালবাসি, তুমি আমার শাদী করা বিবি নও তো, তাই দেখলে আমার পাপ হয়। তাই তোমাকে চলে যেতে বলছি। যত তোমাকে দেখব, তত লোভ জন্মাবে আমার, তত পাপ হবে। কাহিল হয়ে পড়ছি যে আমি, তুমি যাও, শাবানা!'

'না, আমি থাকব।'

'দোহাই, আমাকে রক্ষা কর। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। তেষ্টা পাচ্ছে। বুক কেমন করছে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। আমি তোমাকে এখনই পাবার জন্য প্রলুব্ধ হচ্ছি। তুমি কি চাও আমি পাপে ডুবে মরি? আমাকে আল্লার পথে থাকতে দাও। আসতাগফেরুল্লা! তুমি আমার বিবি নও, তোমার প্রতি লোভ জন্মানো আমার পক্ষে কড়া গোনাহ্ হয়।'

অস্থির হয়ে পেছন ফিরে যেন শাবানাকে দেখতে পাবে এই বিভ্রমে দেখতে পাওয়ার আনন্দে, দেখতে না পাওয়ার স্বপ্ন আচরণে পেছন ফেরে শফীউল্লা। নেই, শাবানা নেই, শাবানার ছায়া পর্যন্ত নেই। এতক্ষণ শাবানাকে কল্পনা করেছে, তার এই ভরা সন্ধ্যার ঘরে। দরজাটা হাট করে খোলা, কেউ আসেনি। দরজার পর্দাটা হাওয়ায় দোলে। বাইরে প্রচুর সুবাতাস খেলে বেড়াচ্ছে, আর সেই বাতাসের ভিতর কামিনী ফুলের সুরভি খেলে বেড়াচ্ছে। গাছটা তাদেরই বাড়ির দক্ষিণ দিকের কোণে আছে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে সেই গাছটার দিকে ঝুঁকে দেখে শফী আর শ্বাস টেনে সুরভির ঘ্রাণ নেয়।

২

গত দিন আগত সন্ধ্যার মেটিয়াবুরুজের পথে শফীউল্লার দেওয়া তসবিখানা খোয়া গিয়েছিল। যার জন্য মায়ের শফীউল্লার বাড়িতে যাওয়া রুখে দেওয়া যায়নি। শাবানা তসবি দেখাতে পারেনি বলে শফীর লোক বিশ্বাস করেনি। মাকে নিয়ে তুলল শফীর বাড়ি। আর পরিণামটা কী হল, মাকে ফিরে আসতে হল তালাক খেয়ে চিরদিনের মতো। এই ঘটনার রহস্য উদ্ধার করার মতো এলেম নেই শাবানার। ধনী মানুষ, তার অনেক খামখেয়ালিপনা। তসবিটা ফিরে পায়নি বলেই হয়তো বা তালাক দিয়ে বসেছে মাকে। মা ফিরে এসে শুধু মুখ ছোটাচ্ছে, বেদম গালাগালি করছে শফীকে। খুব বিরক্ত হয়েছে, মায়ের মুখের সামনে দাঁড়বার সাহস নেই শাবানার। নাদের ওস্তাগরের ঘর থেকে একগাদা কাজ এসেছে, ছোঁড়া বিলি করে

যায়। ডজন ডজন মাল মাথায় করে বয়ে পৌঁছে দিয়ে যায়, কাম শেষ হওয়া মাল ফিরিয়ে নিয়ে যায়। একদম অল্পবয়সী ছেলেরা এই সব কাজ করে, তাদের 'ছোঁড়া' বলা হয়। তাদের ঘরে নাদের ওস্তাগরের যে ছোঁড়া কাজ দিয়ে যায়, কাজ দিতে এলেই তার হাত ধরে কথা বলে। গায়ে পিঠে হাত রাখে, আদর করে দেয়। সে 'ছোঁড়া' নামে বেশি পরিচিত হলেও, তার আসল নাম জেনেছে, তার নাম আসাদ। ভারি ভাল লাগে তাকে শাবানার।

আসাদ এলে যতই মন খারাপ থাকুক না কেন শাবানার মন ভাল হয়ে যায়।

বড় বড় চোখ করে আসাদ বলল, 'তোমার নাকি একটা তসবি খোয়া গেছে?'

'তোকে কে বলল রে, কোথায় পাব, কোথায় আছে?'

'আমাদের মোড়ের পান দোকানদার বলছিল, সে জানে কোথায় আছে।'

'তুই আমাকে নিয়ে যাবি?'

'চল না।'

তসবি উদ্ধারের কিস্‌সায় শাবানা ঢুকে পড়ে মুহূর্তে। কেন না তার এই কাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়া ছাড়া উপায়ও নেই। হাঁটছে তো হাঁটছে ছোঁড়ার সঙ্গে। মা নানি কামে বসেছে, সে বসল না। তার তসবিখানা চাইই। যে তসবির জন্য এত কিছু ঘটে গেছে, কাহিনী এত বড় মোড় নিয়েছে, তার সন্ধান পেয়ে উদ্ধারের জন্য বেরিয়ে পড়া ছাড়া আর কী গুরুতর কাজ থাকতে পারে শাবানার?

ছোঁড়া নিয়ে গেল হাজিরতন মোড়ের পান দোকানের কাছে। পান দোকানদার পান সাজতে ব্যস্ত ছিল। সব শুনল। তারপর বলল, 'খাতুন মহল সিনেমার সামনে পাবে কানাকে, কানা বলতে পারে। কানা এসে বলে গেছে আমার পান দোকানে।'

তো ছোঁড়া আর সঙ্গে এল না, শাবানা একাই ছুটল খাতুন মহল সিনেমা হলের উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে ঘামে। দ্রুততালে নিশ্বাস ফেলে প্রশ্বাস নেয়। যেন পোষা ময়না ছেড়ে গিয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য চলেছে শাবানা। যেন সাধের ময়না। কত তার প্রতি রাগ, অথচ কত তার প্রতি মমতা আর ভিজে ওঠা।

খাতুন মহল সিনেমা হলের সামনে কানাকে পাওয়া গেল। এক চোখ কানা বলে তার ওই নাম। দশ টাকার টিকিট পঞ্চাশ টাকা, পনের টাকার টিকিট সত্তর টাকায় বিক্রি করছিল কানা। কানা ভাবল তার টিকিটের খরিদ্দার। তসবির কথা শুনে বলল, 'সে তো কালকের কথা। রাতে জুয়োর ঘরে দাউদ বলছিল বটে। তুমি ধানখেতিতে দাউদের জুয়োর ঠেক চেন নাকি?'

শাবানা মাথা নাড়ায়, না জানায়।

'চল বহিন।' এক গোছা সিনেমার টিকিট একজন মাঝবয়েসি মেয়েলোকের হাতে দিয়ে বেরিয়ে এল কানা। যখন বহিন বলেছে, তার জন্য জান দেবে কানা।

একটা চলন্ত অটো রিকশা থামিয়ে তাতে শাবানাকে নিয়ে উঠে পড়ল সিনেমার

টিকিট ব্ল্যাকার কানা। নিজের প্যাকেট থেকে পান মশলা খাওয়ালো। খুব সং সজ্জন মনে হল সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকার কানাকে। কানা ধানখেতিতে নামিয়ে নিয়ে গেল অনেক গলি ঘুরে ঘুরে একটা ছোট ঘরে। দরজায় কড়া নাড়ল। এখন জুয়ো বন্ধ। সন্ধ্যায় খুলবে। এখন ঘুমচ্ছে। সারারাত জুয়ো চলে কিনা। এসব কথা জানাল শাবানাকে কানা। 'আবে জলদি দরওয়াজা খোল, বহিন এসেছে।'

'কৌন, শালা নিদ হারাম করলি?'

'আবে তেরা বাপ। বহিন এসেছে বলছি না। '

'কৌন বহিন?'

'মেরা বহিন। আবে খোল।'

'তু কৌন?'

'আরে লিয়াকত, বে লিয়াকত।'

'আবে কানা, তু শালো লিয়াকত হলি কব?'

'আবে খোল।'

'জামা পরছি, চুল আঁচড়াচ্ছি—মেয়েলোক আছে বলছিস না?'

একটু দেরি করেই বেরিয়ে এল দাউদ। গায়ে ভাল মতো একটা শার্ট, টেরি বাগিয়েছে। বেরিয়ে এসে হাসল, সজ্জন পরোপকারী মানুষরা যেভাবে হাসে। 'এ তেরা বহিন?'

'না, তেরা বাপকা বহিন।'

'চল, ঠাণ্ডা পি লো।'

গলি থেকে বেরিয়ে আসে ওরা। গলির মুখটায় কোল্ড ড্রিঙ্কস-এর দোকান থেকে তিনটে বোতলের অর্ডার দেয়। ঠাণ্ডা খেতে থাকে ওরা।

কানা বলল, 'আবে তসবি কিস পাসমে হ্যায়। কাল বললি না একঠো তসবি মিলা। উ বহিন কা তসবি।'

'বহিন কা তসবি? আচ্ছা, আচ্ছা।'

'নিকাল জলদি।'

'মেরা পাশ কাঁহা?'

'তব।'

'শাহাজাদাকো পাশ হোবে।'

'অব কাঁহা হোগা খানকি কা আওলাদ শাহজাদা? বহিন কা তসবি লেকর কাঁহা কাঁহা ঘুমতা রে! শালা পাকিটমার!'

'আবে শাহজাদা কো ঢুঢনা কই তখলিফ কা কাম হ্যায়! বাস মে মিলে গা কাঁচি সড়ক সে কিলখানা তক বাসমে মিল যায়ে গা। বো ইস ওয়াক্ত উসি কামমে হ্যায়। পাকিট সাফাই করছে।'

শাবানাকে নিয়ে কানা ফিরতে লাগল। হাঁটতে পাঁটতে বাসস্টপে। শাবানার মনে হল সত্যিই যেন কানার সে বোন। বড় মিষ্টি তার আত্মীয়তার ব্যবহার

কটা ভিড় বাসে তুলল কানা শাবানাকে। বাড়ির লোক যেভাবে বাসে তোলে, নার মধ্যে সেই ভঙ্গি, সেই ব্যস্ততা।

মুহূর্তের মধ্যে কলার চেপে ধরে শাহ্‌জাদাকে বাস থেকে মুদিয়ালিতে নামাল না। 'আবে তসবি কোথায় আছে দে—বহিনের তসবি।'

'এ তেরা বহিন?'

'আবে তেরা বাপকা বহিন। কাঁহা বহিন কা তসবি?'

'তসবি? মেরে পাশ তো নেহি?'

'দাউদ খানকি কা আওলাদ তো ঝুট বোলা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সচ।'

'দে শালো।'

'মেরে পাশ তো নেহি, ও তো'—আর বলতে পারে না শাহ্‌জাদা।

'বোল বে।'

'ও তো রুস্তম মাস্তান কো পাশ।'

কানাও সে নাম শুনে ঘাবড়ে যায়। কথায় কথায় ক্ষুর চালায়। মেটিয়াবুরুজের খন সেরা মাস্তান। ব্যবসাদাররা তো বটেই, এমনকী পুলিশও তাকে ভয় পায়। ভাবে রুস্তম মাস্তানের কাছে তসবি চাইতে যাবে সে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ লোচনা করতে লাগল কানারা। এদিকে বহিনের তসবি বলে কথা, উদ্ধার করবে, থা দিয়েছে। কথা দিলে কথা রাখে কানা। টিকিট ব্ল্যাক করে বটে, কিন্তু টাকা য়ে গলদ টিকিট কাউকে দেয় না। সে খুব সৎ। সে নিজের ক্ষতি মেনে নেবে কন্তু সততা থেকে একচুল নড়বে না।

এদিকে রুস্তম মাস্তান পড়েছে মহা ফাঁপড়ে। এই তসবি নিয়ে তার সমস্যা। সবিটা রাতে শাহ্‌জাদার কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়ার পর সকাল থেকে কেমন ার মনের মধ্যে থেকে রাগ সরে যেতে থেকেছে। মাস্তানির বদ খেয়াল ঠিক ঠক জুত করে করে উঠতে পারছে না। তসবিটা পাওয়া ইস্তক এমনটা তার চ্ছে। নিশ্চয় তসবিটার তেমন কোনো মহিমা আছে। যা তাকে বদ হতে দিচ্ছে া। অনেক বার ভেবেছে তসবিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়। কিন্তু তসবিটা যদি খাদায়ি হয়ে থাকে, এতে তার গুনাহ্ হবে ভেবে খামোশ খেয়ে আছে। কোনো াস্তানি বদখেয়াল করতে পারছে না এই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। পানিকলে -চারটে দোকান তোলা দিচ্ছে না, সেখানে আজ এগারটার সময় ধাতানি দিতে াওয়ার কথা ছিল। গা উঠল না। মোকসেদ, তাহের, পচা, পটকাকে ফিরিয়ে দিল। উঠতে যাচ্ছিল যেই, গা ঝিম ঝিম করে উঠছিল। মাটি পা টেনে ধরছিল। াস্তানি করবে, ভাবতেই পারছিল না। সাগরেদদের কথায় কানই দিচ্ছিল না। ঝতে পারছিল তসবির গুণ তাকে এমন বে-মাস্তানিতে নিয়ে যাচ্ছে, এর থেকে বরিয়ে আসা তার চাই। যেমন করেই হোক, এ তসবি যার, তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ্যবস্থা করতে হবে। অথবা তসবির একটা যথাবিহিত করতে হবে। টক করে

মনে পড়ল কাদের মৌলবির কাছে জিম্মা রাখবে, কার তসবি খোঁজ করে তাবে ফিরিয়ে দিতে পারে একমাত্র কাদের মৌলবিই।

পটকা গেল কাদের মৌলবির বাড়ি। কাদের মৌলবি তখন গোর দিচ্ছে কারবালার গোরস্থানে। পটকা ফিরে এসে সে খবর জানাতে, তাহের গেল গোরস্থানে। গোরস্থানের কাজ সেরে তখন কাদের মৌলবি গেছে জোহরের নামাজ পড়তে। তাহের ফিরে এসে সে-কথা জানাতে পচাকে পাঠানো হল মসজিদে মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বেরিয়ে তখন আবার বাড়িতে কাদের মৌলবি। বাড়ি থেকে আবার গোরস্থানে। গোরস্থান থেকে আবার মসজিদে। মসজিদ থেকে আবার বাড়ি। শেষ মেষ পচাকে তসবি নিয়ে গোরস্থানের গেটের সামনেই দাঁড়াতে বলে খানিকটা বিহিত করল রুস্তম মাস্তান। আবার হয়তো লাশ আসবে। আবার হয়তো মেটিয়াবুরুজের কেউ মরবে, তার অপেক্ষা করতে লাগল। শেষ মেষ আবার একটা লাশ এল, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। এবার কাদের মৌলবি বাড়ি থেকে প্রথমে মসজিদ যায়, তারপর গোরস্থান। গোরস্থানের গেটেই তসবিটা পায় পচার হাত থেকে।

কাদের মওদুদি প্রথমে চিনতে পারেনি, তারপর ছ্যাঁৎ করে কেমন চেনা চেনা মনে হল তার। তারপর মনে পড়ে যায়, এতো শফীউল্লার তসবি। আর বিবিকে যে তালাক দিয়েছে, তার সঙ্গে তো তসবির একটা সম্পর্ক আছে! সেই তসবি অপরাধ জগতে চলে গিয়েছিল?

ততক্ষণে দাউদ মাস্তানের ডেরা ঘুরে শাবানা বহিনকে নিয়ে গোরস্থানের গেটে পৌঁছতে কানার সন্ধ্যা হয়ে যায়। কেউ কোথাও নেই। লাশের কাফন দাফন হয়ে গেছে। আতর গোলাপজল আর ধুপের গন্ধে গোরস্থানের আকাশ তখন ম- করছে। তসবিটা এইখান পর্যন্ত এসেছে। তারপর কোথায় গেল তসবিটা? কানা আর শাবানা সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। সন্ধ্যা গাঢ় হচ্ছে। ঝিঁঝি ডাকছে। গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের গুমর। বোধহয়, এখানে এসেই তসবিটার প্রাপ্তি ফসকে গেল।

না, এই কল্পকাহিনীর ভেতর শফীর সঙ্গে শাবানার পুনর্বার দেখা হবে, তসবি অভিযানের হাত ধরে। কেন না কাদের মৌলবি খবর পাঠাবে, তার তসবি পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে শফী চলে আসবে তসবিটা উদ্ধার করতে। গোরস্থানে এসে দেখা-সাক্ষাৎ হবে, এ কথা মৌলবি বলে পাঠাবে। আর তারা যখন একে একে গোরস্থানের গেটে এসে পৌঁছবে তখন শফীর সঙ্গে শাবানার আবার দেখা জুটবে শাবানার হাত দিয়েই তসবিটা ফেরৎ পাওয়ার অভিনয় করাবে। শফী দেখবে শাবানাকে। শফীর তাতে পাপ হবে। শফী বিমোহিত হয়ে পড়বে, শাবানাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়বে। যদিও তাদের অবাস্তব দেখা, সেহেতু যতদূর পর্যন্ত ভদ্রলোকের অপরাধ করা সাজে, ততদূর পর্যন্ত যেতে পারে শফীউল্লা গেটের সামনে, শাবানার আকর্ষণে পাগল হয়ে হাত ধরে বসবে। শাবানা কেঁদে

উঠবে। মাছ টোপ খেলে বঁড়শির সুতোয় যে ধরা পড়ার বিপরীত টান হাত মালুম করে, সেই মতো অনুভব হবে শফীর, শাবানার হাত ধরার অভিজ্ঞতায়, অভিঘাতে।

৩

গোরস্থানের গেটে তসবি ফিরিয়ে দেওয়ার অভিনয়ের পর—তো রাত বাড়ছিল, হাত ধরে শুধু এইটুকুই শফী বলতে পেরেছিল, 'রাত বেড়েছে, মেয়েছেলে বাইরে থাকতে নেই, চলে যাও বাড়ি। আমি আমার তসবি এই ফিরে পেলাম। তুমিই আমার হাত দিয়ে নিয়েছিলে, তোমার হাত দিয়েই আবার আমি ফেরৎ পেলাম।'

'কিন্তু তসবি ফিরিয়ে দেওয়ার পর আমার যে কথা ছিল—'

'সে-সব কথা তো পরে হতে পারে।'

'আমার দেরি সয় না। আমার জানতে ইচ্ছে করছে।'

'ঈশার নামাজের সময় হয়ে গেল, এখন থাক। কাল লাইব্রেরি ঘরে চলে এস, আমারও অনেক অনেক কথা আছে।' একটু চুপ করে থেকে স্বর পালটে আবেগতাড়িত হয়ে বলে উঠল, 'আমার পাপ বাড়তে থাকুক, সেটা বোধ হয় তুমি চাও না?'

'কে চায়, কারুর পাপ বাড়াতে।'

'তাহলে কাল এস তুমি দুপুরে। লাইব্রেরি ঘরে আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

'কিন্তু আমার শুধু একটা কথা জানার, একটাই প্রশ্ন, আমার মাকে কেন তালাক দিলেন?'

'এই প্রশ্নের উত্তর এখানে এত টক করে বলা যাবে না। তার পরিবেশ চাই, আর আমি যে বলব আমার মধ্যেও তো দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। এত সহজে কি বলতে পারি সে-সব গোপন কথা? তুমি এস কাল, কথা হবে।'

শাবানা কাল দুপুরে লাইব্রেরি ঘরে যাবে কথা দিয়ে ফিরে যায়। তারপর রাত কাটে। সকাল হয়। তারপর সময় গড়াবার যথানিয়মে দুপুর আসে। কানাও সঙ্গে এসেছে। কানা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করার কাজ শিকেয় তুলে এখন শাবানার ভাইজান সেজেছে. সত্যি সত্যি বুকের ভেতর থেকে কলজের গা থেকে ভাইজান হওয়ার ভালো লাগা সাড়া পায় কানা। তার ধান্ধা এখন শিকের তুলেছে। কথা মতো জব্বার হাটের সামনে আড়াইটের সময় দুজন এসে দাঁড়িয়েছে। ওখান থেকে রওনা হল বড়তলার লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে।

কানা থাকল বাইরে চায়ের দোকানে। শফীর সঙ্গে কথা মিটে যেতে যদি রাত হয় তাহলে তার লিচুতলার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে।

বড়ভাইয়ের প্রতি এতই ভালবাসা যে শাবানা লাইব্রেরির ঘরে ঢুকতে যেতে যেতে বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল। ভাইজানকে সে কষ্ট দিচ্ছে। সে একা

অপেক্ষায় থাকবে। এতক্ষণ কত না টিকিট ব্ল্যাক করে ফেলতে পারত। দশক পঁচাশ, বিশ কা আশি। লে লে লে যা, লে যা। দশ কা পঁচাশ. বিশ কা আশি লে যা, লে যা। ম্যাটিনি শোয়ে দুশো আড়াই শো টাকা কামিয়ে ফেলতে পারত তার পরেও আছে ইভনিং নাইট শো। কিছু পার্সেন্টিজ পাবে হলের কর্মচারীরা কিছু পাবে এলাকার দাদা। এলাকার মাস্তানকে না দিলে কানার পরিবর্তে অন কাউকে কাজটা দিয়ে দেবে। তসবি সংক্রান্ত ব্যাপারে কানা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে রুস্তম মাস্তানের কানে পৌঁছে দিয়েছে পটকা মারফৎ একদিন অন্য কেউ টিকিট ব্ল্যাক করতে পারে, সে যখনই আসবে, তখন যেন তাকে ছেড়ে দেওয় হয়।

বহিনের সঙ্গে যেই কানার মোলাকাত হয়ে গেছে, সেই থেকে তার টিকি ব্ল্যাক করার ধান্ধা শিকেয় উঠেছে। মনে করছে, কাজটা ভাল নয়। তাকে সং হতে হবে, সমাজের মানী লোক হতে হবে। না হলে এমন বোনের ভাইজান হিসেবে তার মান থাকে না। কাল রাতে আর জুয়োর আড্ডায় যায়নি। মাল খায়নি। বাড়িতে গিয়ে সটান শুয়ে পড়েছে, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। অনেকদিন স্বপ্ন দেখ বন্ধ রেখেছিল। গত রাতে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখেছে। বহিন যেন কোনো বিপদে পড়েছে, এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে তাকে নিয়ে চলেছে। এই দেশে যদি বহিন থাকে, যদি যেতে বিলম্ব করে, তাহলে বিপদ হবে। তাড়াতাড়ি এ দেশের সীমানা পার করে দেশান্তর হবে। না হলে বিকটাকার এক রাক্ষস তাকে খেয়ে ফেলবে।

বোনের হাত ধরে টানতে টানতে ঘোড়ায় তোলে। ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। ঘোড়াট উড়তে পারে। ঘোড়া উড়িয়ে নগর-গ্রাম-প্রান্তর, নদী-নালা-মাঠ পেরিয়ে চলেছে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে রাক্ষসের খপ্পর থেকে।

চায়ের দোকানে বসে বসে কানা ঘুমিয়ে যেতে চায়। আরেকটা তেমন স্বপ্ন দেখতে চায় যেন। ঘন দুধের সরের মতো গ্রীষ্মের দুপুর জমে আছে। তপ্ত, রৌদ্রদগ্ধ কানা তারই ভিতর ঘেমে নেয়ে যেতে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়তে থাকে, আর ঘুয়িয়ে পড়তে পড়তে, স্বপ্ন দেখতে থাকে। সেই স্বপ্নটা, বহিনকে উদ্ধার করে নিয়ে চলেছে। অনেক দূরে অন্য কোনো দেশে নিয়ে চলেছে।

ঝোপ জঙ্গল ডিঙিয়ে, একটা নদীর চর, চর পেরিয়ে একটা ঘাটে বাঁধা নৌকো সেই নৌকোয় হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে শফীউল্লা, তার নৌকোতে শাবানাকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় কানা। পাল তুলে নৌকো চলে যাচ্ছে। শফী তাকে বাঁচাবে কানা যখন নৌকোতে তুলে দিল, তখন শফী তার ডান হাতটা শাবানার দিকে বাড়িয়ে দিল। আর সেই নরম হাত ধরে নৌকোয় তুলল শাবানাকে। সে এক অপূর্ব স্পর্শসুখ, রোমাঞ্চকর ঘটনা। কানাকে আলাবিদা জানিয়ে নৌকো ছেড়ে দেয় ওপরে নীলাকাশ, নীচে অনন্ত জলরাশি। শাবানা বসে আছে লজ্জানত মুখে

লাইব্রেরি ঘরের দরজার ফ্রেমে এসে দাঁড়াল শাবানা। পেছন থেকে আরে এসে পড়েছে সেই।

শফী এগিয়ে যায়। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দেয়। শাবানা আলতো করে হাত রাখে শফীর হাতে। হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসায়। তারপর মুখোমুখি একটা চেয়ার নিজে বসে।

'বলুন, আমার মাকে কেন আপনি তালাক দিয়েছেন?'

'এই কথাটুকুই আমার মুখ থেকে শুনতে চাও তুমি? আর কিছু না?'

'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।'

'আমি যদি বলি, এখনই সময় হয়নি বলার?'

'তবুও আমার শুনতে ইচ্ছে করবে।'

'আমাকে বলতে বলার জন্য তুমি এত উতলা হয়ো না।'

'কেন?'

'এখনই বলতে বলো না।'

'তাহলে আমার এখন আর কিছুই শোনার নেই। আর কি কিছু শোনার আছে?'

'আছে। আমি বললেই তোমার অনেক কিছু শোনার আছে।'

'কী বলতে চান?'

'রোসো, আর একটু চুপ কর। আমি তোমাকে এখন দেখি।'

'আমি কি চিড়িয়াখানার পশুপাখি নাকি?'

'তুমি আমার ময়না।'

'আমি যে একজন মেয়ে, মেয়েমানুষ।'

'মেয়েও, ময়নাও। আমি কেমন তোমার চোখে?'

'আগে বলুন, আমার মাকে কেন তালাক দিয়েছেন?'

'তবে তুমি বলবে, তোমার চোখে আমি কেমন?'

'আপনাকে তো আগে চাচা ডেকেছি।'

'ভুল সম্বোধনে ডেকেছ। আমি তোমার চাচা ফুপো কেউ নই। এখন থেকে মনে রাখবে এক প্রেমিক পুরুষ আমি তোমার।'

'প্রেমিক, পুরুষ?'

'অবাক হচ্ছ? তোমার চোখ কী বলছে, মন কী বলছে?'

'আমার চোখের কথা, মনের কথা তখনই বলব যখন আপনি আমাকে সেই রহস্যের কথা জানাবেন,—আমার মাকে কেন তালাক দিয়েছেন।'

এবার একটু নড়েচড়ে বসে শফী। একটু রাগও জন্মায় তার। 'এবার তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'বলুন, আপনার প্রশ্ন?'

'তোমার মা আধবুড়ি কিনা?'

'হ্যাঁ, আপনি তা জেনেই আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন।'

'ভুল করেছিলাম। ভুল মানুষমাত্রেই করে। এবার বল তোমার চেয়ে তোমার মা বেশি সুন্দরী কি?'

'না।'

'এর মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে আছে, বুঝে নাও একটু আগে যে তোমার হাত ধরেছিলাম, কিছু বুঝেছ?'

শাবানা কিছু উত্তর করে না। মুগ্ধ ও রোমাঞ্চিত চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর নরম ঠোঁট দুটি তার নড়ে, 'আপনি আমাকে ছুঁয়েছেন, আমি যেন আপনার হয়ে গেছি। কেন আমার হাত ধরলেন?'

'প্রেমিক তো প্রেমিকার হাত ধরেই।'

'দেহে মনে আপনার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছি।'

'আমি জানতাম, তুমি আমারই হবে। আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

'আমি আপনাকে ছাড়া বাঁচব না। আমার প্রেমিক পুরুষ আপনি।'

'আমি জানতাম, এই তোমার অনুভব।'

'আমি এখন আপনার কোলে মাথা দিয়ে শোব।'

'এখন আমি তোমাকে বিয়ে করিনি, তোমার মাথা আমার কোলে তুলে নিলে আমার পাপ হবে।'

'আমি আপনার বাহুলগ্না হব।'

'আমার পাপ হবে।'

'আমাকে আপনি আরও স্পর্শ করুন।'

'পাপ হবে।'

'আমাকে আরও রোমাঞ্চিত করুন।'

'পাপ হবে। তার আগে তোমাকে আমি বিয়ে করব।'

'তাহলে তাই করুন। আগে আমাকে বিয়ে করুন, তারপর স্পর্শ করুন, বাহুলগ্না করুন। যা খুশি তাই করুন।'

'তারপরেও কি জানতে চাইবে, কেন তোমার মাকে তালাক দিয়েছি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'সে যে আমার মা। আপনি যে তাকে বিয়ে করেছিলেন।'

'আমি সে কথা এখন বলব না।'

'তাহলে পরেই বলবেন। কিন্তু বলতে হবে।'

'বলছি তো বলব।'

'তাহলে আমাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করুন। তাহলে তাড়াতাড়ি জানতে পারব।'

'চল গোরাস্থান যাই। আজ সন্ধ্যায় তোমাকে বিয়ে করি। ওখানে মৌলবি মজুদ থাকে আর গোরকোনদের মধ্যে সাক্ষীও জোগাড় করা যাবে।'

'তার আগে একটি মাত্র বার আর আমাকে স্পর্শ করবেন না?'

'না। আমার পাপ হবে।'

'একটিমাত্র বার স্পর্শ করার পাপ আপনি করতে চান না?'

'না।'

'আপনার কি মন চায় না স্পর্শ করতে?'

'চায়। আমি মনে বেড়ি পরিয়ে রেখেছি। তোমার তো খুব ইচ্ছে আমি তোমাকে র্শ করি?'

'হ্যাঁ।'

'শুনেই আমি খুশি।'

সন্ধ্যায় শফী তার ঘরে এই কল্পনায় দাঁড়িয়ে থাকে। যেখানে শাবানা তার স্পর্শের ন্য ব্যাকুল হয়েছে। যেখানে কানা লাইব্রেরি ঘরের বাইরে চা দোকানে বসে স ঘুমচ্ছে, আর স্বপ্ন দেখছে।

৪

সবিটা খোয়া গেছে। তাকে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। শফীউল্লার কাছে তদিন ছিল তসবিটা। এখন আর নেই। শাবানাকে তসবিটা দিয়ে যে কাজটা রতে চেয়েছিল, তা হয়নি। শাহনাজ সশরীরে তার তেতলা ঘরে উঠে এসেছিল। ই রাতেই তার নিষ্পত্তি করে ছেড়েছে শফী।

অথচ সেই তসবি নিয়ে তার কত কল্পনা, কত না কল্পকাহিনীর সঙ্গে সে বসবাস রে চলেছে। আর এই কল্পকাহিনী বিলাসের সূত্র ধরে সোলেমান পয়গম্বরের ই আংটি হারানোর কিস্‌সায় চলে যায়। এখন বাস্তব ঘটনায় থাকতে তার একদম চ্ছে করছে না। কেন না শাহনাজকে বিয়ে করেছিল, এখন শাহনাজকে তালাক য়েছে। সমাজ এখন কানাকানি করছে তার বিরুদ্ধে। বাস্তবতায় সে এখন মাজবিরোধী। আবার, সে যা চাইছে, তারই তালাক দেওয়া বিবির গর্ভজাত য়েকে বিয়ে করতে। শরিয়তের দিক দিয়ে সে কোনো ভুল করবে না। কেন শাহনাজের সঙ্গে সহবাসের আগেই তাকে তালাক দিয়েছে। এখন শাহনাজ র পাঁচটা আউরতের মতো একজন আউরত। তেমনি শাবানাও আর পাঁচটা রীর মতো একজন নারী। সমাজকে বোঝার, ভেবে দেখবার জন্য সময় দিতে ব। সমাজের মধ্যে কোনো কিছুর ভুল বদ্ধমূল ধারণা খণ্ডন করতে গেলে বেগ তে হবে।

এমনিতে শাহনাজকে বিয়ে করার তিন দিনের মধ্যে তালাক দিয়ে দিয়েছে, ঘটনা সমাজ খুব সহজে গিলতে পারবে না। কেন তাকে তালাক দিয়েছে বা লাক দেওয়ার কতখানি অধিকারী সে, সে সব বোঝাবার দায়িত্ব শফীর ওপরই চ্ছে। এখন সমাজ মুখিয়ে আছে, চট করে বোঝানো যাবে না। একটু সবুর রতে হবে। আর নিজেও তো কম মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে নেই! শাবানার প্রতি

তার প্রেম মুগ্ধতা। শাবানাকে জীবনে তাকে পেতেই হবে। মানসিক এক দৌর্বলে
মধ্যে বাস করছে সে। এখন একা একা, নিজের সঙ্গে থাকা মেনে নিয়েছে

আর সেই জন্যই বাস্তবতাকে হারিয়ে ফেলতে তার ভাল লাগছে। ভাল লাগ
কল্পকাহিনীতে যেতে। যেখানে শাবানা নিজে তসবি খুঁজতে যাচ্ছে। আর তসি
সূত্র ধরে পৌঁছে যাচ্ছে লাইব্রেরি ঘরে তারই সামনে। যে কল্পকাহিনীতে, শফী
শাবানা স্পর্শ করার আহ্বান জানায়। বিয়ে করার কথা নিজেই বলে। প
দোকানদার, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকার, জুয়োর ঠেকের মালিক, পকেটমা
মেটিয়াবুরুজের মাস্তানের ঘটনাক্রম দিয়ে, তসবিই শাবানাকে পৌঁছে দেয় শফ
কাছে। সেহেতু শফীর একাকিত্ব ও কল্পকাহিনী বিলাস আচ্ছন্নতার ভিতর ঝিকি
ওঠে সোলেমান পায়গম্বরের সেই আংটিকাহিনী। যে আংটির ক্ষমতায় ক্ষমতাসম্প
ছিলেন সোলেমান বাদশা। সেই আংটিটি একদিন তাঁর হাতছাড়া হয়। তিনি ন
রকমের ক্ষমতা থেকে চ্যুত হন। রাজ সিংহাসন থেকে চ্যুত হন, দেওপরী বাত
পশুপক্ষীর ওপর বশ্যতাও হারিয়ে ফেলেন।

কেন সেই আংটিটি হারিয়ে ফেলার ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটল?

সাইদুন দুর্গ অভিযানে গিয়েছিলেন সোলেমান। সেখানকার বাদশা ি
আনকাবুত। সোলেমানের পরাক্রমে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তা
এক ধরনের ফড়িং এসে খেয়ে ফেলে। আনকাবুত মারা যাওয়ার পর সৈন
আত্মসমর্পণ করল সোলেমানের কাছে। আনকাবুতের এক অপরূপ সুন্দরী ে
ছিল। সোলেমান তাকে বিয়ে করলেন। সেই সঙ্গে চার হাজার বাঁদীকে তিনি পে
তাদের তিনি নিজের হারেমে আশ্রয় দিলেন।

এদিকে পরী রাজকন্যা সোলেমানের বিবি হলে কি হবে, তার মন থেকে ত
বাবার মৃত্যুশোক যায় না।

সোলেমান তাকে মুসলমান হওয়ার কথা বলেন, জানায়, এখনও সে শোকগ্র
সোলেমানকে অনুরোধ জানায়, 'আমার বাবাকে একটিবার দেখাও।'

'অসম্ভব, সে তো যুদ্ধে মারা গেছে।'

'সে সব আমি শুনব না। আপনি এত বড় বাদশা, আর আপনি নাকি ন
আপনি দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারবেন না, এ হয় নাকি?'

তখন সোলেমান বাদশা আনকাবুতের ছিন্নমুণ্ডু এনে দেখালেন। দেখে তার ক
অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সুস্থ হওয়ার পর, তাকে মুসলমান করে তবেই সোলেমান বি
করেছিলেন।

কিন্তু পরীকন্যার সঙ্গ নিল শয়তান। শয়তান মানুষের বেশ ধারণ করে এ
পরীকন্যাকে বলল, তার বাবার মূর্তি বানিয়ে পুজো করতে। সে তাই করতে লাগ

মতান্তরে, সোলেমান পরীকুমারীর মন ইসলামের দিকে ফিরিয়ে এনে বি
প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন পরীকন্যা তার বাবার একটা ছবি নিজের কাছে রা

শর্তে প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। তাছাড়া আরও একটা ঘটনা, কোরবানির সময় পরীকন্যা একটা ফড়িংকে কোরবানি দিতে চায়, তাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পরীকন্যার অন্যায় আবদারে রাজি হন সোলেমান। পরীকন্যার প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় তিনি বোধহয় এই ধরনের অন্যায় আবদার বরদাস্ত করেছিলেন। পরীকন্যার এই দুটি অন্যায়ের কুফল সোলেমানকে ভোগ করতে হল শেষ পর্যন্ত। একদিন তাঁর সেই আংটিটি খোয়া গেল।

একদিন যথাসময়ে প্রাতঃকৃত্য করতে যাওয়ার সময় সোলেমান হারেমের এক বাঁদীর কাছে তাঁর সেই মূল্যবান শক্তিধর আংটিটি রেখে গেলেন।

এদিকে এক দৈত্য কর্মচারীর মাথায় দুর্বুদ্ধি খেলে গেল। আকাঙ্ক্ষা হল তার সে বাদশা হবে। সে সোলেমানের রূপ ধরে বাঁদীর কাছ থেকে আংটিটা চেয়ে নিয়ে সোজা সিংহাসনে বসে গেল। সিংহাসনে বসতেই দরবারের সকলেই অভিবাদন জানাল। পাখিরা তার মাথার ওপর ছায়া রচনা করল। যথারীতি সকরা দৈত্য রাজকার্য হাতে নিয়ে নিল।

এদিকে সোলেমান প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে বাঁদীর কাছ থেকে আংটি ফিরিয়ে নিতে এসে আশ্চর্য কথা শুনলেন। 'কে গো তুমি আংটি চাইতে এয়েচ, বাদশা তো আংটি নিয়ে গেছে। দেখ গে সিংহাসনে বসে আছে। এ যে দেখছি মোদের বাদশার মতো দেখতে। এ জাল লোক। কে আছে, একে বের করে দাও।'

সোলেমান তখন দরবারে গিয়ে দেখলেন তাঁরই মতো চেহারার একজন সিংহাসনে বসে দরবার চালাচ্ছে। তিনি চিনতে পারলেন সকরা দৈত্যকে। তখন সোলেমান সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে হেঁকে বললেন, 'আমিই সোলেমান, আমার পিতার নাম দাউদ। আর এ যে সিংহাসনে বসে আছে, এ হচ্ছে জালি, ঠগ।'

সোলেমানের এ কথা শুনে দরবাবের সবাই অট্টহাসি করে উঠল। লোকটি নিশ্চয় ছিটগ্রস্ত, না হয় একজন জালিয়াত। বাদশার মতো দেখতে, তাই ঠকাতে এসেছে দরবারকে। একে উচিত শাস্তি দেওয়া হোক।

সকরা দৈত্য দরবারের লোকজনদের কাছে উদারতার পরিচয় তৈরি করার জন্য সোলেমানকে ছেড়ে দিতে বলল। বলল, 'লোকটা নির্ঘাৎ পাগল। মানে মানে ওকে দরবারের বাইরে বার করে নিয়ে যাও।'

আল্লা সম্রাটকে পথের ভিখারিতে পরিণত করলেন। আল্লার এমনই মহিমা। সেখান থেকে তিনি বাইতুল মোকাদ্দসে সেজদায় পড়ে রইলেন। আল্লার কাছে কাঁদতে লাগলেন। না খাওয়ায় না দাওয়ায় শরীর একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল।

সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি খাদ্যের উদ্দেশ্যে। বনি ইসরাইলের এক বাড়িতে গিয়ে খাবার চাইলেন, তারা দিল না। আর এক বাড়িতে গেলেন, তারা জানাল, একটু আগে তাদের সব খাবার শেষ হয়ে গেছে।

রাজ্যহারা সোলেমান অপমানে অনাহারে জর্জরিত হয়ে সমুদ্রোপকূলে এসে পৌঁছলেন। ইচ্ছে, কোনো বিদেশি নৌকো পেলে, দেশত্যাগ করবেন। কিন্তু তেমন নৌকো পেলেন না।

সমুদ্র উপকূলে জেলে পাড়া, জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরছে, তাদের কাছে যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়, তাহলে জীবন বাঁচে, ভাবলেন। বললেন জেলেদের। জেলেরা রাজি হল। তাদের সঙ্গে যদি সোলেমান জাল টানেন তাহলে তাঁকে দুটো মাছ দেওয়া হবে।

এদিকে সোলেমান প্রতিদিন দুটো মাছ পান. একটা মাছ বেচে আটা ইত্যাদি কেনেন। তারপর রুটি তৈরি করে মাছভাজা দিয়ে খান। আর তিনি আল্লার কাছে অপরাধের মার্জনার জন্য কাঁদতে লাগলেন।

রাজ সিংহাসনে বসে সকরা দৈত্য চল্লিশ দিন রাজত্ব চালিয়ে গেল। অনেকেই তাকে সমর্থন করলেও কিছু পরী ও মানুষ তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করল। সকরার কাজকর্মের ত্রুটি তাদের চোখ এড়িয়ে গেল না। ইসলামি কায়েম করার পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী শাসন করতে লাগল। তখন সকলে বুঝতে পারল, তাদের রাজা, আসল সোলেমান নয়।

তখন আসফ দেও তদন্ত শুরু করল। প্রথমে সোলেমানের বিবিদের সঙ্গে কথা বলল। জানতে পারল, এই চল্লিশ দিন বিবিদের সঙ্গে সোলেমানের কোনো সাক্ষাৎ ঘটেনি। তার মানে সোলেমান নিরুদ্দেশ। এই যে সোলেমান সেজে সিংহাসনে বসে আছে, এ হচ্ছে জাল, প্রমাণ পেয়ে গেল। তারপর আসফ গেল সেই বাঁদীর কাছে, যে বাঁদীর কাছে আংটিটি সোলেমান ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর আর একজন সোলেমানের মতো দেখতে আংটিটি চাইতে এসেছিল।

আসফ দেও সব বুঝতে পারল। তখন সে এক ফন্দি আঁটল। চল্লিশ জন তওরাতের হাফেজ সংগ্রহ করল। তাদেরকে সোলেমানী সিংহাসনের পাশে তওরাত পাঠ করতে নির্দেশ দিল। যেই চল্লিশ জন হাফেজ তওরাত পাঠ শুরু করেছে, অমনি সকরা দেও ধরা পড়ে গেল। কুঁকড়ে মুকড়ে গেল। তওরাত পাঠ তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। অসহ্য গরম বোধ করতে লাগল। সোলেমানের ছদ্মবেশ ধরার তার মোহিনী শক্তি লোপ পেল। সে সিংহাসন ফেলে পালাল। আর পালাবার সময় সোলেমানের আংটিটি সমুদ্রে ফেলে দিয়ে গেল।

এদিকে সোলেমান একদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রতীরেই শুয়ে পড়েছিলেন। তখন একটা সাপ এসে গাছের ডাল দিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে লাগল।

এদিকে জেলে সর্দারের অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বাড়ি থেকে বাবার জন্য খাবার নিয়ে আসছিল। সে দেখতে পেল সমুদ্রতীরে এক সুপুরুষ মানুষ শুয়ে আছে, আর তাকে সাপ বাতাস করছে। দেখে তার চক্ষুস্থির। নিশ্চয় এ যে সে মানুষ নয়।

জেলেকন্যা ছুটে গিয়ে তার বাবাকে সব বলল। আর বলল, তাকে সে বিয়ে করতে চায়। তখন জেলে সর্দার এসে দেখে, সোলেমান, তাদের চাকর। 'আরে এ যে চাকর, একে বিয়ে করবি কি রে!'

কিন্তু মেয়ে গোঁ ধরল। একেই বিয়ে করবে। সর্দারের মেয়ে শৈশবে মাকে হারিয়েছে। সাগরকূলে সে বড় হয়েছে। সাগরের মতো তার সুনীল চোখ। সাগরের

মতোই তার বুকে উদ্দামতা। সর্দারকে রাজি হতে হল মেয়ের বায়নায়। সোলেমানকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে হল। সোলেমান অবাক। প্রমাদ গুনল। এও কি সম্ভব? আমি আপনাদের কাছে কাজ করি, যা পাই তাতে আমার নিজেরই চলে না, বিবিকে খাওয়াব কি?

'মেয়ে আমার তোমার কাছ থেকে দেন মোহর নেবে না। আর আমি তার খাওয়া পরার ভার নেব। আর আমার মেয়ে ছাড়া কে আছে! দিব্যি চলে যাবে। সাগর দেবতার ওপর ভরসা রাখলেই হল।'

'আপনাদের ওই সাগর দেবতা টেবতা কী সব, ওসব আমি মানি না। আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে হলে ওসব ত্যাগ করতে হবে। আপনাদের মুসলমান হতে হবে।'

তাদের রাজি হতে হল। তারপর সোলেমান জেলে সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করলেন।

এদিকে সেই যে সকরা দৈত্য পালিয়ে যাওয়ার সময় আংটিটি সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল, সেই আংটিটিকে এক মাছ গিলে ফেলল।

একদিন জেলেরা গেল সোলেমানকে নিয়ে সেখানে মাছ ধরতে যেখানে সকরা দৈত্য আংটিটি ফেলেছিল। আল্লার নির্দেশে সেই মাছটাও ধরা পড়ল। আর মাছ ভাগাভাগির সময় সোলেমানের ভাগে সেই মাছটি পড়ল।

সোলেমানের নতুন বিবি মাছের পেট কাটতেই, আংটি বেরিয়ে এল। আর আংটির জ্যোতিতে ঘর ভরে গেল। বিবি আশ্চর্য হয়ে সোলেমানকে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিল।

সোলেমান গিয়ে দেখলেন, তাঁর সেই হারানো আংটিটি ফিরে এসেছে। আংটিটি চেনামাত্রই হাতে পরে নিলেন। আর অলীক ঘটনা ঘটে গেল দেশের যত জিন পরী, পশুপাখি, পোকামাকড় যে যেখানে ছিল সবাই সেখানে এসে হাজির হল। তাঁর সেই সুবিখ্যাত সিংহাসনটি বায়ুভরে তাঁর দিকে ছুটে এল। জেলেপাড়ায় নেমে এল সম্রাট সোলেমানের রাজধানী।

৫

তারপরে আর-একটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। পাকা দুদিন দু রাত একা একা থাকছে শফী। তাকে কেউ ঘাটাতেও আসে না, গত রাতে দশটার পর রাস্তায় রাস্তায় নানাস্থানে টহল দিয়ে এসেছে। আজকেও রাতে বেরিয়ে পড়ার মনে মনে প্রস্তুতি কষছে শফী। ব্যবসার হিসেবপত্তর নানা ফিরিস্তি ম্যানেজার দেখিয়ে গেছে সকাল দশটায়। খাবার নাস্তা তার ঘরেই পৌঁছে যাচ্ছে। দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করছে, আর ঘুমচ্ছে। আর মন খুলে কল্পনায় যাচ্ছে। সে তার মতো করেই কল্পনায় যায়। ঘুরে বেড়ায় কিস্‌সাকাহিনীতে। বেশ বুঁদ হয়ে থাকা তার।

এখন রাত নটা। একটু পরেই বেরিয়ে পড়বে সে। মসজিদে যাচ্ছে না, বাড়িতেই

নামাজ পড়ে নিচ্ছে।

তার কল্পনায় চরিত্রগুলো তার মতো করেই ঘটনায় যায়, তার মতো করে কথা বলে। অদ্ভুত এক স্বাদ পাওয়া যায় তাতে।

যখন সন্ধ্যা ঘন হয়ে নেমেছে, আর সেই মাত্র লোডশেডিং হয়ে গেছে। দেওয়াল ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা বাজে।

সবার নজর ফাঁকি দিয়ে আড় ঘোমটায় এক মেয়েলোক টিপি টিপি পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠে এল তেতলার ঘরে। ঘরের দরজা খোলাই থাকে। নিঃসাড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। শফী ছিল পালঙ্কের বিছানায় বালিশে পিঠ ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে দেওয়ালে কাবা শরীফের ছবির দিকে তাকিয়ে। ছায়া নড়ে ওঠা আর শাড়ির মৃদু খসখসানি পেল আর কিছু একটা সুগন্ধির ঘ্রাণও পেল। বুঝতে পেরেছিল কোনো মেয়েলোক এসে ঢুকেছে। সে তাকায়নি পেছন ফিরে।

মেয়েলোকটির মধ্যে লজ্জা আর সহসা দ্বিধা এসে পড়ল। সে মনে করল এখনও পর্যন্ত শফী জানেনা সে ঘরে এসেছে, তাই বারান্দায় চলে যায়। নিজের আগ্রহে উদ্যোগে আবার সেই পুরুষের সামনে আসতে হচ্ছে, তা কম লজ্জা নয়, কম আত্মগ্লানিকর নয়। দেখা করবে কি করবে না সেই নিয়ে শাহনাজের প্রচুর দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। শেষমেষ মরীয়া হয়ে ছুটে এসেছে। দুদিন আগে পর্যন্ত এ লোকটির বিবি ছিল কিনা! বিবাহিত বিবি হিসেবে প্রথম সাক্ষাতের যে র অনুভব-অপেক্ষা ছিল, সে সব তো ঘটেনি, ফলে তার আভা মনে এখনও র গেছে। পারল না, ঘরে ঢুকেই গলা খাঁকারি দিয়ে তার আসা জানান দিতে। তাকে সেই ঢোকার মুহূর্তে দেখতে পায়নি বলে সেই সুযোগে সে চলে যায় বারান্দায়।

বারান্দায় অন্ধকারের ছায়া বেছানো আছে। আর হাওয়া মিষ্টি। আঁচল উড়ে যায়, ঘোমটা খুলে যায়। তাকে দেখতে পায়নি যেহেতু, এই বারান্দায় অন্ধকারে শাহনাজের ঘোমটা খুলে গেলেও কিছু যায় আসে না। সে এই সুযোগ পায়, এসে আসেনি। শফীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ঘরে ঢুকেও, সাক্ষাৎ করতে ঘরে ঢোকেনি। আত্মগোপন করে আছে বারান্দায়। দেখা না করে, তার বলার কথা না বলে কোনো এক সময় চুপি চুপি পায়ে নিঃসাড়ে নেমে যেতে পারে। ফিরে যেতে পারে তার নিচুতলার ঘরে। যেন সে আসেনি শফীর ঘরে।

তেমন ভাবনায় ছায়ানন্দিত বারান্দায় হাওয়ায় হাওয়ায় ভরে উঠতে থাকে। একটু থাকার পর আঁচলে দাঁত কেটে ভাবে, দেখা করলেই হয়। দেখা করতে তো এসেছে। যা ঘটে যাবার তো ঘটে গেছে। লোকটার কাছ থেকে সে তালাক খেয়েছে। সে সম্পর্ক ফিরিয়ে আনবার জন্য তো আসেনি, তাহলে দ্বিধার এক সঙ্গত ব্যাপার থাকত। সে সব চুকে বুকে গেছে। এসেছে সত্যি সত্যি তো এ ভিন্ন কারণে। আসবে কি আসবে না এ নিয়ে যত ভেবেছে তার চেয়ে সে ক সমস্যাসঙ্কুল নয়। তার বিয়ের কারণেই মেয়ের বিয়ে ভেঙে গেছে। ভাল মতে দেওয়া-থোওয়া করলে বিয়ে দিতে কতক্ষণ। শফীর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে, দশ

শ হাজার টাকা দিতে আর কি অসুবিধে। শফী ভুল করে তাকে বিয়ে করেছিল, ল নির্বাচন ছিল, যে রাতে সে শফীর বাড়ি এল, সে রাতেই শফী বুঝতে পারে ল হয়েছে। শফী ভুল করে নির্বাচন করে, বিয়ে করেছে, তার জন্য তালাক তে হয়েছে, এসব কিছু মেনে নিল শাহনাজ, কিন্তু শাবানার যে ক্ষতি হয়েছে, ার একটা ব্যবস্থা করে দিক।

চুপি চুপি এসেছে, চুপি চুপিই দিক না হয় শফী। একটা কাকপক্ষীকেও বলবে া। তার ডানহাত জানবে, বাঁ হাত জানবে না।

আর সে-কথা বলতে তো হবে শফীকে? শফীর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গলা াকারি দিয়ে তার উপস্থিতি জানান দিল না। শফী নিজে থেকে আলমারি খুলে াকা বের করে দিয়ে দেয় কী করে?

শাহনাজ চুপি চুপি দাঁড়িয়ে থাকে বারান্দায় নরম অন্ধকারে। ভাবছে, দেখা রবে কি করবে না। শফী টের পেয়েও জানতে দিচ্ছে না, শাহনাজের উপস্থিতি টর পেয়েছে। তেমনি কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে আছে।

বারান্দায় ঝুঁকে কামিনীগাছ খুঁজতে লাগল শাহনাজ। অদ্ভুত সুগন্ধ ভরে আছে াতাসে। কৌতূহলে সে অন্ধকারে খুঁজছে কামিনীগাছ। হাওয়া ঠেলে উড়িয়ে দিচ্ছে ার আঁচল।

রাত বাড়ছে। বাড়িতে ফিরবে একা মেয়েমানুষ। যে কাজে এসেছে, সে কাজ া সেরে চলে যাবে? মনে মনে সাহস ভরিয়ে তোলে। বলবে তার সেই দুর্দশার থা। তাকে বেশ কিছু টাকা দিতে হবে।

শফী বুঝতে পারে ঘরের ভেতর টিপি টিপি পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে শাহনাজ। ানতে পেরেও না জানার ভান করে পড়ে থাকে।

এবার গলা খাঁকারি বাজে।

শফী তাকায় না। চাপা স্বরে বলে, 'কে?'

'আমি।'

'আমি কে?'

কিছুক্ষণ নীরবতা। পরিচয় দিতে দ্বিধান্বিত।

'বলছ না তুমি কে?'

'আমি শাহনাজ।'

'ও। কেন তুমি এসেছ আমার কাছে?'

'আর কোনোদিন আসব না। চুপি চুপি এসেছি।'

'মতলব?'

'আমার মেয়ে শাবানার বিয়ে ভেঙে গেছে।' নাকি স্বরে কেঁদে ওঠে াহনাজ।

'তার জন্য আমি কী করতে পারি?'

'কিছু টাকা যদি দেন বিয়ে দিতে পারি।'

'যদি তার বিয়ের সমস্ত দায়িত্ব আমি নিই?'

'তাহলে তো আরও ভাল হয়।'

'কত টাকা লাগবে? এক লাখ দু লাখ? যার সঙ্গে বিয়ে দিতে বলব ত সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে কিন্তু।'

'পাত্র কি চেনা আপনার?'

'পাত্র কে আমি ছাড়া বিশেষ কেউ জানে না, রাজি তো?'

'হ্যাঁ জি রাজি। কিন্তু কে সেই পাত্র?'

শফী চুপ করে থাকে। শাহ্‌নাজের কথার উত্তর দেয় না।

'বলছেন না যে? অন্ধ, খোঁড়া নয় পাগল সে?'

'না সে গোটাগুটি মানুষ। আমাকে দেখে কি মনে হয় পাগল আমি?'

'আপনি পাগল হবেন কেন? আপনাকে কে পাগল বলবে?'

'আমিই সে পাত্র, আমার সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে।'

'তওবা তওবা। আপনার মুখ থেকে একি শুনছি! সে তো অন্যায় হ বেশরিয়তি হবে। আপনি এমন মানুষ হয়ে বেশরা কথা বলেন কি করে?'

হো-হো করে হেসে ওঠে শফী। 'তুমি আমাকে শরিয়ত শেখাতে এসেছ? হাত কাপড়ে ল্যাংটা মেয়েমানুষ! তোমার মেয়েকে বিয়ে করলে আমার কো গুনাহ্ হবে না, বেশরা কাজ হবে না।'

'না না না। সে হয় না।'

'আস্তে। আমার সামনে বেয়াদপি কোর না। যা জান না তা নিয়ে কথা বে না।'

'ছিঃ ছিঃ ছিঃ, মুখে আনলেন কী করে অমন জঘন্য কথাটা? গলায় দড়ি জে না আপনার?'

'বেয়াদপ মাগি, যা জানিস না তা নিয়ে কপচাচ্ছিস কেন?'

'বেশ করব। আমার টাকার দরকার নেই। মেয়ের আমার বিয়ে না হয় হবে।' ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় শাহ্‌নাজ। এই রোষ দেখিয়ে শাহ্‌নাজ বেরিয়ে যেতে দেয় শফী তার কল্পকাহিনীতে। কেন না, সমাজের ধ্যান-ধারণা বুঝ এমন একটা পরিণতিতে যেতে চাইছিল। যেখানে সমাজ একটা ভুল ধারণা পো করছে, আর শফী সঠিক ধারণা। সেই দ্বন্দ্বটা গড়ে তোলার জন্য শাহ্‌নাজকে ওভ চলে যেতে দেয়।

কল্পনায় ইচ্ছে করলেই তো শাহ্‌নাজকে রাজি করাতেই পারত। শাহ্‌নাজ কথা ভেবে রাজি হত, অত বড় জ্ঞানী-গুণী মানুষটা যখন বলছে, তাতে কো ভুল নেই। তার কথা মেনে নেওয়াই অজ্ঞ মেয়েমানুষের পক্ষে ভাল হবে। f না ভুল সে সব তর্কের কী জানে শাহ্‌নাজ।

শফী কল্পনায় যে ঘটনা সাজিয়েছে, তার পরিণাম এই জায়গায় নিয়ে গি সমাজকে নিয়ে ভাবে।

কল্প ঘটনায় যাওয়ার পর বেশ চনমনে লাগে। এখন সবে রাত নটা বাজে। দশটার পর বেরবে মেটিয়াবুরুজের রাস্তায় রাস্তায়। সে একরকম আনন্দদায়ক ঘোরাফেরা হবে তার।

ঘণ্টাখানেক পরে ততক্ষণে রাস্তার ভিড় অনেক কমে যাবে।

বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াতে কেমন যেন গায়ে শিহর খেলে যায়। বারান্দার দিকে চোখ পড়তে যেন তার চোখে পড়ল একটা আঁচল যা বারান্দার হাওয়ার ঝাপটায় খানিকটা উড়ে এসেছে ঘরের দিকে। অদ্ভুত সত্যিকারের দৃশ্য। যেন সত্যিই কেউ বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। কেমন গা শিরশির করতে লাগল শফীর। নাকি সে ভুল দেখেছে? নাকি তার এ বিভ্রম? পায়ে পায়ে বারান্দায় গিয়ে দেখতে বাস্তবতার ত্রাস অনুভব করে। নিশ্চিত করে কেউ আছে বারান্দায়। হাওয়ায় উড়ে আসা আঁচলের টুকরো সে দেখেছে আর সে একজন মেয়েমানুষ। একটু আগে কল্পনায় ওখানে শাহনাজকে রচনা করেছিল, তার রেশ ফুরিয়ে যেতে না যেতে বাস্তবে কোন এক মেয়েমানুষ এসে ভিড়েছে। অদ্ভুত দ্বন্দ্ব হয় তার। কাকে সে দেখবে? কার সঙ্গে সে বাস্তবতার মুখোমুখি হবে। সে তো চায়নি কোনো বাস্তব সম্পর্কে যেতে? সেজন্য সে তার তেতলা ঘরে একা একা থাকছে, আর কল্পকাহিনীতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় কারও সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা তার ইচ্ছা-বিরোধী ঘটনা হবে। একাকিত্বের স্বাদ থেকে তাকে উপড়ে ফেলা হবে। কিন্তু না, যে এসেছে তার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া ছাড়া তার কোনো উপায়ও নেই। বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে না। বাস্তবতাকে রোধ করতে পারে, তার সমস্ত পথ বন্ধ করে একা ঘরে দিবসরজনী কাটাতে পারে, কিন্তু চোরাপথে একবার বাস্তবতা এসে পড়লে, তার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া তার আর উপায় থাকে না।

কিন্তু কে হতে পারে? এই প্রশ্ন তার মনের মধ্যে উদয় হয়। নিশ্চিতভাবে কাউকে অনুমান করতে পারে না। সম্ভাব্য কেউ যে আসতে পারে তার হদিস করতে পারে না।

তাই চুপটি করে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকে শফী। আর কাবার ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মনের ভিতরে তার অদ্ভুত তরঙ্গ, অথচ বাইরে সে স্থির, অনড়, শান্ত।

৬

শওকতউল্লার বাড়ি না বলে লোকে 'হীরামন ড্রেস'-এর বাড়ি বলতে বেশি পছন্দ করে। তেমনটা চালুও খুব। সেই বাড়ির মেজ বউ শবনম পরভিন। শওকতউল্লার মেজ পুত্রবধু। গতকাল সকাল থেকে নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। কেমন দম বন্ধ হয়ে উঠছিল। ওই যে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল চেঁচামেচিতে! তার চাচাশ্বশুর নতুন বিবিকে তালাক দিল খুব ভোরে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পরভিনের দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

গত সন্ধ্যায় কি সুন্দর একটা ঘটনা তারা উপহার পেয়েছিল। চাচাশ্বশুরে বউ এল। কি সুন্দর গড়ন গঠন। মিশুকে। মাঝবয়সে পৌঁছে যাওয়ার জন্য কথা ব্যবহারের মধ্যে স্পষ্টতা মুগ্ধ করেছিল। যথারীতি তাকে বরণ করে নেওয়া হল অনেক রাতে তাকে তুলে দেওয়া হল চাচাশ্বশুররের ঘরে। চাচাশ্বশুরের কোনে তালের ঠিক থাকে না, কখন আসে না আসে, পুত্রবধূরা সঙ্গে করে তাকে তুলে দিয়ে এসেছিল শফীউল্লার ঘরে।

এক ধরনের হর্ষপুলকে ছিল। হীরামন ড্রেস পরিবারে তিন বছর হল এসে পরভিন। কোনো দিনটিকে আলাদা নতুন করে মনে হয়নি, সব দিন একঘেয়ে একই রকমের। শাহনাজ আসার সন্ধ্যাটি ছিল পরভিনের বিবাহিত জীবনে অন্যত আনন্দমুখর এক সন্ধ্যা। অনেক রাত পর্যন্ত সে তার পুলক যাপন করে পেরেছিল। কিন্তু ভোরবেলার ঘটনা বিষাদময়তায় ছেয়ে দেয়। এ অন্যায়, এ অন্যায় তার পরেই শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। যে বাতাস ফুসফুস টানে তাতে প্রাণ নেই, কেম দম আটকে আসতে থাকে।

অন্তঃপুরে আর অন্য সব মেয়েদের শরীরিক নানা অসুবিধের কথা জানতে পারে সে। হ্যাঁ, এই সংসারে আসা তার একটা দুর্ঘটনা। স্বামী আশিক এইট পর্য পড়েছে, আর সে বি এ. পাশ। কেমন করে কি করে যেন দুর্ঘটনার মধ্যে দি তার এ বাড়িতে বিয়ে হয়ে গেল। মেটিয়াবুরুজে সব চেয়ে বড় ওস্তাগার হীরাম ড্রেসের মালিক শওকতউল্লা মেটিয়াবুরুজে গরিব ঘরের যে মেয়েটি কষ্ট কে বি. এ পর্যন্ত পাশ করেছে, বাড়ির শোভা বাড়ানোর জন্য ছোঁ মেরে তাকে তু আনবেই। তারা গরিব, সেই দুর্বতার সুযোগ পেয়েছে।

সেই যে হঠাৎ করে তার আশিকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল, সেই ঘটনা কথা ভুলতে পারে না পরভিন। বাবা পোর্ট ট্রাস্টের সাধারণ একজন ফিটার আরও দুই মেয়ে আছে তার। দুই দাদারা পড়াশোনা করে চাকরি-বাকরি পায় না। বাবার চাকরি ফুরোতেও বেশি দেরি নেই, বছর দুই বাকি ছিল। সার্ভিসে টাকায় আর দুই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো! এমন বড়লোকের ঘর থেকে বিয়ে প্রস্তাব এসেছে, বিনা পণে বিয়ে হয়ে যাবে, এমন সুযোগ হাতছাড়া নির্বোধ ছা আর কে করে!

সে এক দুঃসময় গেছে তার। বাবা মা ভাই বোনেরা কেউই জানতে পার না নাসের মাস্টারের সঙ্গে তার প্রেম আছে। অথচ নাসের মাস্টার সৎ, ভা ছেলে। বড়তলা হাইস্কুলে মাত্র দেড় বছর চাকরি জোটাতে পেরেছে। এলাক সুনাম না থাকলে, মেটিয়াবুরুজের ছেলে মেটিয়াবুরুজের স্কুলেই চাকরি জোটে ন স্কুলের সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট আরও অনেকে নাসেরের চাকরি তাদের স্কুলে হো চেয়েছিল। কেমিস্ট্রিতে অনার্স। বি. এডও করেছিল। পরীক্ষা দিয়ে সরকারি অথ ব্যাঙ্কের চাকরি জোটাতে পারত, কিন্তু শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বুকের মধ্যে, তা কাছে অন্য চাকরি তত মূল্যবান নয়। যদি এলাকার স্কুলে তার চাকরি না হ

হলে সে যেমন টিউশনি করিছল, তেমনি টিউশনি করে জীবন কাটিয়ে দেবে, মন সংকল্প করে ফেলেছিল।

পরভিনকে নাসের মুগ্ধ করে বেশি তার প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা, আদর্শনিষ্ঠা ার আত্মসম্ভ্রমবোধের জন্য। নাসেরের প্রেরণাতেই তার বি. এ পাশ সম্ভব হয়েছে। বা তো পড়া বন্ধ করে দিয়েছিল, নাসের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করায়। নিজে য়ে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিল আশুতোষ কলেজে। আর দু-চারদিন নিজে সঙ্গে রে দিয়ে এসেছিল কলেজে।

সে সব দিন, আহা! সে-সব দিন কোথায় গেল? তার স্বামী ভাশুর শ্বশুর শুধু কা রোজগার করছে। আর শবনম এই তিনতলা বাড়ির মধ্যে মেয়েদের ভিড়ে ধুই মেয়ে হয়ে উঠছে। মেয়ে হয়ে জন্মানো কি অপমানের, সে-কথা বিয়ে হওয়ার রে তার এই বসবাসের ভিতর দিয়ে বুঝছে। সব দিনগুলো একই রকম, সব তগুলো আগের রাতগুলির মতো পূর্বনির্দিষ্ট। এমনিতেই হীরামন ড্রেস পরিবাবের ন্তঃপুরে দিনযাপন করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তার পর ক একটা ঘটনা এমনভাবে বুকের ওপর চেপে বসে যে তার ভার বইতেই পারে া, বড় শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আর আশিক স্বামীর ব্যবহার, সে-ব্যবহার তো দ্ভুতরকম, যেন স্বামীর মন নেই, সে কোনো মনের কথা জানে না। সারাটা দিন ভাবে কাটে পরভিনের কোনো দিন রাতের বিছানায় একদিন একবারের জন্যও খোয় না। শবনম লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ে অবসর সময়ে। আশিক বই তা পড়ে না, বই নিয়ে কোনো কথাও বলে না। বরং বই পড়তে দেখলে বিরক্ত য়। সারাটি দিন স্বামীর সঙ্গে তার দেখাই হয় না। দেখা হওয়ার যে সুযোগ নেই, া নয়। সে সুযোগ তৈরি করে না আশিক। দেখায়, কাজ নিয়ে পড়ে থাকে। াসলে আশিকের মধ্যে পরভিনের সঙ্গে সম্পর্কে আসার এক দৈন্য আছে পরভিন াঝে। এস বি. এ পাশ আর আশিক এইট পাশ, স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক চনা করতে আশিকের দিক থেকে এক হীনম্মন্যতা বোধ কাজ করে। রাতের িছানা ছাড়া আর অন্য কোনো সম্পর্ক নেই, অন্য কোনো যাপন নেই, অন্য কোনো থা নেই। আশিককে শরীর তো সমপর্ণ করে দেয় পরভিন, কিন্তু মনের কী য় আশিকের, আশিকের মনও তো নিতে চায়, আশিকের কাছে মনও তো সমর্পণ রতে চায়, কিন্তু আশিক মন দিতে পারে না, নিতে পারে না। আশিকের সঙ্গে াম্পত্যে থেকেও এই দাম্পত্যহীন তার অপমানকর গ্লানি সহে যেতে হয় রভিনকে দিনের পর দিন।

এমন মনে হয় তখন আশিকের সঙ্গে দাম্পত্যে থেকেও, আশিকের কেউ নয়, স, আশিকের স্ত্রী পরিচয় নিয়ে তার মনের মিলন অন্য কারোর সঙ্গে করতে াধ্য হচ্ছে। সে মন নির্দিষ্ট কোনো পুরুষের নয়। নাসের মাস্টার, সে তো অন্য ুরুষ, তার তো স্বামী নয়!

নাসের মাস্টার একটা মোহময় জীবন বটে, নাসের মাস্টারকে জীবনে না পেয়ে

আশিকের বউ হিসেবে আসার মধ্যেই নাসের মাস্টারকে পাওয়া চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে পরভিনের কাছ থেকে। নাসের মাস্টারের সম্পর্কে যাওয়া আশিকের স্ত্রীত্বে থাকার পরিচয়ের ভিতর দিয়েই যাওয়া। এই বাড়িতে নাসের মাস্টারকে পরভিনই এনেছে।

মাত্র সাত মাস হল নাসের মাস্টার এ বাড়িতে আসছে। তার ছোট ননদ নাফিসাকে পড়াতে আসে। নাফিসা ক্লাস নাইনে পড়ে। একমাত্র নাফিসাই এ বাড়িতে এইটের পর পড়ছে। শফীউল্লার কথা আলাদা। শওকতউল্লার ছেলেমেয়েরা কেউই এইটের বেশি যায়নি। ছেলেরা তো কম বয়েসে ব্যবসায় যুতে যায়, তারা যেমন সুযোগ পায়নি, পড়াশোনা করার মানসিকতা ছিল না। পরভিন এ বাড়িতে এসে নাফিসার পড়াশোনার ওপর নজর দিয়েছিল। নিজেই পড়াত। নাইনে উঠল যখন মাস্টারের প্রয়োজন হল। পরভিন শওকতউল্লাকে দিয়েই ব্যবস্থা করায় নাসেরকে পড়ানর। সপ্তাহে তিন দিন এ বাড়িতে এসে নাসের মাস্টার পড়িয়ে যায়, পরভিনের এই অসহনীয় অন্তঃপুরের জীবনে খানিকটা শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস জুটল।

নাসেরের সঙ্গে নিভৃতে কোনো কথা হয় না। নাসের সসম্মানে আসে, সসম্মানে পড়িয়ে চলে যায়। নিয়মিত দেখা হয়, স্বাভাবিক কথা হয়। এবং নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও জুটে যায়। সবই স্বাভাবিক, সৎভাবে ঘটে। পরভিনের মধ্যে আশিকের স্ত্রীত্বে থাকার কোনো রকম বিরোধিতা সেই ব্যবহার আর দেখাশোনার ঘটনার মধ্যে থাকে না। এই ঘটনা সুস্থ জীবনকেই নির্দেশ করে।

নাসেরের এ বাড়িতে নিয়মিত আসার মধ্যে একরকম জীবন খুঁজে পেয়েছে পরভিন। একরকম বাঁচাও জুটেছিল তার। এক ধরনের বন্ধুতা গড়ে উঠেছে নাসেরের সঙ্গে। বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে চলে আসার পর, নাসেরের সঙ্গে দেখা ঘটত না তার, আজ দেখা হয়। আর কথা হয়। তখন ভাবত নাসেরেরই জীবন-সঙ্গিনী হবে। এখনকার দেখা হওয়ার ঘটনার মধ্যে সে কথা ভাবে না। তবে মনটা সুস্থ হয়ে ওঠে, গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। এই দেখা হওয়া, কথা হওয়া, বন্ধুত্ব মেনে নিয়েছিল বলেই নাসের এ বাড়িতে এসে পড়াচ্ছে।

এখন আর ভাবে না, কেন পরভিনের সঙ্গে নাসেরের বিয়ে হল না। বা কেন নাসেরকে জীবনে পেল না। নাসের তার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। স্কুলে নাসেরের কাছেই পড়ত। নাসেরের হাত দিয়েই পৃথিবী চিনেছিল। মা বাবাকে কোনোদিন জানাতে পারেনি। আর নাসের সেই সময় মাস দেড়েক ছিল না, সেই সময় চট করে বিয়ে হয়ে যায়। নাসেরের কাকা-জ্যাঠা ফুপুরা বাংলাদেশে থাকে, তারা প্রতিষ্ঠিত। সেখানে সেই সময় যায় নাসের। আর এদিকে পরভিনের বিয়ে হয়ে যায়। তার আব্বুর কাছে এসে যে নাসের সেই সময় পরভিনকে দাবি করবে চাইবে, সেই সুযোগ পাওয়া যায়নি। একটা দৈব দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে পরভিনের বিয়ে হয়ে যায়।

বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে নাসের পরভিনকে পেল না। ঘটনাটা এই দাঁড়াল। ারভিন অপেক্ষা করার মতো সময় পায়নি। ঘটনাটা কেমন যেন দুর্ঘটনার মতো। ।াসেরকে তার ভালোবাসার কথা তার আব্বুকে জানাতে পারল না। নাসের ।াংলাদেশ গেছে, যদি ফিরে না আসে? আর তার তো সেখানে অনেকে আছে, য়তো ফেরা হল না, তখন কী করবে? বড়ই সঙ্কটে পড়েছিল পরভিন। নাসেরকে ালো লাগা, নাসেরের প্রতি ভালবাসা সব জলাঞ্জলি দিতে হল। নাসেরের সমস্ত কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে উনুনের আগুনে দিতে হল। নাসের ফিরল যখন খন তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। শওকতউল্লার মতো অমন বড়লোকের নজর তার পর পড়েছিল, তাকে ছোঁ মেরে নেবেই। পরভিন ছিল নিরুপায়। নীরব অশ্রুপাত রেছে, আর দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে।

আশিকের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর আশিককে মেনে নিতেই হয়। তাছাড়া আর ী উপায় থাকে পরভিনের? মেজ বোন শাহীনকে সব জানিয়েছিল পরভিন, এবং াতের বিছানায় একদিন রাতে শাহীনের গলা জড়িয়ে খুব কেঁদেছিল। শাহীন যে াদের প্রণয়ের গোপন কথা জানত, এ কথা নাসের জানত। বাংলাদেশ থেকে ফরে এসে শাহীনের সঙ্গে দেখা করেছিল। আর পরভিন জানতে পেরেছিল, নাসের মন দৃঢ়চেতা মানুষটি শাহীনের সামনে খুব কেঁদেছিল। জীবনের এক নিরুপায়তার ামনে, পরাজয়ের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল নাসেরকে। শাহীন তাকে সে-সব ানিয়েছিল। নাসের তাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখত, কত সাধ ছিল তার, সে সব থা অশ্রুনয়নে বলেছে নাসের শাহীনকে। সে সব কথা শুনে পরভিনের বুক ফটে যায়। একদিন রাত জুড়ে আশিকের পাশে শুয়ে বালিশে মুখ ডুবিয়ে খুব কেঁদেছিল পরভিন। আশিককে জানতে দিয়েই কেঁদেছে, লুকিয়ে গোপনে কাঁদতে ায়নি। কেন কাঁদছে, আশিক জানতে চেয়েছিল, পরভিন নীরব থেকে গেছে। তেমন রে কাঁদতে কাঁদতে তার রাতও ফুরিয়ে যায়। তারপর থেকে আর কোনোদিন াসেরের জন্য সে কাঁদেনি।

এক বছর হল শাহীনের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়েতে গিয়েছিল পরভিন। নাসেরের ঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। আর আশিকের স্ত্রী পরিচয় নিয়েই নাসেরের সঙ্গে েশেছিল, কথা বলেছিল।

বিয়ের কয়েক দিন বাপের বাড়ি রাজাবাগানে থাকার সুবাদে নাসেরের সঙ্গে বেলা দেখা হত, কথা হত। এখনও সেই সব দিনগুলো মনের ভিতর জ্বলজ্বল রে উঠছে। নাসের একা একা কথা বলতে চেয়েছিল। ছাদে গিয়ে তারাভরা াকশের তলায় তারা কথা বলেছিল। কথা বলেছিল যতখানি, তার চেয়ে বেশি রব থেকেছে। সে আর নাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, আর তাদের মাঝখান দিয়ে কটা হিম নদীর স্রোত বয়ে গেছে। বয়ে গেছে অনেকটা সময় জুড়ে নীরবতা। কী বলবে তারা, বিশেষ কিছু বলতেই পারেনি। অনেকটা সময় জুড়ে দুজনে মুখের দিকে, চোখের দিকে তাকিয়েছিল। এক সময় নাসেরের দিকে

তাকাতে পারেনি, মনে ভীষণ বেদনা এসে জড়ো হয়েছিল, চোখ নামিয়ে নে আর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। সে একজন মেয়ে বলেই কি এমন কা কাঁদাবার অধিকার দুজন পুরুষ পায়? আশিককে মেনে নিয়ে কাঁদছে, নাসেরে মুখোমুখি হয়ে।

নাসের বুঝিয়েছিল, যা ঘটে গেছে, তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে ন পরভিন তার মনটাকে সুস্থ রাখলেই নাসের সুখী। তারপর নাসের তার কা মুছিয়ে দিয়েছিল কথা বলে বলে। একফোঁটা স্পর্শ করেনি। পরভিন চেয়েছি বোধহয় নাসের তাকে অন্তত একটিবারের জন্য স্পর্শ করুক, তার হাতা একটিবারের জন্য ধরুক, কিন্তু নাসের তা করেনি। তাদের মাথার ওপর উপু হয়েছিল তারাভরা সন্ধ্যার আকাশ।

সেই সন্ধ্যার কথা খুব মনে পড়ে পরভিনের। কী মোহময় আর কি অপূ সন্ধ্যা। সে আর নাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। নতমুখে আঁচলের খুট আঙুলে জড়ি যাচ্ছে পরভিন। একটা সিগারেট ধরাল নাসের। তারপর ছাদের অন্য প্রান্তে গি পায়চারি করে এল খানিকক্ষণ। কিছু কথা যেন ভেবে এল। মনের ভার যে হালকা করে এল। আবার এসে দাঁড়াল মুখোমুখি। এবার তার মধ্যে শা স্বাভাবিকতা। জীবনে পরভিনকে না পাওয়ার বেদনা নিয়ে কথা বলে উঠছে ন পরভিনের বিয়ে, স্বামী মেনে নিয়ে বন্ধুভাবে কথা বলছে। মন যাতে ভাল থা সে সব কথা বলছে। আর তার ভিতর নাসের আরও তার কাছে আকর্ষক মোহময় হয়ে উঠছে। কি অপূর্ব ব্যক্তিত্ব নাসেরের। কী মোহনতায় ভরে উঠছে হাতের আঙুলগুলির মধ্যে নিভাঁজ দৃঢ়তা। এই মানুষটাকেই জীবনে হারিয়ে ব আছে। এক সময় সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নেমে আসে পরভিন।

তখনও ছাদের ওপর নাসের থাকে। নাসেরকে থাকতে দেয়। নাসেরের কা প্রকাশ করতে পারে না তার জীবনের পরাজয়ের কথা। আশিকের সঙ্গে তা সম্পর্কের অন্ধকারতা নিয়ে কথা বলতে পারে না। বলতে পারে না সে সু নয়। বলতে পারে না তার শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এ সংসারের ভিতর। বলা পারে না বাঁচতে তার কষ্ট হয়।

সে সব খবর জানলে, সে সব সত্যের সন্ধান পেলে নাসের খুব কষ্ট পাবে তার চেয়ে নীরব থাকাই ভাল। নাসের বুঝল না হয় পরভিন সুখে আছে, স্বামী সোহাগে আছে। তার কোনো আর্তি নেই। সে যে সে সব জানাবে, তার কি কো পরিত্রাণের উপায় আছে নাসেরেরর হাতে, যে বলবে? নাসের নাসেরের মা করে থাকে। হয়তো বিয়েও করবে। বিয়ে করবে কী? সে সব কথায় খুব এক যেতে চায় না নাসের। সে দু-চার বছর পরে হলেও চলে। নাসেরের বয়স এমন কিছু বেশি নয়। হয়তো বিয়ে করবে, করা তো উচিত। তা হলেও নাসেরে সঙ্গে দেখা হওয়া, কথা হওয়া যেন তার থাকে। আর কিছু চায় না সে। না হ জীবন হয়ে উঠবে আগের মতো মরা, প্রাণহীন।

নাসের কি অনুভূতি দিয়ে বোঝে না পরভিন এ সংসারে কেমন আছে? নাসেরকে বুঝতে দেয়নি। বলেনি। তবুও তো নাসেরের বোধ আছে বোঝার। হয়তো বোঝে। তার জন্য কি নাসের দুঃখ পায়, বেদনা পায়? জানে না পরভিন এসব কথা। নাসের আসে বসে, পড়ায় আর তার সঙ্গে দু-চার কথা হয়, নাসের ফিরে যায়। সোম বুধ শুক্র এই তিনদিন পড়াতে আসে। সকাল আটটায় আসে, দশটার মধ্যে চলে যায়। নাসের আসায় ভাল থাকার গুনগুনানি অনেকটা সময় পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায় পরভিন। এমনকী বিছানায় যাবার আগে পর্যন্ত।

সব দিন পরভিন আগে শুয়ে পড়ে, আশিক নিজে হাতে বড় আলো নিবিয়ে ছোট আলো জ্বালিয়ে বিছানায় আসে। বড় আলোর ভিতর পরভিনকে পেতে অস্বস্তি হয় বোধহয়। কোনো কথা হয় না, না কোনো কথা হয় না। না আশিক কোনো কথার প্রসঙ্গ তোলে না, যে কথোপকথনের ভেতর দিয়ে তারা অনেকটা রাত গড়িয়ে নিয়ে যাবে। ছোট আলোতে দুজনকে দুজনের দেখা তেমন স্পষ্ট হয় না।

৭

আজ সকালে এক ছাত্রের হাত দিয়ে নাসের একখানা চিঠি পাঠায় শওকতউল্লার নামে। খোলা চিঠি। শওকতউল্লা তার ম্যানেজার ওসমান আলিকে দিয়ে পড়ায়, জেনে নেয় চিঠির মর্মবস্তু। তারপর চিঠিটা পৌঁছে দেয় মেজ বউয়ের কাছে।

পরভিন চিঠিটা যখন পায় ততক্ষণে সাড়ে আটটা পৌনে নটা বেজে গেছে। অপেক্ষায় ছিল নাসের আসবে। চিঠি পেয়ে জানতে পারে নাসের আসবে না। চিঠি পড়তে পড়তে হাত কেঁপে ওঠে পরভিনের। বুক ধক ধক করে ওঠে। মাথা ঘুরে যায়। ব্যক্তিগত অসুবিধে থাকায়, আপনার মেয়েকে আমি আর পড়াতে পারব না। আশা করি আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন। টাকা ছড়ালে কত মাস্টার পাওয়া যাবে, শওকতউল্লা তেমনটাই ভেবেছে। কিন্তু পরভিন চোখে অন্ধকার দেখে। নাসের এ বাড়িতে আসছিল সপ্তাহে তিন দিন। তার আসার ভিতর দিয়ে মন ভাল রাখতে পারছিল। তার ভাল লাগত নাসেরের উপস্থিতি। দু-চারটে কথা বলতে পারত। লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে যে বই পড়ছে, সেই বই নিয়ে আলোচনা করা যেত। কিংবা নাসের বিশেষ কোনো বই এনে দিত, যে বই নাসেরের সংগ্রহে আছে। এক সুস্থ সম্পর্কে ছিল পরভিন। আর নাসের আসবে না? কেন?

চিঠি হাতে করে থ হয়ে যায় পরভিন। ভেবে পায় না, কেন আসবে না নাসের? নাসেরের কী অসুবিধে? নাসেরের কী হল? নাসেরের কি ভাল লাগে না, তাকে দেখতে পায়? না কি নাসের তাতে যন্ত্রণা পায়? ভেবে পায় না। চিঠি পাওয়ার পর গুম মেরে যায়। গলা দিয়ে খাবারও ঢোকে না, কেমন আটকে যায়। খেতেও সাধ যায় না, বসতে সুখ নেই, ভাবতে সুখ নেই। বিষাদময়তায় ছেয়ে যায়। শরীর খারাপ অজুহাত পেড়ে শুয়ে বসে থাকল পরভিন। শুয়ে বসেও সুখ নেই, সুখ নেই ভেবে ভেবেও। নাসের এমন নিষ্ঠুর হতে পারে? সে কি জানে না, এ বাড়িতে

তার উপস্থিতি কত ভাল রাখে তাকে। এখন মনে হয়, নাসেরকে তার সব জানানো দরকার ছিল, সে সুখে নেই, সুখী নয়। আর এ বাড়িতে সে আসে বলে ভাল থাকে। তাহলে নাসের তার ভাল থাকার কথা মনে রেখে এমন নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে পারত না।

কী এমন কাজ পড়ল নাসেরের যে আর পড়াতে আসতে পারবে না? ভেবে ভেবে সারা হয়। তার এমন মনের ভার হালকা করবার কেউ নেই। বাপের বাড়ি যাবে, তার কোনো উপায় নেই। কেন না এ বাড়ি থেকে হুটহাট করে বাপের বাড়ি যাওয়া যায় না। যাওয়াটা হয় আড়ম্বরপূর্ণ, কোনো উপলক্ষকে কেন্দ্র করে। আর বাপের বাড়ি যদি যাওয়া জোটে, সেখানে শাহীনকে পাওয়া যাবে না। কেন না শাহীন শ্বশুরবাড়ি। শাহীনের গলা জড়িয়ে কাঁদলে বোধহয় মনের ভার হালকা হত পরভিনের।

নাসের তো তার ওপর এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে না। নাকি পুরুষমানুষ প্রতিশোধ নেয়, এক সময়? নাসের তো তেমন নয়! ভেবে ভেবে সারা হয়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এদিকে গতকাল তার চাচাশ্বশুর নববিবাহিতা শাহনাজকে তালাক দিয়েছে। সেই ভারের ওপর আরেক ভার এসে পড়েছে পরভিনের মনে। এক অনস্তিত্ব অসহায়তায় ছেয়ে যায়। স্বামীর সঙ্গেও মন খুলে কথা বলবার ব্যবহা নেই। হালকা হবে কী করে?

যদি সম্ভব হত, এ বাড়ি ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেত, তাহলে ভাল হত। কিন্তু কোথায় যাবে? তাকে নিয়ে ঘটনা ঘনঘোর হয়ে উঠবে তাতে। হীরামন ড্রেস পরিবারের মান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন। সেই বাড়ির বউ কোনো অনিময় করতে পারে না। তাহলে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যাবে। সদ্য ঘটনা যে ঘটে গেছে, তার চাচাশ্বশুর তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, তাতে তার শ্বশুর দু হাত তুলে আনন্দ করছে। একটু অনিয়ম করলেই পরভিনের জীবনেও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে পারে কণা মুহূর্তের মধ্যেই

আর এসবের জন্যই তো নাসেরের এ বাড়িতে আসা একটা পরম প্রাপ্তি পরিভনের জীবনে। জীবন বেঁচে ওঠে তাতে। নাসেরকে একভাবে পেয়েও হারিয়ে ফেলল?

বেলা বাড়ল। বাইরে থেকে খবর এল কতরকম। নাসেরই প্রথম শফীউল্লার তালাকের বিরুদ্ধে কথা বলছে। বিশিষ্ট লোকজনদের সঙ্গে কথা বলছে। তখনই একে একে দুই মেলাতে পারে পরভিন। শফীউল্লার খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে খেপেছে নাসের। হঠাৎ করে বিয়ে করল আর তালাক দিয়ে বসল, এ অসামাজিক কাজ, সে নিয়ে নাসের তর্কবিতর্ক করছে, হীরামন ড্রেসের পরিবারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। ভয় হয় পরভিনের, নাসের এ পরিবারের বিরুদ্ধে গেছে, এরা টাকার জোরে সব কাজ করতে পারে, নাসেরের বিপদ ঘটাতে পারে। আবার সৎ প্রতিবাদ করবার জন্য বুক ফুলে ওঠে পরভিনের।

বেলা যত বাড়ে নাসেরের প্রতিবাদের কথা জানতে পারা যায়। ফারজানা

কাজের মেয়ে বাইরে থেকে শুনে এসেছে। কর্মচারীরা সে সব নিয়ে কথা বলছে। ম্যানেজার ওসমান আলিকে শাশুড়ি ডেকেছিল, তার কাছ থেকেও জানা যায়। আর পরভিন ধীরে ধীরে আঘাত সরিয়ে সরিয়ে রোমাঞ্চিত বোধ করতে লাগল।

দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল পরভিন উত্তেজনার অভিঘাতে। ঘুম যখন ভাঙল দেখল নাফিসা তার ছোট ননদ বিছানার গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার উপস্থিতিই ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। 'কি ছোটবুবু, তুমি?'

'ভাবি!'

'হ্যাঁ, বল না?'

'মাস্টার আর পড়াতে আসবে না?'

'হ্যাঁ, তেমন কথা তো জানিয়ে দিয়েছে চিঠিতে।'

'তাহলে আমার কী হবে?'

পরভিন হাসে। 'অন্য মাস্টার তোমাকে পড়াবে ছোটবুবু।'

'সে হয় না। এ মাস্টার পড়ালে ভাল হয়।'

'উনি পড়াবেন না আর!'

'ওই মাস্টার না পড়ালে আমি আর পড়ব না। কেন পড়াবে না? আমি কি মন দিয়ে পড়ি না?'

'দুর পাগলি।' উঠে বসে পরভিন। 'তুই তো মন দিয়েই পড়িস।'

'আমার ওই মাস্টার চাই। 'না, তোমার মাস্টার ছিল, তুমি বললে না করতে পারবে না। তুমি রাজি করাও।'

'আমার কথা শুনবে না। খুব রাগী মাস্টার জানিস তো।'

'তোমার কথা শুনবে।' কেঁদে ফেলে নাফিসা।

'এই কাঁদে দ্যাখো পাগলি মেয়ে। জানিস না কেন তোকে পড়াতে চায় না।'

'জানি ছোট আব্বা নতুন চাচিকে তালাক দিয়েছে বলে।'

'ও বাবা, তুইও এসব খবর রাখিস?'

'পাড়ার লোকে বলছে, অনেকে বলছে, ছোট আব্বু অন্যায় করেছে। আমি কি অন্যায় করেছি যে আমাকে পড়াবে না?'

তাই তো, ছোট মেয়ে নাফিসার কি দোষ? নাফিসা ন্যায্য অধিকারের প্রশ্ন তুলেছে। নাফিসার যুক্তিকে ফেলা যায় না। নাফিসার যুক্তি কি শুনতে পেল নাসের? নাসের পরভিনের কথা, নাফিসার কথা একটুও ভাবেনি। শাহনাজ কি নাসেরের সম্পর্কে কেউ কি হয়? না, তা তো নয়। নাসেরের কেউ নয় শাহনাজ। তবে শাহনাজ গরিব, তাকে বিয়ে করে সঙ্গে সঙ্গে তালাক দেওয়ার ঘটনা, শাহনাজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করা। বড়লোক বলে সমাজ চুপ করে থাকবে? সমাজ চুপ করেই থাকত, না যদি নাসের মুখ খুলত। এ ঘটনা নিন্দনীয়। প্রত্যেকের

সরব হওয়া দরকার। নাসের প্রতিবাদ করেছে, আর গরিব শাহনাজের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আর সে এই বাড়ির শিক্ষকতা আগে ত্যাগ করেছে। তার কথার সঙ্গে কাজের নড়চড় হতে নেই।

নাসের এমনই। এখন বুঝতে পারে, নাসেরের অনুপস্থিতির জন্যই এ পরিবারে পরভিনের বিয়ে সম্ভব হয়েছে। নাসের থাকলে হতে দিত না। যেমন করেই হোক পরভিনের আব্বুর মত করাতো। না হলে ছিনিয়ে নিত পরভিনকে। হীরামন পরিবারের সঙ্গে টক্কর দিতই দিত। ওই সময় নাসের বাংলাদেশ না গেলে কেমন হত ঘটনা? শওকতউল্লা আব্বুকে প্রস্তাব দিয়েছে পরভিনের সঙ্গে আশিকের বিয়ের। আব্বু দ্বিধান্বিত, মুখের ওপর না বলবার শক্তি তার নেই, প্রস্তাবে রাজি হতে হচ্ছে, কেন না এই এলাকার এত বড়লোক কয়েকজন, তার মধ্যে হীরামন ড্রেসের মালিক শওকতউল্লা একজন। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে, শওকতউল্লা তার ছেলের জন্য যে বাড়ির মেয়েকে পছন্দ করেছে, তাতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু তার মাঝখানে এসে একমাত্র দাঁড়াতে পারত নাসের মাস্টার।

সে সব চুকে বুকে গেছে, আর ভাবে না পরভিন। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তাপর নাফিসার গায়ে হাত রাখে।

তারপর নাফিসাকে নিয়ে তেতলা থেকে পরভিন নেমে আসে। নীচে দিনমান সাংসারিক ব্যস্ততা। ছোট মা দালানের চেয়ারে বসে আছে। আর সবাই কেমন নীরব। যেন এ বাড়ির কেউ মারা গেছে। সবাই নীরব হয়ে আছে। কেউ হাসি ঠাট্টা করছে না। কেউ স্বাভাবিক ঘটনায় যাচ্ছে না, যাচ্ছে না স্বাভাবিক কথাবার্তায়। শোক নেমে এসেছে বাড়িতে। শোকই তো। অন্তঃপুরে যারা আছে, তারা তো সকলেই মেয়ে, তাদের পক্ষে শাহনাজের তালাক অপমানজনকই তো বটে। মানুষটা অদ্ভুত। শুধু অদ্ভুত নয়, মস্ত খ্যাপা। কি দরকার ছিল অমন একটা বিয়ে করার। বিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে তালাক, ভাবতে পারা যায়? হীরামন ড্রেস পরিবারে নীরবতা জারি হয়েছে। বাড়ির কর্তা শওকতউল্লা দু হাত তুলে নাচছে। আর বাড়ির মেয়েরা হজম করতে পারছে না?

কী এমন দোষ করেছিল শাহনাজ? তাকে তো শাস্তি দিতে পারত। বেদম খ্যাপা লোক। এ বাড়িতে একমাত্র পরভিনকেই শফী খানিকটা মান্য করে, যেহেতু পরভিন বি. এ পাশ। খুব সাধ হয় পরভিনের, তার চাচাশ্বশুরের কাছ থেকে জানতে কেন তাকে তালাক দিয়েছে। শফীর বইয়ের সংগ্রহ থেকে বই বেছে আনার জন্য মাঝে মাঝে শফীর তেতলা ঘরে আড়ঘোমটায় উঠে যেতে হয় পরভিনকে। শফীর সঙ্গে কথাও বলে মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে। আর কারোরই সাহস হয় না শফীর কাছে যাওয়ার, আর প্রয়োজনও পড়ে না। সাধের চেয়ে খুব সাহস হয় পরভিনের শফীউল্লার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে। নিজের মনে কোনো গান গুনগুনিয়ে ওঠার মতো ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। ঘটনাটা ঘটাবে, সে কথা ভাবতে তার ভাল লাগে।

সে যাবে, কীভাবে যাবে? তার উপায় বের করতে ভাবে। কেউ জানল না সে গিয়ে পৌঁছল একেবারে শফীউল্লার মুখোমুখি। কেউ দেখে যদি ভাববে বই আনতে যাচ্ছে। কিন্তু লোকে আশ্চর্য হবে আজকের দিনে, যেখানে শফী একরকম আত্মগোপন করে আছে, এই দিনে বই আনতে তার তেতলায় যাওয়া এক ধরনের ধৃষ্টতা বা বেয়াদাবি হবে। তার জন্যে তাকে চুপি চুপি যেতে হবে।

কোথা থেকে এ সাহস পাচ্ছে, পরভিন নিজেও জানে না। প্রশ্ন করার জন্য সে একেবারে অস্থির উন্মুখ হয়ে আছে। মনের মধ্যে এক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কান মাথা গরম হয়ে উঠছে।

এক সময় সন্ধ্যা নামল। তারপর সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে গাঢ়তর হল। প্রায়ই এই সময় ছাদে যাওয়ার অভ্যাস আছে পরভিনের। সে ছাদে গেছে ভাববে কেউ। ভাবতে ভাবতে লোডশেডিং হল। অমনি বেরিয়ে পড়ল বাড়ির অন্য অংশের সিঁড়ির দিকে। অন্ধকারে কামিনী ফুলের গন্ধ তখন আমোদিত করে তোলে তাকে। টুকটুক করে সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছে যায় সে শফীর ঘরের দরজায়। দরজা হাট করে খোলা। সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই বিদ্যুৎ ফিরে এসেছে। দরজার উল্টোদিকে দেওয়ালের ছবির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে আছে শফী। নিশ্চিত একজন পাগল। ভয় পেল, পাগলের সঙ্গে মুখোমুখি হতে। ডেকে ওঠার আগে কথা বলে ওঠার আগে তাই তাকে এক দ্বিধা এসে জড়ায়। এক অস্বস্তিকর ঘটনায় জড়িয়ে যাবে না তো? অথচ মনের মধ্যে আবেগের উত্তেজনা। ঘরে ঢুকে পড়েও ধীর পায়ে বাঁক নিয়ে বারান্দায় চলে যায়।

বারান্দায় হাওয়া আর হাওয়া, হাওয়ায় যেন স্নান করে যায় পরভিন। তার আঁচল হাওয়ায় ওড়ে। সে কামিনী ফুলের সুরভি পায়। লোকটা তাকে দেখতে পায়নি সে এসেছে। এক মনে আছে ঘরের ভিতর। ভঙ্গিটা পাগলেরই মতো। নাকি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে উঠল মানুষটা? তা হলে তো সমস্যা আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে। যে কথা জানতে এসেছিল, পাগলের কাছ থেকে জানতে চাওয়া অর্থহীন হবে।

কিন্তু সত্যিই কি পাগল, তা দেখা উচিত। তারপর দেখা গেল ভাল মানুষের মতো সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মান্যতা পাচ্ছে। তালাক দিয়ে যে পাগলামি করেছে, সেজন্য তো তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হয়। আর, সে প্রশ্ন তো পরভিন স্বতোপ্রণোদিত হয়ে করতে এসেছে। তার মনে হচ্ছে এজন্য শফীকে প্রশ্নের মুখোমুখি করা উচিত হবে, জবাবদিহি চাওয়া উচিত হবে।

মরীয়া হয়ে উঠল পরভিন। ওদিকে বাড়ির মেয়েরা খুঁজতে শুরু করে দেবে। ছাদে গিয়েও পাবে না যখন হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে যাবে। সময় যত গড়িয়ে যায়, ততই মরীয়া হয়ে ওঠে পরভিন। ধাঁ করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। পায়ের শব্দ তোলে।

সহসা আর্তস্বরে শফী বলে ওঠে, 'কে?' তারপর পেছন ফেরে। 'কে মেজবউ এত রাতে তুমি এখানে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ আমি, আপনার কাছে এসেছি।'

'কী জন্যে?'

'আমার দরকার আছে।'

'আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ আপনার সঙ্গে।'

'ও, বই চাই বুঝি?'

'না।'

'তাহলে কি ধর্ম আলোচনা করতে চাও?'

'না।'

'তবে?'

'আপনি কেন তালাক দিলেন?'

এই প্রশ্নের সামনে থতমত খেয়ে যায় শফী। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে না, আশিকের বউ তাকে প্রশ্ন করতে পারে! আর এই প্রশ্ন করার জন্য রাতের বেলা তার তেতলা ঘরে উঠে আসতে পারে! সাহস তো কম নয়। রেগে ওঠে, কিন্তু রাগ সামলে নেয়। একবার মনে হয় বেয়াদব মাগিটার মুখে কি একটা জিনিস দিয়ে আঘাত করে, এই প্রশ্ন কবার দুঃসাহসের জন্য উচিত শাস্তি দেওয়া হবে। একটা কিছু হাতের কাছে যে নেই, তা নয়। হাত পাখা আছে। বেড়াল তাড়ানোর জন্য একটা লাঠিও আছে। বুঝতে না দিয়ে ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসতে থাকে শফী। তারপর বলে, 'সে কথা তোমাকে বলা যাবে না।'

'না, বলুন আপনি, আমি শুনতেই এসেছি, তার কী দোষ ছিল?'

'বলছি তো, সব কথা সবাইকে বলা যায় না।' মিষ্টি স্বরে নীচুগলায় বলে শফী। 'তুমি তো আমার সম্পর্কে পুত্রবধূ হও নাকি? সব কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা কি আমার চলে?'

'সমাজের কাছে তো আপনাকে বলতে হবে!'

'সমাজ ধর্ম মানে, সমাজ বুঝবে। ধর্ম আমাকে তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়েছে, তাই আমি দিয়েছি।'

'কিন্তু বিয়ে করার দুদিনের মধ্যে—'

'হ্যাঁ, প্রয়োজন হয়েছিল, তাই দিয়েছি।'

'কীসের প্রয়োজন?'

'সে কথা তোমাকে বলা যাবে না বলছি তো।'

'আপনি কিন্তু ঠিক কাজ করেননি, একজন নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন।'

'মেজবউ তুমি শিক্ষিতা, গুরুজন সম্পর্কে তোমার এ ধরনের আচরণ কথাবার্তা

মোটেই মানায় না। আর একটাও কথা না বাড়িয়ে, আর একটাও প্রশ্ন না করে তুমি সসম্মানে নেমে যাবে, তোমার ভালর জন্য এটা আমি চাই।' রাগ সামলে শফী এসব কথা বলছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনে হচ্ছে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে পরভিনকে।

'আপনি আপনার অপরাধ লুকোচ্ছেন।'

'মেজবউ, কেন নিজেকে এমন ছোট করছ? তুমি আমার পুত্রবধূ। ভুলে যেও না আমি তোমার শ্বশুর।'

'আপনি ছিনিমিনি খেলেছেন একজন নারীর জীবন নিয়ে।'

'হারামি মাগি, একদম মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। বেরো বলছি। না হলে যে মুখ দিয়ে সওয়াল করছিস সে মুখে তোর রক্ত তুলে ছাড়ব। বেরো মাগি।' খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে শফী। আর নিজেকে সামলাতে পারল না।

পরভিন থমমত খায় আর ছিটকে সিঁড়িতে নেমে যায়।

পরভিনের চলে যাওয়া দেখে মনে মনে বেদম হেসে ওঠে শফী।

পরভিনকে শফীর এই অপমানের বোধহয় কেউ সাক্ষী নেই। পরভিন সহসা অপমানে জর জর হয়ে নেমে পড়েছে সিঁড়িতে। খেয়াল হল, কেউ যেন সিঁড়িতে ছিল, শফীর কাছে এসেছিল, শফীর এই অপমান শুনেছে, সেজন্য লজ্জা পেয়ে পালিয়েছে। কে সে? কেন এই অপমান মেনে নিল পরভিন? মুখ থেকে রক্ত তুলতে দেওয়াই কি উচিত হত না? সে যে এ বাড়ির বউ, ভুলে গিয়েছিল, মনে করেছিল সেও একজন সামাজিক মানুষ।

৮

জিয়াদ চুপি চুপি পালায়। আশিকের বউ আর শফীর কথোপকথন শুনছিল সে। শফী ঘরে থাকায় কিছু হিসেবপত্তর দেখিয়ে নেওয়ার জন্য শফীর ঘরে উঠছিল, আর দরজার কাছে যাওয়ার আগেই শুনতে পেয়েছিল তাদের কথোপকথন। প্রথমে মনে হয়েছিল, হয়তো অন্য কেউ। কথা বলার ধরন দেখে চমকে উঠেছিল। শফীকে সওয়াল করছে? তাও আবার বিবিকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে? তাও আবার একজন মেয়েমানুষ? গলার স্বর শুনে ঠিক ধরতে পারছিল না। সে জন্য কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল। কথা শুনে শরীরে এক হিমস্রোত বয়ে যায়। এত বড় সাহস কোনো মহিলার হতে পারে, যে শফীকে সওয়াল করে? আর শফী না রেগে ভদ্রলোকের মতো উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। এই অবাক করা ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে জিয়াদ থ হয়ে যায়। শিরদাঁড়া বেয়ে তার হিমপ্রবাহ। শরীরের রক্তস্রোতের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য।

শেষ পর্যন্ত মেয়েমানুষটি, সেই গোপন রহস্যাবৃত কথাটি শফীর পেট থেকে বের করে ছাড়বে কি? কী সেই রহস্য? যার জন্য সত্যি সত্যি শফী শাহনাজ বিবিকে তালাক দিল? জিয়াদের মনের মধ্যেও এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে

কথা শুনতে পাবে, সেই রহস্যের নিরসন হবে, এমন আশা নিয়ে একটু ঝুঁকি নিয়েই দরজার সোজাসুজি কয়েকটা সিঁড়ি বাকি রেখে দাঁড়িয়েছিল উত্তেজনায় টান টান হয়ে। যেন তার হৃৎপিণ্ড অচল। এই আশ্চর্য কথোপকথন জীবনে শোনেনি সে। শফীকে এতখানি অমায়িক নমনীয় হতে দেখেনি কোনোদিন। এত সাহস ভরে শফীকে প্রশ্ন করছে, এই মহিলা কে? সেই ভাল লাগায় বুকের ভেতর ড্রাম বেজে উঠছে।

তারপর হঠাৎই শফীর সুর পালটে যায়, স্বর পালটে যায়, হিংস্র হয়ে ওঠে। আর সেই মহিলাকে অপমানে ঝটিতি বেরিয়ে আসতে দেখল। আশিকের বউ। মেজবউ। মেজবউ তাকে দেখে লজ্জা পাবে বলে নামতে শুরু করে জিয়াদ। মেজবউয়ের পক্ষেই সম্ভব সওয়াল করা। ভেবেই পাচ্ছিল না কে এই মহিলা। আশিকের বউয়ের যে এতখানি সাহস হবে কল্পনা করতে পারেনি জিয়াদ। কিন্তু যেহেতু মেজবউ অপমানিত হয়েছে, সেজন্য দ্রুত সরে যেতে হয় জিয়াদকে।

নীচে নেমে সে ঢুকে যায় তার ঘরে। ধীর পায়ে নেমে চলে গেল মেজবউ।

তার ঘরটা ছোট হলে কি হবে, মালপত্রে ঠাসা। 'তয়' করা মাল এখানেই রাখে। এখান থেকেই খদ্দেররা মাল পায়। এখান থেকেই মাল নিয়ে হাটে হাটে যায়। সে তুলনায় শওকতউল্লার বিশাল অফিস ঘর। তাতে তৈরি করা মালের বড় গোডাউন সংলগ্ন। পুরনো বাড়িতেও বিস্তর মাল রাখার ব্যবস্থা আছে। ওখানে ইস্তিরিওয়ালা বসানো হয়েছে। ওখানেই মাল ফিনিস হয়ে প্যাকেট ভর্তি হয় খানিকটা ওখানে রয়ে যায়, খানিকটা এখানে আসে। সারাদিন বাইরের ওস্তাগার 'কাম' নিয়ে আসছে, কাম দিয়ে যাচ্ছে। কোনো ওস্তাগার 'এক টিপ' কাজ পায় কোনো ওস্তাগার দু-তিন টিপ কাজ পায়। শফী ছোট ব্যবসায়ী তার এক টিপ কাজ বারো ডজন হিসেবে যায়। আর শওকতউল্লার এক টিপ কাম দেড়শো ডজন

বড় কর্তার এলাহি কাণ্ড। সাতজন শুধু 'ম্যাটজি' আছে, যারা থান কাটে এক একজন ম্যাটজি প্রতিদিন তিনশো মিটার পর্যন্ত থান কাটে। কাঁচির এক কোপে আট পরত কাপড় কাটে। তাই যারা ম্যাটজি তাদের বুকে চাপ পড়ে, বুকের রোগ হয়। কেন না আট পরত কাপড় কাঁচিতে একসঙ্গে কাটতে থাকবে। তাও আবার সারাদিনে তিনশো মিটার থান তার কাটা হবে। আর ম্যাটজির জন্য লম্বা হলঘর লাগে। এক একটা থান আশি নব্বই মিটার। বড় জায়গা না পেলে থানকে খেলানো যায় না। আর খেলাতে না পারলে কাজ দ্রুত সারাও যায় না। তেতলার ঘরে শওকতউল্লার বড় হলঘর। ওখানেই থান থেকে 'কাম' কাটে ম্যাটজিরা। তারা নির্দিষ্ট সময়ে এসে কেটে চলে যায়। তারপর কর্মচারীরা সেগুলোকে সাজিয়ে গুণে টুনে কাম বিলি করে দেয়।

শওকতউল্লার কাজ নিতে কত ছোট বড় ওস্তাগারই না সারাদিন অফিসঘরে লাইন দিচ্ছে। টিপ টিপ মাল নিয়ে যাচ্ছে, কাম সেরে ফিরিয়ে যাচ্ছে। আর সপ্তাহে একদিন মঙ্গলবার পেমেন্ট, পেমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে। শওকতউল্লা কয়েক হাজার

মানুষের রুজিরোজগার দিচ্ছে। তার কাজে রেট কম, কিন্তু কাজ নিয়মিত দিতে পারবে। শওকতউল্লার বাড়িতে যে নিজস্ব ইউনিট আছে, সেখানে যা কাজ হয়, তার বিশগুণ কাজ বাইরে হয়। মেটিয়াবুরুজেই কাজ ছড়িয়ে দেয় না, দূর-দূরান্তে কাজ ছড়িয়ে পড়ে। ডায়মন্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, বজবজ, মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর নন্দীগ্রাম কাজ চলে যায়। গঙ্গা পার হয়ে হাওড়ার শহরতলিতে বিস্তর কাজ যাচ্ছে। আবার এক এক জন ওস্তাগার টিপ টিপ কাম ধরে বিভিন্ন কলওয়ালাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কলওয়ালা বলতে যারা সেলাই মেশিনে বসে সেলাই করে। সেলাই করা মাল পৌঁছে দিতে হয় মূল ওস্তাগারের বাড়ি। সেখানে ইসতিরি হয়, প্যাকেটবন্দী হয়।

এ সব কাজ করার জন্য পনেরো জন কর্মচারী আছে শওকতের। যারা ম্যাটজির কাছ থেকে কাটিয়ে নিয়ে গুণে গেঁথে ডজন বাঁধে, টিপ সাজায়। তারপর পার্টিকে মাল দেয়, মাল নেয়। নেওয়া মাল ইসতিরিওয়ালাকে দেয়। ইসতিরিওয়ালার কাছ থেকে কাম নিয়ে প্যাকেট করে গুছিয়ে রাখা অর্থাৎ 'তয়' করা, এসব তারা করে। সারাদিন ও অনেক রাত পর্যন্ত কর্মব্যস্ততা। সব সময় খদ্দের আসছে, মাল দিতে হচ্ছে। সপ্তাহে তিনদিন হাট। আগের দিন রাতে ম্যাটাডরে গাঁট বেঁধে মাল তোলার কাজ করতে হয়। সিজিনে লরিতে পর্যন্ত মাল যায়। রবিবার সোমাবার কারবালার হাটে হাট। তারপর সোম মঙ্গলবার হাওড়ার সমবায়িকার হাট আছে। রবি সোমবার মেটিয়াবুরজে জব্বার হাটেও হাট আছে, সেখানেও শওকতউল্লার স্টল নেওয়া আছে। নানা জায়গা থেকে তার মাল বিক্রি হয়। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত মালিক পক্ষের ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠে যায়। আর সিজিন হলে তো কথাই নেই। নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতে হয়।

শফীর ছোট ব্যবসা। মাত্র পনের জনের একটা ইউনিট আছে। তার কোম্পানির নাম নিউ হীরামন ড্রেস। ছোট একটু অফিসঘর আছে। ইণ্টারলক ইসতিরি দাদার কাছ থেকে করিয়ে নেয়। তারপর মাত্র দুটো স্টল নেওয়া আছে, সেখানে কর্মচারীরা মাল বিক্রি করে আসে। একটা হাওড়ার সমবায়িকায় অপরটি কারবালার হাটে। সে তুলনায় দাদার বারোখানা স্টল নেওয়া আছে বিভিন্ন হাটে।

জিয়াদের ওপরই সমস্ত ব্যবসার দায়-দায়িত্ব। সব কিছু সামলায়। শফীর কোনো কিছু তালের ঠিক থাকে না। সে শুধু হিসেব নেয় আর টাকা বুঝে নেয়। ব্যবসার দেখাশোনা একেবারেই করে না। খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত দায়িত্ব পালন করে জিয়াদ। তবুও মাঝে মাঝে শফীর রোষের মুখে পড়তে হয়। এমন মানুষের সঙ্গে কাজ করা ভীষণ কঠিন। খ্যাপা লোক। বউ এনে দিল পরশু সন্ধ্যায়, তাকে সকালে তালাক দিল শফী। গভীর রাতে ডেকে এনে কোনো তার দোষ নেই, জুতো পেটা করল। এ অদ্ভুত মানুষ। ভাল মাইনে দেয় বলে হজম করে নিয়েছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ গর্জে আছে জিয়াদ। তার বউ আছে, বাচ্চারা আছে, কোথায় যাবে সে? কোনো একজন নারী এসে শফীকে সওয়াল করছে, তার তালাকের জন্য

জবাবদিহি চাইছে, সেই নারীর সাহস দেখে ভাল লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি এমন ঘটবে, মেজবউ অপমানিত হয়ে চুপি চুপি ফিরে যেতে বাধ্য হবে, সেটা চায়নি জিয়াদ। মেজ বউ অপমানিত হয়ে ফিরে গেল, তারই দেখার মধ্যে, তারই চোখের সামনে।

এ কেমন খাপছাড়া ঘটনা ঘটে গেল। নীচে অফিস ঘরে ফিরে গিয়ে চেয়ারে থপ করে বসে পড়ে। যেন অপমান তারও গায়ে লেগেছে।

দুপুরে বার দুই বাইরে যেতে হয়েছিল জিয়াদকে। লোকজন শফীর বিরুদ্ধে বলা কওয়া করছে। নাকি নাসের মাস্টার এ কথা প্রথম পেড়েছে। সে-ই লোকজনকে বলে বেড়াচ্ছে, বলছে শফী অন্যায় করেছে। কাউন্সিলার মোতলেব আলির কানে পর্যন্ত তোলা হয়েছে। দরকার হলে নাসের এম পি, এম এল এ-র কাছে যাবে। তার সুবিচার চাইবে। মৌলবি মোল্লাদের সঙ্গেও কথা বলছে। বড়তলা স্কুলের শিক্ষকদের তাতিয়ে তুলছে নাসের।

অবশ্য একটা দল চুপ, তারা হীরমন ড্রেস পরিবারের বিরুদ্ধে যাবে না। মেটায়াবুরুজের অনেকের কাছেই শফীউল্লার প্রভাব প্রতিপত্তি। থানার দারোগা পর্যন্ত সেলাম বাজায়। তা বলে অন্যায় কাজ প্রতিবাদ করবার মতো লোক নেই, এমন নয়। নাসের মাস্টার খেপে গেছে। নাকি একটা চিঠি পাঠিয়েছে বড় কর্তার কাছে। এই ঘটনার প্রতিবাদস্বরূপ বড় কর্তার মেয়েকে পড়াতে পারবে না লিখে জানিয়েছে। গরিব মাস্টারের সৎ সাহস দেখে কিছু মানুষ তার পক্ষ নিয়েছে বলাবলি করছে। জিয়াদ মানে, তারা ন্যায্য কথা বলছে। সে মনে মনে চায়, তার একটা হেস্তনেস্ত হোক।

শাহনাজ বেগমকে আনতে সে তার বউকে নিয়ে গিয়েছিল। শাহনাজের সে কী কান্না। তার চেয়ে বেশি তার মেয়ে কাঁদছিল। শাহনাজ তো ওই একবারই কেঁদে, শফীর বিবি হওয়া মেনে নিয়েছিল। আর তাকে তালাক খেয়ে ফিরতে হল পরের দিন ভোরেই। তার কী দোষ? তাকে বিয়ে করাই বা কেন, তালাক দেওয়াই বা কেন? মেজবউ তো ঠিকই বলেছে, একজন মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে শফী। এটা একটা ছেলেখেলাই তো।

রাস্তায় তাকে লোকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তার কাছ থেকে জানতে চায়, কেন শাহনাজকে তালাক দিল? কী তার কারণ? কারণটা কী তা কি সে জানে ছাই? তারও তো প্রশ্ন, কেন শফী শাহনাজকে তালাক দিল? লোকজনের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেনি। বরং চটপট পালিয়ে এসেছে অপরাধীর মতো। কারোব কারোর ওপর চোটপাট করেছে, যাও না নিজে শুধোও গে। কাউকে খেপিয়ে দিয়েছে, সে মারমুখী হয়েছে জিয়াদের ওপর। বুঝেছে, শফীর পেটুয়া লোক সে। সে সব জানে, বলছে না। জিয়াদও একটা শয়তান। শয়তানের কর্মচারী শয়তান ছাড়া আর কী?

এসব কথা হজম করে ফিরে এসেছিল। ওসমানভাইকে জানিয়েছিল নাসেরের

থা। নাসের তালাক নিয়ে কথা বলছে। কর্মচারীদের মধ্যেও ফিসফিসিনি। ওকতউল্লারও কানে গিয়ে পৌঁছয়। রাগে গরগর করতে করতে মসজিদে যায় মাজ পড়তে। কেউ উল্টোপাল্টা চোখে তাকালে তাকে মেরেই বসবে। হানিফ চাকে প্রথমেই দাবড়ে দেয়। শাহনাজকে তালাক দেওয়ায় বড় কর্তা বেশি খুশি য়েছে। দেদার বাজার করতে দিচ্ছে। ইয়ার বন্ধু বেয়াই রিস্তেদারদের ফোন করছে, দের সঙ্গে হাসিখুশি নিয়ে কথা বলছে।

শফীর আত্মগোপন করে থাকা ঘটনায় লোকজন, বাড়ির লোক ভাবছে, হনাজকে তালাক দিতে বাধ্য হওয়ার জন্য শোক পেয়েছে ভীষণ। সেজন্য বাইরে রতে পারছে না। জিয়াদের মনে হয়, এসব কিছু নয়, এসব শফীর ভান। আর ড়ির লোক কর্মচারীরা এ কথা বানিয়ে তুলেছে। সকাল থেকে বার দুই গেছে া তেতলায় শফীর কাছে। ঠিকঠাক খেয়েছে, স্নান করেছে। ফুরফুরে হয়ে আছে। ার মুখটা হাসি হাসি প্রসন্ন হয়ে আছে।

মেজ বউয়ের অপমানের কথা শুধু খচখচ করে ওঠে জিয়াদের মধ্যে। কেমন কটা যেন ঘটনা ঘটে গেল। মেজ বউ মেয়েছেলে বলেই এই অপমান করতে ারল শফী। আর সে এ বাড়ির বউ। সে সব জানতে পেরেছে, জিয়াদ লুকিয়ে ব শুনেছে।

৯

রান্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার রাতে, অনেকটা রাত হয়ে গেছে, তখন দাঁড়িয়ে নীরবে শ্রুপাত করছিল পরভিন। তার স্বামী আজ অনেক রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকবে। ন না আজ রবিবার। কাল থেকে হাওড়ার হাট। মাল যাবে ম্যাটাডোর ভরে। ৷ সব তদারক করে তুলতে তুলতে রাত বারোটা সাড়ে বারোটা হয়ে যাবে। ঙ্গে যাবে কর্মচারীরা। তবুও হেস্টিংসে পুলিস টাকা নেয়। পঞ্চাশ একশো যা শি চেয়ে বসবে। সে টাকা না দিয়ে উপায় নেই। হাটের আগের দিনগুলোতে রামন ড্রেস পরিবারের বারোটাতে সন্ধে হয়। বাড়ির মেয়েদের শুতে শুতে রাত টো-আড়াইটে বাজবে। এমনিতে প্রতিদিন একটা-দেড়টা তো বাজেই। আর বাড়ি ড়ে সেলাই মেশিনের শব্দ তো সারাসক্ষণ লেগেই আছে। কলওয়ালারা কাজ রু করে ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে, আর তাদের কাজ চলে রাত বারোটা সাড়ে ারোটা পর্যন্ত। অনেক রাতে তখন মেটিয়াবুরুজের ঘরবাড়িগুলোকে শান্ত ছায়াময় ারিবিলি আশ্রয় মনে হবে। তখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সেই সব কল চলার াদঘুটে আওয়াজ শোনা যাবে না। কলওয়ালারা টেপ রেকর্ডারে হিন্দি গান জোরে গারে বাজিয়ে কাজ করে যায়। বাড়িটা যেন ঝম ঝম করে ভেঙে পড়তে চায়।

আর এ বাড়িতে তিনটে ভি সি আর আছে। ক্যাসেট ঢুকিয়ে দিলেই সিনেমা লতে শুরু করে। বড় জায়ের ঘরে সন্ধের পর থেকেই বাজতে শুরু করে। বড় া সাকিলা একবার বাজায়, তারপর ভাশুর এসে অনেক রাতে বাজায়, ঘুমোবার

আগে পর্যন্ত চলে। তার ঘরে যে ভি সি আরটা আছে, আশিকও অনেক রাতে ফিরে বাজায়। তখন অসহ্য মনে হয় পরভিনের। শুধু শব্দ আর শব্দ, আর কিছু নেই। আর একটা ভি সি আর আছে নীচের ঘরে, কুটুম-কাটাম এলে যে ঘরে বসানো হয়। কোনো কোনো সময়ে সেখানেও বাজতে থাকবে কোনো সিনেমা।

ইশার নামাজের পর থেকে এই শব্দমালা চলতে থাকবে গভীর রাত পর্যন্ত। বড়লোক মানেই বুঝি এই সব কিনে লম্ফঝম্ফ শুনতে হবে? নিভৃতি নেই, কথাবার্তা নেই নিজেদের মধ্যে। শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এনে আলমারি ভর্তি করছে। দুই ভাইই হাট থেকে ফিরে টাকা নিজেদের হেফাজতে রাখছে। তারপর শ্বশুরমশাইয়ের কাছে গিয়ে হিসেব বুঝিয়ে টাকা দিয়েও আসতে হচ্ছে। ব্যবসার সমস্ত টাকা-পয়সার কর্তৃত্ব শওকতউল্লার ওপর। ছেলেরা যখন দশ-বিশ হাজার চায়, পেয়ে যায়, কীসে খরচ হবে জিজ্ঞেস করে না পর্যন্ত। কেন না ছেলেরাই তো হাটে হাটে গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা এনে দেয়, সপ্তাহে সপ্তাহে। এমনিতে ইচ্ছেমতো হাতখরচ করতে পারে। দুম করে একটা মোটর সাইকেলের জায়গায় দুটো মোটর সাইকেল কিনতে পারে। যখন ইচ্ছে যাচ্ছে মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকাতার বড় কোনো হোটেল-রেস্টুরেন্টে খেতেও চলে যাচ্ছে। সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবও জুটছে। টাকা আছে, টাকা খরচও করতে হবে।

এ বাড়িতে কোনো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নেই। তিন বছর বিবাহিত জীবনে পরভিন সার বুঝেছে। পুরুষরা শুধু টাকা রোজগার করতে ব্যস্ত। আর টাকা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। ছোট দেওর গত বছর থেকে পড়াশোনায় ছেদ দিয়ে ব্যবসায় ঢুকে পড়ল। পড়াশোনার চেয়ে ব্যবসার প্রয়োজন বেশি। একজন ছেলে ব্যবসায় ঢুকলে সে আর একটা হাটের স্টল সামলাতে পারবে। খদ্দের বাড়বে, মাল বেশি বিকোবে, টাকা বেশি রোজগার হবে, মেটিয়াবুরুজের মধ্যে সেরা ধনী হয়ে উঠবে। মেটিয়াবুরুজের সবার চেয়ে বড়লোক হওয়াই বুঝি সর্বোচ্চ লক্ষ্য, একমাত্র লক্ষ্য। আর এতেই মোক্ষ লাভ হবে তাদের। ধর্ম প্রতিষ্ঠানে এক কথায় বিশ-তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে নাম কিনতে পারবে। পাড়ায় একটা মসজিদের জায়গায় দুটো মসজিদ হোক তাতে খুব উৎসাহ, কিন্তু একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়তে আসে না কেউ।

বললে শওকতউল্লা বলবে, মুসলমানরা পড়াশোনা করে করবে কী, হিন্দুস্থানে মুসলমানরা চাকরি বাকরি পাবে না। ওই কাম করে খেতে হবে, ব্যবসা ফেঁদে খেতে হবে। টাকা থাকলে বুদ্ধিও কেনা যায়। আর টাকার জোরে কী না হয়, সরকারি অফিসারদের হাত করা যায়, মন্ত্রী এম পি, এম এল এ-দেরও হাত করা যায়। কী হবে লেখাপড়া শিখে? কত এম এ, বি এ পাশ গড়াগাড়ি খাচ্ছে, তারা চাকরি পাচ্ছে? মুসলমানরা যত টাকা করবে, তত তাদের দাপট-প্রতিপত্তি বাড়বে। হিন্দুস্থানে বাস করতে পারবে তবেই বুক ফুলিয়ে।

গভীর রাতে অন্ধকারে পরভিনের নীরব অশ্রুপাত নাসেরের এ বাড়ি পরিত্যাগের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ও শফীর অপমানের জন্যে হলেও বাড়ির এ

ন ধ্যানধারণাও কম কাঁদায় না তাকে। তার কিছু করার নেই, না তার কিছুই রার নেই। তাই সে একা একা বারান্দায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। র এই কান্না তার স্বামী আশিককে দেখানোরও অধিকার নেই, স্বাধীনতা নেই। নিময় তার সঙ্গেই হয়, যার সমমন আছে। তাই তার খুব মনে পড়ে যায় নাসেরের থা। কেন তাকে এমনি করে হারিয়ে ফেলল জীবনে? কেন তার বিয়ে হল এমন রিবারে? সে কি চেয়েছিল ধন ঐশ্বর্যের মধ্যে এমনি করে বন্দী হতে? তার নানো উচিত ছিল নাসেরকে, সে সুখে নেই, সুখী নয়। তাহলে নাসের এ বাড়িতে াসা বন্ধ করতে পারত না কিছুতেই। শাহনাজের তালাকের ঘটনার প্রতিবাদ রতে গিয়ে, পরভিনকে এ নিষ্ঠুরতা দিল কেন?

কোনোদিন আর এ বাড়িতে আসবে না নাসের, তার আসা চিরদিনের মতো ন্ধ হয়ে গেল। পরভিনের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, বাইরে বেরিয়ে নাসেরের ঙ্গে দেখা করা। তাদের নিয়মিত দেখা হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এর জন্য াষী, শফী। সেই জন্যই তো আজ ছুটে গিয়েছিল শফীর কাছে। কিছু একটা রতে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুই হল না, মাঝখান থেকে ভীষণ অপমান নিয়ে ফিরল। শফীর নখ দাঁত সব বেরিয়ে এসেছিল, এই বুঝি ছিঁড়ে খায় পরভিনকে। সটা যদি করত, পরভিন কী করত তাহলে? কিছুই করতে পারত না, সেই সহায়তায় আরও কাঁদে পরভিন। পরভিন অন্ধকারে তার নীরব কান্না ঢেলে িচ্ছে।

ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। রাত তিনটে তো বাজে। আশিক এসে মিয়েছে। আজ আর ঘুমোতে পারল না পরভিন। আশিকের পাশেই শুয়েছিল। াশিককে আজ স্পর্শ করতে দেয়নি। বার বার বাধা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। আশিক খন তাকে চায়, চোখ বুজে তার ওপর চড়াও হয়। পরভিনের চোখের দিকে খনও তাকায় না। দৃষ্টি বিনিময়ের কোনো সুযোগই নেই তার সঙ্গে। সে যদি াকাত, চোখের ভাষা দিয়ে খানিকটা বোঝাত পরভিন, সে ভাল নেই। তারপর দি আশিক প্রশ্ন করত, তাহলে পরভিন কিছুক্ষণ আশিকের বুকে পড়ে কাঁদত। ারপর জানাত সে এই সব ঘটনার কথা। এতক্ষণ যে জেগে আছে, জেগে জেগে থা বলে কাটত তার, আশিকের পাশে শুয়ে। তেমনটা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল া বলে একা একা তাকে কাঁদতে হল, কাঁদতে হল নীরব বারান্দায় এসে, অন্ধকারের কে অন্ধকার হয়েছে। বারান্দার গ্রিলের নকশা ছেয়ে আছে তাকে ঘিরে।

অনেকক্ষণ পরে তার কান্না থামে। যখন রাতকে মনে হয় আরও নিশ্চুপ, ারও ঘুমক্লান্ত, তখন মাথার ভিতর অসংখ্য তারাদের পিন ফোঁটা যন্ত্রণায় টলতে লতে খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে পরভিন। ঘরের ভিতর রাত আলো উজ্জ্বল য়ে উঠেছে। আর তার স্বামী তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে অচেতন ঘুমিয়ে আছে। াসি পায় পরভিনের, আশিকের শোওয়া দেখে। অথচ সেই জায়গায় পরভিন খন শুয়ে নেই। সে ভরে ছিল বারান্দায় তার কান্না নিয়ে। সে ভরে ছিল জীবনের

অপ্রাপ্তির বেদনায় কান্না নিয়ে। সে ভরে ছিল অপমানের আগুনের ভিতর জ্বলে জ্বলতে কান্না বুকে নিয়ে। সে ভরে ছিল বিরহকাতর হয়ে, নাসেরকে না পাওয় বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে। তার কান্নার ভিতর কত কারণ সে ভরে দেয়।

টেবিলে রাখা জগ থেকে গ্লাসে জল ঢেলে একটু খায় পরভিন। কিন্তু জ তার তৃষ্ণা মেটে না। আর একটু খায়। তারপর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে একা এ ঘরের ভিতর। কীসের এত অস্থিরতা তার? সবকিছুতে কেন এত তার মন না না না করে উঠছে। শরীরের মধ্যে অগ্নিপ্রবাহ বহে যাচ্ছে। অসহ্য, জীবন অসহ্য সে জানে, তার এই অগ্নিদাহ কয়েকদিনের মধ্যে স্তিমিত হয়ে উঠবে। আর ত স্বামীর শরীর গ্রহণে সম্মত হয়ে উঠবে। শ্বামীর সঙ্গ দিয়ে যাবে। সে তো স দেয় অংশগ্রহণ করে কি? সেও এক অপমানকর হয়ে ওঠে। সম্পর্কের সংলগ্নত ভিতর তাকে কাছে টেনে নেয় না, বরং অত্যাচার মনে হয়। যদিও একসময় জে ওঠে, তখন আবার ফুরিয়ে যায় আশিক। সে এক অসহনীয় যন্ত্রণাকর অবস্থ সে কথা কাউকে বলা যাবে না। কাউকে বোঝানো যাবে না। প্রায়ই রাতেরবে এরকম অব্যক্ত বেদনায় কাটে পরিভনের। এমন হয় যে মনে হয় মরে যাই। অং তার সঙ্গীকে তো বোঝাতে পারে না, বুঝতে দেওয়ার আদান প্রদানের কো কিছু নেই, সেহেতু যন্ত্রণা একার হয়ে যায়, পরিত্রাণহীন হয়ে যায়। সেই স অন্য পুরুষকে আহ্বান করার কথা কেন মনে হয়, জানে না পরভিন। দেওয়াল দিকে মুখ ঘুরিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। অনেকক্ষণ তখন তার ঘুম হয় ন একসময় যখন শরীর মন থেকে সরে গিয়ে শীতল শান্ত হয়ে যায়, তখন মনটা ছুঁড়ে দেয় পরভিন সমস্ত জলাঞ্জলির বাইরে, তখন ঘুমিয়ে পড়ে। আর সে মা ঘুমের মধ্যে অনেক স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে নাসেরকে প্রায়ই। স্বপ্নের মধ্যে তা মিলন হয়।

পরভিন নিঃসাড়ে উঠে যায় বিছানায়। নিঃসাড়তার কারণ আশিককে বুঝ দেয় না সে পাশে এসে শুচ্ছে। তার বিছানার অংশ থেকে আশিকের বাড়া হাতটা সরিয়ে দেয়। শুয়ে পড়ে, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এখন আর কি ভাববে না, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। শরীর মন চাইছে বাস্তবতার এ সমস্ত মার থে সরে থাকতে। শরীর মন চাইছে আরাম, শান্তি। দীর্ঘশ্বাসটা নিঃশব্দে ধীরে ধী বের করে দেয়। তারপর পা দুটো লম্বা করে মেলে দেয়। হাতদুটো বুকের কা বেঁধে নেয়। অথচ মনে ঝিলিমিলি করে সমস্ত কিছু। নাসেরের চিঠি, শফীর অপমা সব বেদনা, সব বেদনার কথা। তাকে শান্ত করতে চাইল মনে মনে। মনে ম কামিনী ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করতে চাইল। দেখল, আশিক তার দিকে হ বাড়িয়েছে। আর তাকে পেয়ে গেছে। সরে এসেছে তার দিকে। কেমন দম ব হয়ে আসে। হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আশিক গায়ের জে ফলাচ্ছে। তার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠবে না পরভিন। সোহাগে গায়ে এক বারের জন্য আশিক হাত রাখল না পরভিনের শরীরে, আচম্বিতে আক্রমণ কর

মার অধিকৃত করল শরীর দিয়ে পরভিনের শরীরটাকে। দম বন্ধ হয়ে আসে পরভিনের। চোখে অশ্রু তার। পরিত্রাণহীন এক পরিস্থিতির মধ্যে সহসা চলে যায় পরভিন। আশিক তাকে যেন একটা রক্তমাংসের পুতুল পেয়েছে। এখন যে ঘটনায় যাচ্ছে, তার কোনো প্রস্তুতি জীবনেও থাকে না ঘটনায়ও থাকে না। কোনোদিন ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকা পরভিনকে এসে ছোঁয় না। পিঠে, কাঁধে হাত রাখে না। কোনোদিন চোখের দিকে তাকায় না। কোনোদিন চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে না। কোনোদিন বুকে জড়িয়ে চুম্বন করে না। অথচ সঙ্গম করে, আর পরভিনকে সহযোগ দিয়ে যেতে হয় যন্ত্রণাকাতর হয়ে।

পরভিনের মনে হয় আজ যদি আশিক ভালোবাসায় ভালোবাসতো, আজ যদি তাকে তেমনভাবে আদর করত, তাহলে আজকে যে যে বেদনায় অশ্রুপাত করেছে, বেদনাকাতর হয়ে আছে, তা প্রশমিত হতে পারত। আশিকের সঙ্গে সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্যে থাকার বড় প্রয়োজন ছিল অথচ পরভিনের সাম্প্রতিক জীবনে। সে যদি আশিকের কাছ থেকে ভালবাসা পেত, আশিককে ভালবাসতে পারত, তাহলে জীবন বেঁচে যেত। সে তো আসলে এখন জীবন্মৃত।

আশিক চড়াও হয়েছে। অথচ পুরুষ জানে না অসুবিধে কোথায় কেন কীসে? পুরুষ জানে না, তার নারীর কথা। পুরুষ নারীর মিলিত সমাজ অথচ। সেখানে পুরুষকে কি এমন নির্বোধ হলে চলে? জানে না কিছু পরভিন, কিছুই জানে না। সে শুধু যন্ত্রণাকাতর হয়ে চলে। সে পরিত্রাণহীন মুক্তিহীন একজন নারী এইটুকু জানে।

১০

সমাজ আহত হয়েছে। সমাজের আর কি দোষ? সমাজ তো আহত হবেই। সে সব কথা নিয়ে শফীউল্লার ভাবলে চলে না। সে যা জানে, সমাজ জানে না। সমাজকে জানাতে হবে, ধর্ম তাকে সেই অধিকার দিয়েছে, তাই শাহনাজ বেগমকে তালাক দিয়েছে। তাতে কোনো দোষ নেই। তার যেমন বিয়ে করার অধিকার আছে, তেমনি তালাক দেওয়ার অধিকার আছে। তার ধর্মজ্ঞান সমাজের চেয়েও বেশি, এ কথা সমাজকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। শাহনাজ বেগমের তালাক দেওয়ার ঘটনাটা সমাজ গিলতে পারছে না, একে গরিব, তার ওপর বিয়ের তিনদিনের মধ্যে তালাক দেওয়া হয়েছে, সমাজকে স্পর্শকাতর করেছে তাই।

সব খবর পাচ্ছে শফী। নাসের মাস্টার ঘোঁট পাকাচ্ছে। তার সঙ্গে আরও কেউ কেউ সঙ্গ দিয়েছে। সে সব নিয়ে শফীর ভাবলে চলে না। এখনই সমাজের মুখোমুখি হওয়ার সময় হয়নি। আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। আর এমনিতে শফীর মন নরম হয়ে আছে, এখনই বাস্তবতায় যেতে তার মন একেবারে চাচ্ছে না। সমাজ যা করছে করে যাক। এখন তার কল্পনা করার সময়। কাউকে তেমন ঘাটাতে যাবে না, না হলে তার কল্পনাবিলাসর শৃঙ্খলা তালগোল পাকিয়ে যাবে। না হলে কি মেজবউয়ের মুখ থেকে রক্ত বের করতে পারত না? তারপর যে

ঘটনা ঘটত, তা সামলাতে হত বাস্তবতার ভেতর দিয়ে, সেজন্যে সে সেই ঘটনায় যেতে ভয় পেয়েছে। সেজন্য সামান্য কড়কে দিয়ে মিটিয়েছে। দুদ্দাড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে গণ পায়নি মেজবউ। খুব হাসি পেয়েছিল মেজবউয়ের পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে। না হলে সত্যি সত্যি লাঠি দিয়ে মেজবউয়ের মুখে মারতে হত, যে মুখ দিয়ে ওই সওয়াল বের করে, সেই মুখ রক্তে ভাসিয়ে দিতে হত। ঘটনাটায় যে যেতে হয়নি, তার পরিবর্তে যে মজাদার পালিয়ে যাওয়া দৃশ্য পয়েছে, তা কম উপভোগ্য নয়। সাপও মরল না। লাঠিও ভাঙল না। মেজবউ তার হাতে রক্তারক্তি হলে কী যে ঘটত তারপর—যা ঘটতই না কেন তাকে ভয় করত না, কিন্তু তার এই কল্পনাদশার তৃপ্তির বারোটা বেজে যেত। যা হয়েছে ভালই হয়েছে।

আবার কল্পনাবিলাসকে নির্ঝঞ্ঝাট ফিরে পায় শফী। আর তার জন্যেই তে তার সমাজের সঙ্গে মেশা হচ্ছে না, কড়কে দেওয়া হচ্ছে না। সমাজ যা করছে করুক গে, পরে দেখা যাবে। এখন কল্পনায় থাকতে তার ভাল লাগছে।

মেটিয়াবুরুজের রাস্তায় রাস্তায় একটু রাত বাড়লে যখন লোকজন কমে যায় সেই দশটা সাড়ে দশটার সময় আজও বেরিয়ে পড়ে। বেশ হেঁটে হেঁটে চলতে ভাল লাগে তার। পাশ থেকে চেনা জানা লোক চলে যায়, কিন্তু তারা কথা বলে না, সালাম দেয় না। শফীর মুখোমুখি হওয়ার দুঃসাহস কারও একটা হয় না অথচ তারা পেছনে চলে গিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখতে থাকে সে এই রাতে কোথায় যাবে সেটা দেখা তাদের দরকার, তাদের কৌতূহল। মানুষ খুব কৌতূহলপ্রিয়, অন্তত রাতে এমন বেরিয়ে পড়ার ঘটনার ভিতর দিয়ে বুঝেছে শফী। তার যে এই রাতের বেলা পথে পথে ঘুরতে ভাল লাগছে, এতে যে কোনো উদ্দেশ্য নেই, সে কথা সমাজ মানবে না। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, কোথায় কোথায় যাবে শফী। শফী নিজের মনে হাসে, সে কোথায় যাবে? সে কি নিজে জানে ছাই, সে কোথায় কোথায় যাবে? চলতে চলতে পা যেদিকে যেতে চাইবে সেদিকেই যাবে। পানিকল, জব্বার হাট, কিলখানা, কানখুলি যেখানে মন চাইবে সেখানে চলে যাবে।

কোনো মোড়ে কোথাও পানের দোকানে দাঁড়িয়ে হয়তো পান খাবে। এক দাঁড়াবেই বা। অথবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নেবে খানিকটা। ভাববেও বা, কল্পনা থাকবেও বা। রাত বাড়িয়ে তুলবে আরও আরও। রাস্তায় গাড়িঘোড়া অনেক অনে কমে যাবে। দিনের আলোয় যে রাস্তাকে দেখে, যে যানজট দেখে তার মনে হ কত সংকীর্ণ, গাড়িঘোড়া চলাচলের পক্ষে কত সরু, এখন মনে হয় তার প্রশস্ত চোখের দেখার তৃপ্তিও জোটে।

যেন সে গোপন অভিসারে বেরিয়েছে। এমন মনে হওয়ার মধ্যে তৃপ্তিদায় এক অনুভূতি হয় তার। যেন তার মনে হয় কোনো ইতিহাসের অধ্যায়ে ঢু পড়েছে, যেন সে এক বিগত পুরুষ। সে নয়, এক বিগত পুরুষ হাঁটছে।

মহৎ কিছু অনুভব তার মধ্যে এসে যেন ছেয়ে দেয়। সমাজকে বাঁচাতে হবে, ধর্মকে বাঁচাতে হবে। যারা ধর্ম নাশ করছে, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলবে সে। ধর্ম যারা মানছে না, খোদা তালাকে ভুলে গিয়ে নাসারা পথে চলছে, তাদেরকে জাগিয়ে তুলবে। ইতিহাসে এমন মানুষ কত শত এসেছে। যারা ধর্মের ভুল ধ্যান ধারণাকে শুধরে দিয়েছে, আল্লার পথে চলতে শিখিয়েছে। নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ও কেন, তার সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সভা-সমিতি গড়ে তুলছে। মানুষজনকে বোঝাচ্ছে। মানুষজন বুঝছে। আল্লার পথ ভুলে তারা কেন পাপের পথে চলেছে, তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এবাদত কর, আল্লার কাছে কাঁদো, যাতে আল্লা তোমার পাপ ক্ষমা করে দেয়। নিজের ধর্মের যা নির্দেশ আছে, তা ভুললে চলবে না, তাকে আমল করতে হবে। পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে। একমাস রোজা রাখতে হবে। হজ করতে হবে, জাকাত দিতে হবে। গরিবদের দান-খয়রাত দিতে হবে।

মেটিয়াবুরুজ গার্ডেনরিচ অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যা অপেক্ষা কিছু বেশি। শফী এই তথ্য খুবই শ্রদ্ধা ও গর্বের সঙ্গে মনে রাখে। বর্তমানে নটি কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড আছে, তার একটিরও কাউন্সিলর হওয়ার বাসনা নেই শফীর। সে একমাত্র মুসলমানদের নেতা হতে পারে, তেমন যদি সুযোগ আসে, তাহলে সে নেতা হবে। সে রাজনীতি মানে না, রাজনীতির নেতাদের সে মানে না। সে চায় মুসলমানদের উন্নতি, মুসলমানরা কীভাবে ঈশ্বরানুগত্যে থাকবে, সেই নিয়ে তার চিন্তা। মসজিদ নির্মাণে সে টাকা দেয়, ধর্মসভার জন্য সে চাঁদা দেয়। এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতায় হঠাৎ করে যদি সে নেতা হয়ে যায়, তাহলে সে সাগ্রহে সেই নেতৃত্ব নেবে।

রাতের রাস্তায় বেরিয়ে এমন কথা কেন জানি বার বার তার মনে আসে, এমন মহা অনুভব পায় সে। এও তার এক রকম কল্পনাবিলাসে থাকা। অনেকটা সময় পেরিয়ে যায় তাতে। আর হাঁটার ভিতর দিয়ে কত সহজে তার স্থানান্তর ঘটে যায়। এই এখানে তো আবার অন্য কোনো খানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। যত রাত বাড়ছে, পথ তত জনশূন্য হয়ে উঠছে। বদরতলা ঘুরে এসে হামদার পাড়া চলে যাচ্ছে, হামদার পাড়া থেকে শিমপুকুর লেন চলে যাচ্ছে। তারপর ফায়ের পাড়া, জয়ন্তী পাড়া, মণ্ডল পাড়া, নানাস্থানে ঘুরেছে। আর তাতে রাতও বাড়ছে। দোকানের আলো, বাড়ির আলো নিভে যেতে থাকছে। ক্রমশ আলোছায়ার একটা অদ্ভুত রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। এই রাতের রহস্যময়তা কেমন নেশার মতো পায় শফীকে।

অথচ কাল হাটের জন্য বড়তলা গভীর রাতে এখন দিন হয়ে আছে। ওখানে লরিতে লরিতে ছোট ছোট ওস্তাগাররা নিজেদের গাঁট তুলছে। আলোয় আলোকার। হইচই দোকানপশারি, লরি, ট্যাক্সি, টেম্পো ম্যাটাডোর নানান যানবাহনে ভিড় লেগে গেছে। বড়তলাকে এড়িয়ে অন্য সব দিকে অভিযান করছে শফী। ওখানে গেলে

যদিও এখনও গরম চা পাওয়া যাবে, হোটেলে হোটেলে নানা খাবারদাবারও পাওয়া যাবে। সে সবের কোনো প্রয়োজন নেই শফীর। তার এই রহস্যময়তায় থাকা খুব জরুরি। ক্রমশ আলো কমে আসছে তার পায়ে চলা পথে।

লিচুতলায় কালভার্টের ওপর তফাতে লাইটপোস্টের আলো গিয়ে পড়েছে। আর কালভার্টের ওপর একটা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তিটা কালো বোরখায় নিজেকে ঢেকে রেখেছে। কোনো এক নারী দাঁড়িয়ে আছে বোরখায় আরও রহস্যাবৃত হয়ে। পায়ে পায়ে কাছে যায়। খালের নোংরা জলে চাঁদ দেখতে পায়। আকাশের দিকে এতক্ষণ তাকায়নি, তাই চাঁদ দেখতে পায়নি। ছায়ামূর্তিটি তারই অপেক্ষায় যেন দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে পায়ে কাছে যায় শফী।

'শুনছেন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

নরীমূর্তির কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শফী। 'কে তুমি?'

নারীমূর্তি চুপ করে থাকে।

বোরখা পরে থাকার জন্য নারীটিকে ধরতে পারে না।

নারীমূর্তি বলল, 'আমি।'

'আমি কে?'

'আমি শাহনাজের খালা।'

'ও নূরজাহান বানু?'

'হ্যাঁ জি। আপনার সঙ্গে আমার দরকার, তাই পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছি।'

'বল কী প্রয়োজন?'

'মেয়েটা দুদিন কিছু খায় না।'

'কোন মেয়ে?'

'শাবানা, আমার বোনঝির মেয়ে।'

'কেন খায়নি?'

'সে আপনার জন্য পাগল।'

'পাগল।'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আপনি তাকে বিয়ে করবেন বলে যে কথা দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সে সময় হয়নি এখনও।'

'কিন্তু মেয়েটি বড় উতলা হয়ে পড়েছে। কিছুই খাচ্ছে না দাচ্ছে না। শুধু শুয়ে থাকে।'

'এখন কী করছে।'

'শুয়ে আছে। এখন তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। কোনো আলো বাতি সহ্য হয় না তার চোখে, ছোট্ট একটু প্রদীপ জ্বলছে তার ঘরে। দেওয়ালে সে

ালো পড়ে ঠিকরে এসে তার মুখখানিটুকুকেই আলো করে রেখেছে। এখন মচ্ছে। আপনি দেখবেন চলুন।'

'আমি যেতে পারি না'

'কেন?'

'কেন না আমাকে সে স্পর্শ করতে বলবে, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

'তার কপালে আপনার আলতো একটু অঙুলের স্পর্শ রাখলেন বা।'

'না, তা সম্ভব নয়, সে আমার বিবি নয়, আমার সঙ্গে তার এখনও য়ে হয়নি। আমার কাছে সে অন্য নারী, যাকে ছুঁলে, যাকে দেখলে আমার পাপ য়।'

'সে ঘুমিয়ে থাকবে, আমি তার কপালে হাত রাখব, আপনার চোখ থেকে াড়াল করে রাখব তার মুখ, আপনি এই দৃশ্য দেখবেন চলুন, আপনার ভাল াগবে।'

'আমি দেখব না—না যাব না। তার কথা বরং বল, শুনি।'

'সে ঘুমের ভেতর অনেক সময় জেগে থাকে, জেগে থাকার ভেতর অনেক ময় ঘুমিয়ে থাকে। আপনার প্রেমে বড়ই সে কাহিল হয়ে পড়েছে। হয়তো না াওয়া-দাওয়ায় সে মারাই পড়বে।'

'সে কি! তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।'

'একবার দেখা দিন তাকে। হাতজোড়ে মিনতি করি আপনার কাছে।'

'তা সম্ভব নয়।'

'তার পদ্মকুঁড়ির মতো চোখ দিয়ে আপনাকে একটিবার শুধু দেখবে।'

'আমাকে দেখা, আমি দেখা দুটোই পাপ হবে।'

'তাহলে একটা উপায় বের করুন।'

'তাকে সারাক্ষণ আল্লার কালাম পড়তে বল।'

'তাতেই সে শান্তি পাবে?'

'পাবে।'

'আপনি তো দেখেছেন আমার লাতিন খুব সুন্দরী?'

'সে জন্যেই তো আমি তাকে বিয়ে করব।'

'খোদা খায়ের করেছে, আপনার জন্যেই সে পাগল।'

মিটি মিটি হাসে শফী। তারপর হাত ইশারায় নূরজাহান বানুকে চলে যেতে লে। কিছুটা লাইট পোস্টের আলোয় ছিল নূরজাহান। ফিরে যেতে থাকে যখন গলভার্ট পেরিয়ে যেতেই চাঁদের আলো পড়ে তার বোরখায়। লিচুতলার পথে লতে চলতে মনশ্চক্ষে কল্পনায় এসব দেখে শফী। তার কল্পনার সঙ্গে মিলন য়; কল্পনায় অবগাহন করে চলে সে। মেটিয়াবুরুজের পথে পথে চলতে থাকে।

অন্য এক চাঁদের আলোর রাতে, অন্য এক কল্পনায়, নূরজাহান বানু তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল শাবানার কাছে। যে ঘরে একা প্রদীপের আলোয় ঘুমিয়ে আছে সেই ঘরের উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছে নূরজাহান বানু। সেই নারীকে অনুসরণ করে চলেছে শফী। একটা পথ ঘুরে অন্য একটা পথে পড়ছে। চাঁদও যায় সঙ্গে সঙ্গে কোন এক অজানা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ছে নারীটি। সেখানে আলো আরও মরে আছে। ছায়ায় ছায়ায় নরম সে পথ। রাত আরও পেলব মখমলের মতো অদ্ভুত হাওয়া।

একবার শুধোয় শফী, 'কোথায় কোন ঘরে?'

'এই তো আর একটু।'

'এ কোন ঘরে নিয়ে চলেছ?'

'এখন তো সে আমার কাছে থাকে না। তাকে আমি আমার ফুপতো বোনের ঘরে লুকিয়ে রেখেছি।'

'লিচুতলায় থাকেন না?'

'না সেখানে ওর মা থাকে।'

'ভালই হল ওর মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়া জুটল না। তাকে আমি ত্যাগ করেছি তার মুখদর্শন আমার শক্ত পাপ হত।'

'সে এখন আমার ফুপতো বোনের ঘরে থাকে। তার যা রূপ, তাকে তো লুকিয়ে রাখতেই হয়। সে শুধু আপনাকেই চায়।'

'একটিবার শুধু তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে চলে আসব।'

'তার সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না?'

'না। তার একটাই প্রশ্ন আমাকে বিদ্ধ করবে, কেন তার মাকে আমি তালাক দিয়েছি।'

যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় নূরজাহান বানু। নূরজাহান দাঁড়ালে শফীকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। তারপর বোরখার মুখের পর্দাটা ওপরের দিকে তোলে। 'সত্যি বলুন তো বড় মানুষের ব্যাটা, কেন মোর বোনঝিকে তালাক দিলেন?'

'তোমার মনেও এ প্রশ্ন ভর করেছে?'

'করবে না কেন শুনি! তিনদিন বে করে তালাক দিয়ে ছাড়লে, এ তো আজব কি বাত।'

'আমি যদি না বলি তালাক দিয়েছি কেন?'

'তাহলে আপনাকে সে রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাব না।'

'রাজকন্যা!'

'হ্যাঁ রাজকন্যার মতোই রূপ তার।'

'বটেই তো সে রাজকন্যা! কি রূপ তার। কিন্তু বড় বিপদে ফেললে যে নূরজাহান বানু, আমার পক্ষে যা বলা এখন সম্ভব নয়, পেট থেকে তা বের করতে চাই কেন?'

'জানার মতো কথা নয় কি? বলুন না তার কি দোষ?'

'তার কোনো দোষ নেই।'

'তাহলে?'

'আমার পক্ষে তার সঙ্গে দাম্পত্যে থাকা সুখের হত না, দিনে দিনে আমার পাপ বাড়ত।'

'কী সেই পাপ?'

'আমি বলব না। বরং আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল, ঘুমন্ত রাজকন্যার মুখ দেখার সাধ আমি মেরে ফেলছি এখুনি।'

'কি শফীউল্লা, সেই প্রিয়ার মুখ দেখবেন না? ফিরে যাবেন এতদূর এসে?'

'তাহলে জানতে চেও না শাহনাজকে কেন তালাক দিয়েছি।'

'ঠিক আছে, এখন আর প্রশ্ন করব না।'

'চল, নিয়ে চল সেই নারীর কাছে, রাজকন্যার কাছে।'

'শহরের এই অংশে সবাই ঘুমিয়ে আছে জানেন তো? পা টিপে টিপে যেতে হবে। কারোর বিশ্রাম নষ্ট করবার অধিকার আপনার নেই। জেগে উঠলে এরা প্রশ্ন করবে, আপনি প্রশ্নকেই এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন।'

'তাহলে চুপি চুপিই চল। আর কত দূর?'

'আর একটু। খুবই উতলা হয়েছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ আমি উতলা।'

'অথচ জাগিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চান না।'

'সে যে প্রশ্ন করবে। তার ঘুমন্ত মুখটুকু প্রদীপের আলোয় দেখব শুধু একদৃষ্টে খানিকটা।'

'তার মুখে একটা চুমু পর্যন্ত খেয়ে ফিরবেন না?'

'ঘুমন্ত কারোকে চুমু খাওয়া ঠিক নয়। যাকে চুমু খাওয়া হয় তাহলে তার রাগ খুব বেড়ে ওঠে। আমি রাজকন্যাকে রাগী করে তুলতে চাই না। সে ঘুমিয়ে থাকবে, প্রদীপের আলোয় তাকে একটু দেখে ফিরে আসব। ঘুমন্ত পাড়ায় আমি যাব চুপি চুপি, আমার যাওয়া কেউ টের পাবে না, রাজকন্যাও বুঝতে পারবে না আমার উপস্থিতি। হয়তো স্বপ্ন দেখবে। দেখবে কোনো রাজপুরুষ তার সঙ্গে নৌকোবিহারে যাচ্ছে। চাঁদের আলো, মিষ্টি বাতাস। রাজপুরুষের কোলে মাথা রেখে তার মদির চোখ আরও মদিরময় হয়ে উঠছে। সে স্বপ্নে বার বার পেয়ে হারাচ্ছে সেই রাজপুরুষকে। তারপরে আবার খুঁজেও পাচ্ছে। পৌঁছে যাচ্ছে তারা নির্জন দ্বীপে। দ্বীপের তীরে নৌকোটা নোঙর করা আছে। বাতাসে ও ঢেউয়ে নৌকোটা মৃদু নড়ছে। অদ্ভুত তার দুলুনি। জীবনেও এই দুলুনি অনুভব করা যায় ভালবেসে, সঙ্গসাধে থেকে। যেন এখানে তারা গোপন অভিসারে এসেছে।'

'চুপ করুন, আপনার স্বপ্নের কথা ঢের জানা গেল। এখন চলুন সেই গোপন কুঠরিতে।'

'তাকে গোপন কুঠরিতে লুকিয়ে রাখার অর্থ কিং?'

'সে রূপসী, তাকে পাওয়ার জন্য আরও অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে আপনার।'

'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী? মিথ্যে বলছ নারী?'

'সত্যি জাঁহাপনা। যেমন করে বাজপাখির দৃষ্টি থেকে নিরীহ কবুতর লুকিয়ে রাখতে হয়, আমি তাকে তেমনিভাবে আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছি। এত যে সুন্দর, যে সে তার ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে রেখেছে। যেন তার কোনো শত্রু নেই, এমন সে সরলমন।'

'তাকে কি কেউ দেখতে আসে?'

'একজনই আসে, দিনের শেষে?'

'কে সে?'

'তার মা।'

'তার মা এসে কী করে?'

'তার মা এসে তার চুল বেঁধে দিয়ে যায়। তাকে সাজিয়ে দিয়ে যায়। রাঙা আলোয় আরও সে রূপময়ী হয়ে ওঠে।'

'তার মা, তার কাছে না এলেই পারত।'

'সে যে তার মা।'

'তার মাকে যে আমি তালাক দিয়েছি।'

'তবুও তো সে তারই মা।'

'সে তার মা হতে পারে, কিন্তু জেনো নূরজাহান বানু, সে আমার কেউ নয়। আমার সঙ্গে সে নারীর মায়ের কোনো সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হতে নেই।'

'কথা দিচ্ছি, এখন সে সেখানে উপস্থিত নেই। আর কন্যা ঘুমিয়ে আছে। আর আপনাকে কন্যার সঙ্গে কথা বলতে হবে না, তার প্রশ্নের সামনে আপনাকে পড়তে হবে না।'

তারা চলতে লাগল। চলতে চলতে তারা কথা বলতে লাগল। ছায়া ছায়া মরা আলোর গলির ভেতর দিয়ে তারা নিঃশব্দ পায়ে নিঃসাড়ে চলতে লাগল। অনেকটা পথ যাওয়ার পর তারা একটা খোলা দরজা দেখতে পেল। ঘরের ভেতর হালকা একটু আলো। দেওয়ালের গায়ে একটু প্রদীপ মথের মতো ছোট্ট শিখা নিয়ে জ্বলছে। আর বিছানায় শায়িত সেই সুন্দরী নারী। ঘুমিয়ে আছে। নারীর দিকে তাকিয়ে থাকে শফী একদৃষ্টে, অপলক চোখে। চুম্বন করার জন্য ছটফট করে ওঠে। কিন্তু সে চুম্বন করে না, করবে না। নিজেকে সংযত করে রাখে। অথচ মুখটা নামায় চুম্বনের ভঙ্গিতে। চোখ ভরে দেখে সেই নারীর মুখ। যত দেখে ততই সে নারীকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠতে থাকে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে তার। আর তার নিশ্বাসের শব্দে রূপসীর ঘুম না ভেঙে যায় সে জন্য তার ভয় হয়। মুখ তেমনভাবেই নামিয়ে রাখে রূপসীর মুখের দিকে।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে ঘরের কোণে, সেখানে এক ছায়া নড়ে ওঠে। তৃতীয় ব্যক্তি কেউ এখানে আছে। 'কে?'

তৃতীয় ব্যক্তি কোনো কথা বলে না।

পাশ ফিরে নূরজাহান বানুকে শুধিয়ে জানতে চায়, 'কে এই রমণী?'

'আপনার অত জানার দরকার নেই, আপনি আপনার নারীকে দেখতে এসেছেন, দেখে চলে যান। সব কিছু জানার আপনার দরকার নেই। আর আপনার পক্ষে এত জানা সুখকর হবে না।'

'বল, আমি জানতে চাই এ রমণী কে? শাবানার সখি কি?'

'না। ওর মা।'

'এখন এখানে কেন? বল ওকে চলে যেতে।'

'ও ঘুম পাড়াবার জন্য গল্প বলছিল, গল্পটা বড় হওয়ায় যেতে দেরি হচ্ছে।'

'ও কেন আসে?'

'ও যে তার মা! আসবে না কেন?'

'ওর মা হতে পারে, কিন্তু আমার কেউ নয় কিন্তু।'

'আহ্ আস্তে কথা বলুন, ঘুম ভেঙে যেতে পারে রাজকন্যার।'

শফী কন্যার দিকে আবার তাকায়। কিন্তু শাহনাজের উপস্থিতিতে খিঁচড়ে উঠেছে মন। খুব তাড়াতাড়ি দেখা সেরে নেয়। এবার ফিরবে বলে তাকানো শেষ করতে যেই গেছে অমনি ঘুমন্ত কন্যা ঘুমের মধ্যে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তাকে তেমন অনস্পর্শ রেখে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে শফী। এখন কন্যাকে স্পর্শ করা উচিত হবে না।

১২

হ্যাঁ, এবারেও শাবানাকে স্পর্শ করা সম্ভব হল না শফীর পক্ষে। অন্যায় হয়, পাপ হয়। শাবানা তার বিয়ে করা বিবি নয়, তাকে কীভাবে স্পর্শ করতে পারে শফী? শাবানার সঙ্গে কল্পনায় দেখা হচ্ছে, অথচ তাকে স্পর্শ করছে না। পাঠক, যেহেতু শফী কল্পনায় শাবানাকে কাছে পায়, সেহেতু তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারত শফী, তাতে তো তার পাপ হত না। বাস্তবে শাবানাকে স্পর্শ করা হত না। কল্পনাকে শফী সংযমী ধর্মনিয়ন্ত্রিত করে তোলে। অদ্ভুত মানুষ এই শফীউল্লা! নিজেই ভেবে পায় না, স্বপ্নে কেন শাবানাকে একটি বারের জন্য স্পর্শ করে না, একটি বারের জন্য তার অধর নামিয়ে দেয় না শাবানার ঠোঁটে। এতে তার কোথায় কীসে পাপ হয়। বাস্তবের পাপের সঙ্গে কল্পনার পাপের অনেক ফারাক। কল্পনার পাপের কোনো অস্তিত্বই নেই। তবুও সে পবিত্র থেকে যেতে চায়, সৎ এবং নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে উঠতে চায়। শাবানাকে বিয়ে করার পর একবারের জায়গায় একশো বার স্পর্শন-চুম্বন করলে তার কোনো পাপ হয় না। মাঝখানে শুধু একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য এতখানি তফাৎ। বিয়ে তো করতে চায় শাবানাকে। সে তো

ঘোরতর বাস্তবতার ব্যাপার। তার জন্য সময় লাগে, ভাবনাচিন্তা লাগে, প্রস্তুতি লাগে। এখন কল্পনায় অবগাহন করতে পারছে শফী। বেশ থাকা জোটে। বাস্তবতার বড় হাঙ্গামা। এদিকে লোকজন তার বিরুদ্ধে নানা কথাবার্তা বলছে। মেটিয়াবুরুজ আলোড়িত হয়ে উঠেছে এই সময়।

নাসের মাস্টার ও অন্যান্য লোকজন তার বিরুদ্ধে কী সব বলছে, সেই বাস্তব চিত্র কী রকম, এসব তথ্য হিসেবে পাচ্ছে, কিন্তু সেই বাস্তব চিত্রের সঙ্গে শফী কোনো সংযোগ ঘটাতে চায় না এখন। এখন সে একেবারে বাস্তব ঘটনার ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়। মেজবউ বাস্তব ঘটনা তৈরি করতে এসেছিল তাকে যথেষ্ট কড়কে দিয়েছে, আর দুঃসাহস হবে না মেজবউয়ের। শাবানার বাস্তবতা কী রকম, শাহনাজের বাস্তবতা কী রকম, সে সবের মধ্যে আমরা এখন যেতে চাই না, যেহেতু শফী এই বাস্তবতা সরিয়ে রেখেছে। সে সবের ভেতর দিয়ে কিস্‌সা এখন এগোবে না। এখন আমরা শফীকে বেছে নিয়েছি, তার কল্পনার ভিতর দিয়ে এখন কিস্‌সা পথ খুঁজে নিচ্ছে। আমাদের কিস্‌সার অন্যতম চরিত্র শফী, তার কল্পনার বিলাসকে আমাদের মান্য না করে উপায় থাকে না। আমরা এ কথা বলতে পারছি, মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা গড়ে উঠছে, তারই নিজস্ব গতিতে।

শফী এখন কল্পনায় অবগাহন করছে, তার কল্পনার এখন শেষ নেই। নিরুৎসাহিত নয় সে। বেশ তার থাকা জোটে শাহনাজকে তালাক দেওয়ার পর তসবির মতো অমন কল্পকাহিনী সত্ত্বেও মন তার ভরেনি। শাবানাকে কানার মতো সিনেবার টিকিট ব্ল্যাকার ভাইজান দিয়েও ক্ষান্তি নেই।

অথচ আমরা জানি, কল্পনা ফুরোলেই শাহনাজের যে বাস্তবতা, তালাক খেয়ে সেই যে ফিরে গেল ভোরবেলা, সে কেমন আছে, তার প্রতিক্রিয়া যাপন কীরকম বাস্তবতায় পাচ্ছি, তার খালা নূরজাহান বানুর প্রতিক্রিয়া কী, শাবানা কী মনে করছে? তারা কীভাবে আছে। শাবানার বিয়ের সম্বন্ধ শেষমেষ কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে? এসব লেখকের যেমন কৌতূহল আছে, তেমনি পাঠকদেরও। কিন্তু এখন আমরা শফীর কল্পনাতেই মজে আছি। কিছুতেই এ কিস্‌সাকে এ মুহূর্তে বাস্তবতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না। যেহেতু শফীর মতো এক চরিত্রকে বেছে নিয়েছি, সেহেতু তাকে এড়িয়ে চলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র শফীই সেই অবকাশ ফিরিয়ে দিতে পারে।

এই কল্পনা কি আমাদের কিস্‌সা গড়তে সাহায্য করেনি? বিস্তর করেছে। মেটিয়াবুরুজের বুকে কত আলৌকিক রাত্রি নেমে গেল। চরিত্রদের মুখে কত রকম সংলাপ শোনা গেল। বাস্তবতায় যে ঘটনা ঘটে তার মধ্যে যুক্তি অনেকখানি, কিন্তু মুক্তি একেবারেই নেই। শফীর হাত ধরে এমন সব ঘটনায় যাওয়া গেছে তার মধ্যে বাস্তবতার অনেক দায় এড়ানো গেছে। অনেক কথা চরিত্ররা বলতে পারে না, বলেছে। এসব কম কী পাওয়া? এ কিস্‌সার কোনো ছক নেই, সে চলে তার গতিতে। আমরা শুধু অনুসরণ করি মাত্র। কিস্‌সাকে মুক্তি দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

চরিত্রের প্রতি সৎ থাকতেই আমরা এই কল্পনায় যাচ্ছি। চরিত্রকে অনুসরণ করি। এখন শফী সেই অপরূপা নারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে ফিরে এসেছে। কিন্তু স্পর্শ করেনি। তারপরেও শফীর সাধ আর একবার এখনই সে যাবে সেই নারীর জন্য অভিসারে, তাকে স্পর্শ করা যায় কিনা কল্পনার ভিতর তার নিজের প্রতি নিজেরই অনিশ্চয়তা, তাই পুনর্বার কল্প ঘটনার ভেতর গিয়ে দেখছে, সে সেই নারীকে স্পর্শ করতে পারে কিনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বিছানার পাশে মুখ নীচু করে তাকে দেখার কল্প ঘটনায় যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারছে না সে সেই নারীকে কল্পনায় স্পর্শ করল না অনস্পর্শ রেখেই ফিরল?

শফীর এ রকম অবস্থা দেখে মনে হয়, কল্পনাও মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। কল্পনার মধ্যেও ঘটনার পরতে পরতে বাস্তবতার মতো অনিশ্চিত রহস্যময়তা আছে। আছে বাস্তবতার মতো ঝুঁকি। কল্পনায় শাবানাকে স্পর্শ করতে চাইলেই স্পর্শ করা যায় না। তুবও কল্পনা ঘটিয়ে বার বার দেখে নিতে হয় আগেব বারে পারা গেল না, এবারে পারা যায় কিনা। কল্পনার একই ঘটনা পুনর্বার আনুপূর্বিক একই যে হবে তার কোনো ঠিক থাকে না। পরের বারে অন্য একটা চরিত্র এসে যেতে পারে, অন্য সব সংলাপ জুটে যেতে পারে, তখন ঘটনাটা নতুন কোনো মোড় নিতে পারে। তাই আমরা শফীর পুনর্বার কল্পনায় যাওয়াকে মান্য করি।

শফী যতই কল্পনাতে যাক না কেন, তাকে এক সময় একদিন বাস্তবতায় ফিরে আসতেই হবে। তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে, হবে। বাস্তবতায় না ফিরলে তার শাবানাকে বিবি হিসেবে পাওয়া জুটবে না। সে তো চায় শাবানাকেই শাদী করতে। তার মা শাহনাজকে বিয়ে করে ভুল করেছিল বলেই না তাকে তালাক দিয়েছে, তাকে স্পর্শ করার আগে। তার ধর্মের বিধিবিধান মতে, নতুন বিবির সঙ্গে সহবাস করার আগেই তাকে একবারেই তালাক দেওয়া যায়। আর সেই তালাক দাম্পত্যের ভিতর আর পাঁচটা তালাকের মতো দায় থাকে না। সেই নারীর কন্যাকে বিয়ে করা আটকায় না। তার শাস্ত্রজ্ঞান মতে সে এসব বুঝেছে।

তাই শফীকে সেই বাস্তবতায় ফিরতে হবে। এখন কল্পনায় উড়ান দিয়ে চলেছে।

মেটিয়াবুরুজে এমন এক ধনী পরিবারের মানুষ, তার পক্ষে গরিব ঘরের কোনো কন্যাকে নির্বাচন করে বিয়ে করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। তার ওপর সে শাস্ত্রজ্ঞ। তার পাণ্ডিত্ব দিয়ে অনেক মৌলবি মোল্লাদের ভুল শুধরে দিয়ে থাকে। সমাজ তার ওপর নির্ভর করে, সমাজকে সে নিয়ন্ত্রিত করে। বাস্তবতার জমি তার যথেষ্ট পোক্ত। টাকা শফীর যথেষ্ট আছে, খাওয়ার লোক নেই। তার বড়দার তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। এলাহি ব্যবসা ফেঁদে ফেলেছে। সমাজ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে চলে।

এসব সত্ত্বেও শফী কল্পনার বিলাসে থাকতে এখন ভালবাসছে। এতদিন তো বিয়ে না করেই জীবন কাটিয়ে এসেছে। না হয় আরও কিছুদিন পর পাকাপোক্ত বিবি ঘরে আনবে। বিবি পছন্দ নয়, অথচ তাকে নিয়ে ঘর করবে, এমন বাধ্য

সে হবে কেন? আর যেহেতু তার শাবানাকেই পছন্দ, শাহনাজের সঙ্গে সহবা
পর্যন্ত গিয়ে তালাক দিলে যখন শাবানাকে বিয়ে করা চিরতরে শেষ হয়ে যায়
শাহনাজের সঙ্গে সহবাসের পর তালাক দিলে শাবানা নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে, তখ
শাহনাজকে তালাক না দিয়ে উপায় থাকে না তার।

এই বিয়ে একটা দুর্ঘটনা। বিয়ে ঘটেনি ধরা যেতে পারে। তারপর কি শাবানা
বিয়ে করা তার পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়? মেটিয়াবুরুজের ধনী ব্যবসায়ী ঘ
কবে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে? আর এখানকার ধনী ব্যবসায়ীরা গরিব ঘরে সুন্দ
মেয়ে পেলে বিয়ে করতে বেশি গৌরব বোধ করে। তার প্রচলনও আছে যথে
শিক্ষিতার চেয়ে সুন্দরী বড় বেশি প্রিয়। গরিব ঘরের মেয়েরা রাস্তায় বেরতে পা
না, তাকে পছন্দ হয়ে যায় কোনো ব্যবসায়ীর। এক মেয়েকে বিয়ে করার জ
দুই ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কোনো বিয়ে বাড়িতে ধনী ব্যবসায়ীরা গে
তাদের নজর থাকে মেয়েদের দিকে, অবিবাহিত যারা আছে তাদের মধ্যে সুন্দ
আছে কিনা! পাত্রের বাবারা এ রকম দেখে দেখে বেড়ায়। পছন্দ হলে তারপ
খোঁজখবর নেয় মেয়েটির ব্যাপারে। গরিব হলে তো বিয়ে দিতে সুবিধে হ
এমনভাবে সুন্দরী কন্যাদের সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীর চার পাঁচজন ছে
তাদের বিয়ে হল সব সুন্দরীদের সঙ্গে। বাড়িতে সুন্দরীদের হাট বসে গেল।

শাবানাকে বিয়ে করতে চাওয়ার মধ্যে নতুন কিছু ব্যাপার নয়। যে সুন্দর
সে কথা তো সকলেই বলবে। তবে খুবই গরিব তারা। তার সৌন্দর্য তাই অ
কারোর চোখে পড়েনি, দারিদ্র্যের আড়ালে অবহেলায় আস্তাকুড়েয় রত্ন পড়ে থাকা
মতো দৃষ্টির আড়ালে পড়েছিল শাবানা। শাহনাজের সামান্য রূপের মধ্যেই হাবুডু
খেয়ে ছিল বলেই শাহনাজকে বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলেছিল শফী। কি মর্মান্তি
ভুল। আজ সেই ভুলের খেসারত দিতে কল্পনা বিলাসে বারবার পুনর্বা
ক্লান্তিহীনভাবে যাচ্ছে শফী। যেতে বাধ্য হচ্ছে। কেন না শাহনাজকে বিয়ে ক
ও তালাক দেওয়ার ঘটনাই তো তাকে কল্পনায় যেতে অধুনা বাধ্য করাচ্ছে। কল্পনা
যত রাজা উজির মারুক না কেন, বাস্তবতার সামান্য প্রাপ্তি প্রাপ্তিই, তাকে ভো
করা যায়।

যখন শফীর কাছে কল্পনার বিলাস অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, তখন এ
কল্পনাকে ক্লান্তিকর অবান্তর মনে হবে। এখন মনে হচ্ছে না যেহেতু তার কল্পন
প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে না। এখন সে কল্পনাকে আশ্রয় করে আছে। তার এখ
ভাববার কথা, এবার যে রূপসী কন্যার জন্য অভিসারে বেরবে, সেখানে সে
ঘটনার ভিতর কন্যাকে স্পর্শন চুম্বন করবে কিনা। আগে থেকে কিছু ভেবে নি
পারছে না, বলতে পারছে না। কল্প ঘটনায় গিয়েই ঘটনার রহস্যের ভিতরই স্প
করবার চাহিদা থাকলে স্পর্শ করবে, চুম্বন করবার চাহিদা থাকলে চুম্বন করব

এখন এই মুহূর্তে সেই কল্প ঘটনায় যাবার জন্য পুনর্বার তৈরি হয়ে উঠ
শফীউল্লা।

প্রাক-বিবাহ পর্ব

শফীউল্লার মধ্যচল্লিশ বছর বয়সের জীবনে হঠাৎই বিয়ে এল। এক বছর-চল্লিশ বছরের বিধবার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করে ফেলা ঘটে গেল তার। বিয়ের দুদিন পরে বিবি শাহনাজকে আবার তালাক দেয় সে। মেটিয়াবুরুজের বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও তার এক অনাড়ম্বরভাবে বিয়ে হয়েছিল, সেটা একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা মেটিয়াবুরুজের জনপদে। তার দুদিন পরে সেই বিবিকে তালাক দেওয়াটাও কম চাঞ্চল্যকর নয়। এসব ঘটিয়েছে শফীউল্লা, সে এই ঘটনার নায়ক। কেনই বা শফীউল্লা বিয়ে করল, আর কেনই বা ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তালাক দিল, পর পর ঘঠনাই রহস্যজনক। মেটিয়াবুরুজের মানুষ এ নিয়ে কথা বলছে, তাদের কথা বলার নতুন বিষয় পেয়েছে তারা। আর এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা বাতাসে রটে যায়, মানুষের মুখে মুখে চলাচল করে। সরব হয়ে ওঠে মেটিয়াবুরুজের মানুষ। আর 'হীরামন ভ্রেম' পরিবার এ অঞ্চলে মস্ত বড় ধনী, তাদের ঘটনা তো বিরাট করেই রটবে।

আসলে বিধবা শাহনাজকে শফীউল্লা একটু একবার দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। আর এতবছর অকৃতবিবাহ থাকার পর, প্রথম বিয়ের সাধও জেগে উঠেছিল। যেদিন দেখে, তার পরের দিনই অনাড়ম্বরভাবে শাহনাজকে বিয়ে করে ফেলে। তার জন্য এতদ্বঞ্চলের বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বড়ভাই শওকতউল্লা খাপ্পা হয়। বাড়ির মান ইজ্জত খর্ব হয়। তাতে কিছু মনে করেনি শফীউল্লা। শফী যা ভাবে, তা করে। সমস্যাটা সেখানে নয়।

সমস্যাটা হল শাহনাজকে বিয়ে করার পর, শাহনাজের মেয়ে শাবানাকে দেখে যে মুগ্ধতা পেয়েছে, সেটা নিয়ে। যে দিন সন্ধ্যায় শাহনাজকে আনতে পাঠিয়েছিল, সেদিন দুপুরে শাবানাকে দেখে শফী। শাহনাজের চেয়ে শাবানা শতগুণ মুগ্ধকারিণী, সুন্দরী। আর শাবানার প্রেমে পড়ে যায়। শাবানাকে জীবনে না পেলে জীবন বৃথা, এমন একটা ভাবনা মনে আসে মুহূর্তে। শফী ধার্মিক, ধর্মবেত্তাও বটে। ধর্মের অনেক বিধিবিধান জানে। শাহনাজকে বিয়ে করবার পরই তারই মেয়েকে জীবনে পাওয়া তো সোজা নয়। মা ও মেয়ে একই স্বমীত্বে থাকতে পারে না, ধর্মে এ নিয়ে কড়া নিষেধ আছে। একমাত্র সম্ভব, মাকে বিয়ে করার পর সহবাসের আগেই যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ হবে। সেজন্য সে রাতে শফী শাহনাজকে তালাক দিয়েছিল। শাহনাজ হতচকিত হয়েছিল। তার পরিবারে লোকজন কার্যকারণ খুঁজে পায়নি। মহল্লার মানুষজন ভেবেছিল বড়লোকের খামখেয়ালিপনা। কেউ কেউ প্রতিবাদের স্বরে নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করেছে। শফী সে সবকে ভয় পায় না। তার একটাই লক্ষ্য, সে এমন কিছু করবে না, যা ধর্মবিরোধী হবে। তার কাজে কে কী মনে করল, কে কী বলা কওয়া করল,

তাতে তার কিছু এসে যায় না। তালাক দেওয়া বৈধ, তালাক দিয়েছে। মাকে বিয়ে করা সত্ত্বেও মেয়েকে এ ক্ষেত্রে বিয়ে করা বৈধ, সে বিয়ে করবে।

তালাক দেওয়ার সাতদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন শাবনাকে কীভাবে জীবনে পাবে, সে নিয়ে তার চিন্তা। তেতলার দখিন দিকের ঘরে এই কটা দিন একা একা কাটিয়েছে শফী, আর ভেবেছে। রাতে খানিকটা মেটিয়াবুরুজের পথে পথে ঘুরে আসতো। বাকি সময়টা গৃহবন্দী হয়ে থাকত। তার কারবারের ম্যানেজার জিয়াদ তার সঙ্গে দিনে একবার দেখা করে যেত, কারবার নিয়ে আলোচনা করে যেত। আর তার বড়ভাবি কাজের মেয়ের হাত দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিত। মসজিদেও যেত না, বাড়িতেই নামাজ পড়ে নিত। একা একা থাকার ভিতর শাবানাকে জীবনে পাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। লোকে জানে, মাকে বিয়ে করার পর মেয়েকে বিয়ে করা যায় না, লোকের এই ভুল ধারণা খণ্ডন তাকেই করতে হবে। আর এই বিয়ে সে ঘটাবেই। তার জন্য ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। ভাবনাচিন্তাও বিস্তর করেছে সে। এবারে নেমে পড়তে হবে বিয়ে করার উদ্যোগে।

একটা একটা করে মানুষজনের ভুল ধারণাকে ভাঙতে হবে। প্রথমে তার বড়দা শওকতউল্লার ভুল ভাঙাতে হবে। তারপরে বাড়ির লোকজনদের। তারপর মৌলবি মোল্লাদের। এরকম বিয়েতে আটঘাট বেঁধে প্রস্তুতি নেওয়া বড় প্রয়োজন। ধর্মবিরোধী না হলেও লোকবিশ্বাস বড়ই স্পর্শকাতর, তাকে সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। সেজন্য শফী আটঘাট বেঁধে কাজে নামতে চায়। আগের বিয়েটা কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে করে ফেলেছিল। এ বিয়েটা সবাইকে জানিয়ে বুঝিয়ে করতে হবে।

রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল। সকালবেলা বেশ ফুর ফুরে লাগছিল মনটা। মন উন্মুখ হয়ে উঠল এ নিয়ে বড়ভাই শওকতউল্লার সঙ্গে কথা বলতে। পায়চারি করল বারান্দায় খানিকটা। তারপর মনে পড়ে গেল, আরে, শাহনাজকে তো দেন মোহরের টাকা দেওয়া হয়নি। তাছাড়া তালাক খাওয়ার পর গহনাগুলোও একটা একটা করে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। দেন মোহরের পঞ্চাশ হাজার টাকা আর গহনাগুলো এখুনি পাঠানো দরকার। শাহনাজের এসব হকের পাওনা। ওসব না দিলে মহাপাপ হবে তার। সাতদিন হয়ে গেল তালাক দিয়েছে, দেন মোহরের টাকা দিতে কীভাবে ভুলে গেল শফী? ম্যানেজার জিয়াদ এখুনি তার কাছে আসবে। জিয়াদকে দিয়ে টাকা গহনা আজই পাঠিয়ে দেবে সে। আর শাহনাজও পঞ্চাশ হাজার টাকা আর পাঁচভারি গহনা পেয়ে যাবে। বিয়ে হল তিনদিন, তারপর তালাক হল। শাহনাজের লাভই হল, পঞ্চাশ হাজার টাকা ও পাঁচভরি সোনা পেয়ে গেল এই টাকা ও গহনা দেওয়ার খবর জনগণ পেলে, তাদের ক্ষোভ খানিকটা স্তিমিত হবে নিশ্চয়।

সঙ্গে সঙ্গে যদি এই টাকা গহনা দিয়ে দিত, তাহলে জনগণ এতখানি উত্তাল হত না, এতখানি তার বিরুদ্ধে যেত না। আর শাহনাজ ভীষণ ক্ষেপে গেছে-- এই টাকা গহনা পেলে তার রাগ থামতে বাধ্য।

আলমারি খোলে শফী। সামনেই রাখা ছিল গহনার পুঁটুলিটা। একটা রুমালে া। টেনে বের করে আনে। গহনাগুলোকে একটা একটা করে খুলে তারই পায়ের ছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল শাহনাজ। জিয়াদ সেগুলো কুড়িয়ে রুমালে বেঁধে খছিল। পরে তাকে দেয়। প্রায়ই যেমন কারবারের টাকা এনে দেয় ম্যানেজার াদ, তেমনি গহনার পুঁটুলিটা কারবারের টাকার সঙ্গে গুঁজে দিয়েছিল। তাই ার সঙ্গে গহনার পুঁটুলিটা রেখেছিল শফী। গহনার পুঁটুলিটা বাঁ হাতে রেখে টা বাণ্ডিল আলমারি থেকে বের করে নেয়। এখুনি এই টাকা গহনা পাঠানো । শাহনাজের কাছে। শাহনাজ তার বিগত স্ত্রী। এখন তার কেউ নয়।

আলমারি বন্ধ করে টাকা আর গহনা বিছানার ওপর রাখে শফী। ভাবে, আজই া বলতে হবে বড়বাই শওকতউল্লার সঙ্গে। দেওয়ালের কাবা শরীফের ছবির ক ফেরে শফী। 'এই যে জিয়াদ, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

জিয়াদ বলে, 'জি।'

শফী লক্ষ্য করে এই কদিন ধরে জিয়াদের মিন মিনে স্বর। বড় ভয় পায় াকে। শফীর মেজাজের সামনে থর থর করে কাঁপে। সাতদিন আগে জুতোর ড় খেয়েছিল, সেই থেকে মিন মিনে স্বর, মুখ তুলে তাকায় না।

শফী বলল, 'এই যে বিছানায় দেখছ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর পুঁটুলিতে গহনা, াব এখুনি লিচুতলায় গিয়ে শাহনাজকে দিয়ে আসবে।'

জিয়াদ মাথা নীচু করেই বলল, 'জি।'

'দেরি করবে না কিন্তু, আধঘণ্টার মধ্যে দেওয়া চাই।'

জিয়াদ মুখ নামিয়ে বলল, 'কিছু বলতে হবে?'

'বলবে এগুলো তোমার পাওনা, আমার নাম করে বলবে, আমি পাঠিয়েছি। বে তোমার হকের পাওনা মেটাতে এতটুকু দ্বিধা ছিল না আমার। শুধু ভুলে য়ার জন্য দিতে দেরি হল। টাকাটা দেন মোহরের টাকা।'

'আর কিছু বলতে হবে?'

'না, আর কিছু না।'

জিয়াদের গলায় গামছা ছিল, গলার গামছা খুলে গহনা আর টাকা গামছায় ধে। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এল শফী, 'দেরি করবে না কিন্তু।'

জিয়াদ মাথা নেড়ে না জানাল।

শফী ফিরে যায় ঘরে। একটু দাঁড়ায়। ভাবে, কীভাবে তার বড়ভাইয়ের সঙ্গে নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে? দেরি করা চলবে না। শাবানাকে পাওয়ার া তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মনের এই অস্থিরতা বেশিদিন বয়ে বেড়ানো ম্ভব। তাছাড়া শাবনার কোথায় যেন বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, সে নিয়ে কথাবার্তা ছে। দেরি করলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। শাবানাকে জীবনে পাওয়া তার ব না। সে এক বিচ্ছিরি কান্ড ঘটবে। শফীর ইহকাল পরকাল বরবাদ হয়ে র। কেন না শাবানাতে মুগ্ধ হয়ে আছে সে। বিয়ে করেনি এমন কোনো নারীর

প্রতি আসক্ত হওয়া গর্হিত কাজ, ধর্মবিরোধী। এমন অবস্থায় শফীর পক্ষে বেশিদি
থাকা সম্ভব নয়। পাপ বাড়বে। এই পাপ বাড়লে তো পরকাল বরবাদ হয়। প
বাড়াতে পারবে না শফী। এ নিয়ে বড়ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে তা
আজ, এখনই।

কথাটা কীভাবে পাড়বে সে নিয়ে গড়িমসি শফীর। বড়ভাইয়ের মুখোম
দাঁড়াতে হবে তাকে। বোঝাতে হবে এক্ষেত্রে মাকে বিয়ে করার পরও মেয়ে
বিয়ে করা যায়। সে কোনো পাপ করবে না, ধর্মবিরোধী হয়ে উঠবে না। ব
ধর্মের প্রতি পূর্ণ আস্থার পরিচয় দেবে।

নীচে নেমে আসে শফী। এ বাড়ির লাগোয়া পাশের বাড়িতেই থা
শওকতউল্লা। দু-পা হেঁটে গেলেই পেয়ে যাবে বড়ভাইকে। কিন্তু সে যাবে ন
ফোনে কথা বললে হয় না? ফোনেই কথা বলবে সে। নীচে দাদার অফিস ঘ
পৌঁছে যায়। ম্যানেজার ওসমান টেবিল চেয়ারে বসে লেখালেখির কাজ করছি
শফীকে দেখে ওসমান উঠে দাঁড়ায়।

শফী বলল, 'ওসমান, ফোনে প্রাইভেট কথা বলব, একটু বাইরে যাও। ডাক
তবে আসবে।'

ওসমান সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় অফিস ঘর থেকে।

শফী নম্বর মেলায়। ওদিকে রিং হচ্ছে।

'হ্যালো।'

'হ্যালো। কে?'

'আমি শফী।'

'ও ছোটভাই? কোথা থেকে?'

'আমি অফিসঘর থেকে বলছি।'

'ও এখানেই আছ!'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা বলব।'

'ও আচ্ছা, তাই বল।'

'মানে, আমি বিয়ে করতে চাই।'

'সে তো ভাল কথা। মেয়ে খুঁজি তাহলে?'

'আমার পচ্ছন্দ করা মেয়ে আছে!'

'কোথায়?'

'এই লিচুতলায়। যাকে বিয়ে করেছিলাম, তারই মেয়ে। অপরূপ সুন্দরী

'তুমি তার মাকে তো বিয়ে করেছিলে?'

'হ্যাঁ, এবার মেয়েকে বিয়ে করব।'

'মাথাটা ঠিক আছে, ভাই তোমার?'

'মাথা আমার ঠিক আছে দাদা।'

'মাকে বিয়ে করার পর মেয়েকে বিয়ে করা যে হারাম, তোমার মত আ
লোক এতবড় ভুল করছে কেন?'

'ভুল আমি করিনি, তুমি অন্ধ আর মুর্খ, তোমার অশিক্ষাই তোমাকে এমন বিরোধী কথা বলাচ্ছে। ধর্মে বিধান দেওয়া আছে, এ ক্ষেত্রে মেয়েকে বিয়ে া যায়। কেন না মায়ের সঙ্গে সহবাসের আগে তালাক দেওয়া হলে পর মেয়েকে য় করা জায়েজ।'
'ধর্মে এমন বিধান আছে, তা তো জানতাম না।'
'জানতে হয়।'
'তা ভাই, ওর মেয়েকেই বিয়ে না করলেই চলে না? তুমি বড় ঘরের ছেলে, ন ঘরে বিয়ে করবে। সেটা ভাল দেখায়।'
'সে তুমি বুঝবে না, কেন তাকে বিয়ে করতে চাই।'
'বুঝিয়ে বললে বুঝব না?'
'আমাকে তাকে ভাল লেগেছে। মন তাকেই চায়।'
'এমন জেদ করছ কেন? তুমি তার মাকে বিয়ে করেছিলে, লোক নিন্দে মন্দ বে।'
'আমি তো কোনো অন্যায় করব না, ধর্ম বিরোধী কাজ করব না।'
'ওকে বিয়ে না করলে তোমার চলবেই না?'
'হ্যাঁ।'
'তারপর আবার তাকে তালাক দেবে নাতো?'
'না না, সে আমার প্যারা। তাকে আমি ভালবাসি।'
'ভেবে দেখ ভাইটি।'
'ভেবে দেখেছি।'
'তাহলে তো মৌলবি কাদের মক্তদুদি ও আরো কয়েক জনের সঙ্গে বসতে া। ধর্মের এই বিধান তারা জানে কিনা সন্দেহ আছে। তাদেরকে আগে জানাতে া। তাদের সমর্থন নিয়ে বিয়েটা হতে পারবে। আমি ব্যবস্থা করছি।'
'দেরি করবে না। আমি আর অপেক্ষা সইতে পারছি না।'
'একটু ধৈর্য ধরতে হবে ভাইটি আমার।'
'খবর দিয়ে আজই বিকেলে তাদের ডেকে আনো আমার তেতলার ঘরে, ও থাকবে।'
'আমার মন খচ খচ করছে, অমন ঘরে তুমি আবার বিয়ে করবে?'
'ও নিয়ে তুমি ভেবো না, আল্লার ঘর সব সমান।'
'ঠিক আছে, তুমি ঘরে থেকো। আমি ওদের ডাকাচ্ছি।'
'আমি ঘরেই আছি বড়ভাই।'
'তাহলে রাখি?'
'আচ্ছা।'
'তোমাকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।'
'বল?'
'ছোট মাকে তোমাকে বোঝাতে হবে। আমি বলতে পারব না।'

'মাকে আমিই রাজি করাব।'

'ধুমধাম করে বিয়ে হবে কিন্তু।'

'সে তোমার যা ইচ্ছা।'

'রাখলাম।'

বড়ভাইয়ের সঙ্গে ফোনে বেশ আলাপ করা গেল, মনের সাধ জানানো গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী ভাবে বলবে, সে নিয়ে সঙ্কোচ ছিল। সহজে ব্যাপারটা মি যাওয়ায় মনে বড় প্রশান্তি আসে শফীর। বুক ভরে শ্বাস নেয়।

২

জিয়াদের গায়ে শার্ট ছিলই। কিন্তু পরনে ছিল লুঙ্গি। এই পরেই যাবে সে শাহনা কাছে। প্যান্ট পরার সময় নেই। দেরি করতে বারণ করেছে মালিক। দেরি হ গেলে আবার কী কাণ্ড করে ফেলবে মালিক, তার ঠিক নেই। তাছাড়া প্যান্ট তাকে পরতে হবে, এর কোনো কথা নেই। মেটিয়াবুরুজে প্যান্ট পরে কজ গরিব-রহিম সবাইই লুঙ্গি পরে। মহল্লায় মহল্লায় লুঙ্গি পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সবা বিয়ে বাড়িতে, বরযাত্রীতে, কুটুম্বিতে করতে হামেশা লোকে লুঙ্গি পরে। লুঙ্গি বড়লোক গরিবলোকের ভেদাভেদ নেই।

ম্যানেজারি করার সময় গামছাটা কোমরে ছিল জিয়াদের, এই যা। সেটা কাজে লাগাতে পারে। গহনা নিতে। না কি একটা ব্যাগ বের করে তাতে গহনা টা ভরে নিয়ে যাবে? তাহলে তাতে কিঞ্চিৎ দেরি হবে। এই বিলম্ব যদি কোনো বিপ ঘটায় সেজন্য অফিসঘরে গেল না জিয়াদ। মালিক বলেছে, এক্ষুণি দিয়ে আসা বলে দিয়েছে আধঘণ্টার মধ্যে যেন পৌঁছয়। হেঁটে গেলে পঁচিশ মিনিট লাগব কথা। এখুনিই তো মিনিট সাতেক চলে গেছে। আর অপেক্ষা করা চলে না। অফি ঘরে কর্মচারীদের কাজ বোঝানোর কথা ছিল, তা আর হল না।

বেরিয়ে পড়ল জিয়াদ। গামছাটা গলায় পেঁচিয়ে ঝুলিয়ে নিয়েছে। বুকের কা ঝুলছে টাকা আর গহনার পুঁটুলি। বড় রাস্তায় আসার পথে পাড়ার হানিফ চাচা দেখতে পায়। উল্টো দিক থেকে আসছে হানিফচাচা। সামনাসামনি এসে ' আগলে ধরে হানিফ চাচা। 'আহ্ হন্তদন্ত হয়ে চলে যাচ্ছ যে! দুটো কথা বল না?'

'না, আমার সময় নেই, ভয়ানক ব্যস্ত।'

হানিফ গলার গামছাটা ধরে ফেলে, 'গামছায় কী?'

'বলব না।' ডান হাত দিয়ে হানিফকে ঠেলা মারে জিয়াদ।

হানিফ ছিটকে যায়।

ফাঁক পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে জিয়াদ। বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। হানিফ চাচার পাল্ল পড়ে আরও দু-তিন মিনিট বরবাদ হয়েছে। হানিফ চাচা তার এই ব্যবহারে নিশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সেদিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই জিয়াদের। পরে না হয় ক্ষমা চে

নেবে। হানিফ চাচা নিশ্চয় অবাক হয়েছে। এমন ব্যবহার তো জিয়াদ কখনও হানিফ চাচার সঙ্গে করেনি। হানিফ চাচা আরও বাধা যদি দিত, যদি আরও বিলম্ব করে দিত, তাহলে ঘুষি চালাতে কসুর করত না সে। মালিকের কাজ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চায় সে। দুটো পাখা যদি থাকত তার, যদি উড়ে যেত, এর চেয়ে সুখ হত না। আকড়া রোডে তখন জ্যাম চলছে। সাইকেল, রিকশা, মোটর সাইকেল, লরি, অটো, ট্যাক্সি, প্রাইভেটকার, সব স্থির। জোর জ্যাম চলেছে। জিয়াদের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'হায় আল্লা!'

ভেবেছিল চলতি আটো ধরে একটু এগিয়ে লিচুতলার সর্টকাট রাস্তা ধরবে। ঘড়ির কাঁটা দ্রুত ছুটছে। জ্যাম পেরিয়ে হাঁটাও দুষ্কর।

একজন খদ্দের তার ডান হাতটা খপ করে ধরে ফেলে। 'কোথায় চললে জিয়াদ? মাল আনতে এসেছি।'

জিয়াদ বলল, 'আমি জিয়াদ নই, আপনাকে আমি চিনি না। আমার হাত ছেড়ে দিন।'

খদ্দের কিছুতেই হাত ছাড়ে না। 'মস্করা করছ?'

'একদম না'।

'তুমি তো জিয়াদ।'

'জিয়াদ তেরা বাপ!' বাঁ হাতে এক রদ্দা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে খানিকটা এগিয়ে যায় জিয়াদ। তার পেছু ফিরে দেখবার অবসর নেই। গাড়িঘোড়া কাটিয়ে কাটিয়ে চলেছে। গাড়িচাপা পড়লেও পড়তে পারে। তার সে হুঁশ নেই। কারো দিকে তাকাচ্ছে না, যাতে পরিচিত কেউ ডেকে ফেলে, কথা বলতে হয়।

একজন দোকানদার 'আসসালামো আলাইকুম' বলল, তার জবাব দিল না জিয়াদ। গুনাহ্‌র কাজ করল। সে এখন সব করতে পারে, মারপিট, খুন জখম সব। তাকে পৌছতে হবে যথাসময়ে শাহনাজের কাছে। আর এই টাকা গহনা দিয়ে তার সব কাজ শেষ। তারপর সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলবে।

এরপর পেয়েছে সর্টকাট রাস্তা। খালের পাশ দিয়ে রাস্তা। একদিকে বস্তি। সরু রাস্তা। লোকজন আর দু-চারটে সাইকেল চলাচল করছে। মনের আনন্দে ছুটতে লাগল জিয়াদ। অমনি পেছন থেকে একটা কুকুর ছুটে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। তার পথ আগলে ধরল।

জিয়াদের হাতে কোনো লাঠি নেই। হাতের কাছে ইট-পাটকেলও পড়ে নেই। গামছার পুঁটুলিটা কাজে লাগাতে চাইল জিয়াদ শেষমেষ। টাকা আর গহনার পুটুলি দিয়ে কুকুরটার পেটে একটা ঘা দেওয়া মাত্র কুকুরটা ক্যাঁও ক্যাঁও করতে করতে বস্তির মধ্যে ঢুকে গেল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে আবার ছুটতে লাগল জিয়াদ। আর পাক্কা আধঘণ্টার মধ্যেই শাহনাজের ঘরের দরজায় পৌছে যায় জিয়াদ।

ঘরের চিলতে বারান্দায় বসে নূরজাহানবানু শাহ্‌নাজ আর শাবানা তিনজনে তুরপাইয়ে কাজ করছিল। তাদের চারপাশে বাবাসুটের স্তূপ।

দরজার কাছে আছড়ে পড়ে জিয়াদ। আর শাহ্‌নাজের কোলের ওপর গামছার পুঁটুলিটা ছুঁড়ে ফেলে। দম ফেলতে ফেলতে বলে, 'এটা আপনার হকের পাওনা, মালিক দিয়েছে। দেন মোহরের পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। আর গহ্‌নাও আছে। আমাকে একটু পানি দিন। মালিক বলেছিল আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছতে, মালিকের কথা মতো কাজ করতে গিয়ে হাঁফিয়ে গেছি। বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

নূরজাহান বানু চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওলো পোনি দেনা লো শাবানা।'

শাবানা বলল, 'নানি, তোমার হাতের কাছেই বদনা আছে।'

'ওলো বদনাতে কেন পানি দিবি, গেলাস বের কর।'

জিয়াদ বলল, 'বদনাই দাও, তর সইতে পারছি না।'

নূরজাহান বানু বদনা বাড়িয়ে দেয়।

বদনার গলা ধরে ঢক ঢক করে জল খায় জিয়াদ।

শাহ্‌নাজ কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তার কোলে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর গহ্‌না। কেমন যেন স্বপ্ন মনে হয়। স্থির হয়ে গেছে। নড়তে চড়তে পারে না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে চালার বাতার দিকে। তার সামনে কী ঘটে চলেছে, কোনো খেয়াল নেই।

জল খেয়ে শান্ত হয় জিয়াদ। লুঙ্গিতে মুখ মোছে। 'আমি চললুম।'

নূরজাহান বলল, 'নাস্তা করে যা বাপ!'

'না।'

'একটু চা খেয়ে যা।'

তাড়াতাড়ি আসার জন্য আসার পথে কতজনকে যে ধাক্কা মেরে এসেছে, কটু কথা বলে এসেছে, ফেরার পথে তাদের আবার সামলাতে হবে। সেজন্য বিলম্ব করা চলে না।

ধাঁ করে চলে গেল জিয়াদ।

শাবানা বলল, 'ওমা, তোমাকে সত্যি লোকটা পঞ্চাশ হাজার টাকা আর গহ্‌না দিয়েছে?'

শাহ্‌নাজের শূন্যদৃষ্টি, স্থির, নড়ে না চড়ে না।

নূরজাহান তাকে নাড়ায়, 'চুপ আছিস যে? তোর কোলেই তো রেখে গেল টাকা গহ্‌নার পুঁটুলি।' আবার নাড়ায় নূরজাহান। শাবানাও মাকে নাড়ায়।

এবার সম্বিৎ ফিরে পায় শাহ্‌নাজ। 'ড্যামনাটা ম্যানেজারকে পাঠিয়েছিল, সাপ ব্যাঙ কি পুঁটুলি করে কোলের মধ্যে ফেলে গেল কে জানে!'

শাবানা বলল, 'খুলে দ্যাখো না, টাকা গহ্‌না তো হতে পারে।'

'যে লোকটা ধরে বেঁধে বিয়ে করে তারপর দুদিন পরে তালাক দেয়, তার পাঠানো টাকা গহ্‌না, টাকা গহ্‌না কিনা সন্দেহ হয়। হয়তো এক তাড়া বাজে কাগজ

পাঠিয়ে দিয়েছে। পাগল কি না। পুঁটলির মধ্যে টাকা গহনা আছে কি না, খুলে না দেখা পর্যন্ত আগে কখনও বিশ্বাস করতে পারি না আমি।'

নূরজাহান বলল, 'তাহলে খুলে দেখ।'

'খুলে দেখতে ভয় করছে। লোকটা বোধহয় অপমান করল আবার।'

শাবানা বলল, 'সত্যিও তো হতে পারে।'

'একমাত্র আল্লা জানে, গামছার মধ্যে কী আছে।'

শাবানা বলল, 'তাহলে খুলে দেখ।'

'একটু পরে।'

'না না এখুনি।'

তিনজন গোল হয়ে বসে। তাদের পাশে ছড়ানো বাবাসুট।

শাহনাজ কোলের পুঁটুলিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখে প্রথমে। কি আন্দাজ করে, বলে, 'মনে হচ্ছে কিছু একটা আছে।'

নূরজাহান, 'চোখের সামনে রেখে খোল না। হয়তো তোর ভাগ্য খুলে যেতে পারে। বোনঝি আমার দুঃখী মানুষ, কত দুঃখ সহেছে৷'

গামছার পুঁটুলিটা কোল থেকে বের করে এবার মেঝেয় নামায় শাহনাজ। তারপর গিঁট খুলতে থাকে। উঁকি দেয় টাকা আর গহনা। সম্পূর্ণ খোলা হয়ে যেতে সম্পূর্ণ টাকা আর গহনা বেরিয়ে আসে।

নূরজাহান, 'ও লো এ তো দেখছি সত্যিকারের টাকা, সত্যিকারের গহনা। বোনঝি তোর ভাগ্য বলিহারি!'

শাবানা বলল, 'মাগো, এও সত্যি হয়!'

শাহনাজ এই প্রথম হাসল। অনেক দিন পরে হাসল।

নূরজাহান বলল, 'লোকটাকে পাগল বলিস, দাতা, দাতা, সাচ্চা আদমি।'

শাহনাজ বলল, 'তবু লোকটাকে আমি পাগল মনে করি।'

শাবানা বলল, 'তোমার ভাগ্য ফিরে গেল গো মা!'

'এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, মনে হচ্ছে স্বপ্ন।' চোখ দুটো বুঁজে আসে শাহনাজের।

মাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে আদর করে শাবানা।

নূরজাহান বলল, 'একটু চা পর্যন্ত করে দিলি না ম্যানেজারটাকে। বদনা ধরে পানি খেয়ে গেল। এত সব টাকা গহনা এনেছিল, একটু নাস্তা দেওয়া হল না।'

শাবানা বলল, 'এত সব টাকা নিয়ে কী করবে মা?'

'কিছু একটা করব।'

'তবে যে লোকটাকে তুমি দোষ দাও?'

'দিই তো, এখনো দিই।'

'কেন?'

'সে আমাকে হঠাৎ বিয়ে করে, হঠাৎ তালাক দেয়, কেন আমাকে তালাক দেয়

আজও আমি জানতে পারিনি।'

'আমারও জানার খুব ইচ্ছা।' শাবানা বলল।

নূরজাহান বলল, 'বড়লোকের মেজাজ, দেখলি তো এত টাকা গহনা গুনাগা দিল। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলি গো বোনঝি। একটু আগে কি জানতিস এত টাকা গহনা পাবি?'

শাহনাজ বলল, 'না'।

শাবানা বলল, 'তোমার হকের পাওনা মা। তোমাকে বিয়ে করেছিল। তা দেনমোহন দিল।'

নূরজাহান বলল, 'বিয়েতে বসতে চাইছিলি না, কাঁদছিলি, তোর লাভই হ বোনঝি। ব্যবসাতেও এমন লাভ হয় না।'

শাহনাজ বলল, 'আমার লাভ হয়েছে জেনে বলছি, তবু লোকটা আমার কা পাগল।'

নূরজাহান বলল, 'এখন ওসব বলিস না, তোর সঙ্গে মানুষটার আর কি সা সম্বন্ধ? তোকে ধরতেও আসবে না কাড়তে আসবে না। তুই যেমন ছিলি তেম হয়ে গেলি। মাঝে দুটো দিন লোকটার বউ সেজে এত লাভ করলি।'

'পাগলকে পাগল বলব না, বেশ করব বলব।'

'তোর এখনো রাগ আছে বোনঝি?'

'আমার মানুষটার ওপর ভীষণ রাগ আছে।'

'তুই তো তারই টাকা পেয়েছিস।'

'এ আমার হকের পাওনা, আমাকে মাগনা দিয়েছে?'

'আমি চাই, লোকটার ওপর একটু রহম হ।'

'আমি তা হতে পারব না, আমাকে অনুরোধ কোর না।'

'তুই এখন বড়লোক হয়ে গেলি বোনঝি।'

শাহনাজ হাসে। 'সত্যি এত টাকা জীবনে দেখিনি।'

শাবানা বলল, 'মায়ের দুঃখের জীবন ছিল, সুখ এল।'

হঠাৎ শাহনাজের মৃত স্বামীর কথা মনে এল। বিনা চিকিৎসায় মারা যা এত টাকা থাকলে কি মরত লোকটা? ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

৩

বিকেলে শফীর তেতলার ঘরে মেহমানরা এল। হানিফ চাচা, কাদের মওদুদি, অ কাউন্সিলার মোতলবে। শওকতও এল। শওকত তাদের ডেকেছে। শফী ছিল ঘরে তাদের খিদমতে লেগে পড়ে জিয়াদ। প্রথমে সরবৎ দেয়। তারপর বিছান দস্তরখান পেতে পরোটা গোস্তর সুরুয়া, মিষ্টি পোলাও ফিরনি, এলাহি খাওয় দাওয়া। মেহমানরা বুঝতে পারল না এত খাওয়া দাওয়ার ঘটা কেন।

খাওয়া দাওয়ার পর পান এল, পান মশালা এল। জিয়াদ এসব তদারকি কর অন্তঃপুর থেকে খাবার দাবার এনে দিয়েছে কাজের মেয়ে ফারজানা। এ

লোকজনদের ফোন করে লোক পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করেছে শওকতউল্লা। সকাল থেকেই অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে। সবাইকে জড়ো করা গেছে। সকলে আসরের নামাজ পড়ে চলে এসেছে। মগরেবের নামাজ পড়ার আগে ব্যাপারটাকে চুকিয়ে বুকিয়ে ফেলাতে হবে। সবাই কাজের মানুষ। সকলের ব্যস্ততা কম নয়। শওকতউল্লা তাদের ডেকেছে, তারা না এসে পারে না। মেটিয়াবুরুজের সবচেয়ে ধনী লোকটার ডাক পেয়ে না এসে উপায় নেই।

দাদার উদ্যোগ দেখে বড় প্রীত হয় শফী। তাহলে শাবানাকে জীবনে পাওয়া সত্যি হতে চলেছে। সকলের সঙ্গে সালাম বিনিময় করেছে, হাত ধরে মোসাফা করেছে। বড়দার উৎসাহ দেখে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। দাদা তাকে সত্যিকারের ভালবাসে।

খাওয়া দাওয়ার পর কেউ কেউ বিছানায় বসেছে, কেউ কেউ চেয়ারে। সবাই জানতে পেরেছে, কিছু একটা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে। কেউই আগে থেকে জানতে পারছে না।

হানিফ চাচা বলল, 'কী হবে, কথাটা শুরু করে দিক শওকতউল্লা। আমার আবার ভীষণ কাজ আছে।'

শওকতউল্লা বলল, 'কাজ কার নেই। কাজ ফেলে না হয় গরিবখানায় একটু বসলেন।'

কাদের মওদুদি উশখুশ করে। গোরস্থানের দায়িত্বে আছে সে। মাইয়েত আসার কথা। আর দেরি করা চলে না। শওকতউল্লা ডেকেছে, না এসে পারেনি। তাড়াতাড়ি কথা মিটে গেলে স্বস্তি। কথা পাড়ছে না কেন?

কাউন্সিলার মোতলেব হাজার কাজে জড়িয়ে থাকে। তার এমনভাবে বসে থাকা চলে না। সে বলল, 'নিন, তাড়াতাড়ি শুরু করুন।'

শওকত হাত কচলাতে শুরু করল।

হানিফ চাচা বলল, 'আপনাদের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় কি?'

শওকত বলল, 'না'।

'তবে কি?'

'ভাইটির বিয়ে দেব ঠিক করেছি।'

কাদের মওদুদি বলল, 'ইনশা আল্লা, সে তো ভাল কথা। তার জন্য এত গড়িমসি করছেন কেন? বিয়ে একটা জায়েজ কাজ।'

শওকতউল্লা বলল, 'ভাইটি আমার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।'

মোতলেব বলল, 'সে তো ভাল কথা। আটকাচ্ছে কোথায়?'

শওকত বলল, 'না আটকাচ্ছে না। ধুমধাম করেই বিয়ে হবে।'

হানিফ চাচা বলল, 'কিছুদিন আগে তো একটা বিয়ে করেছিল শফী।'

'হ্যাঁ, তাকে তালাক দিয়েছে। তাহলে কি আর বিয়ে করতে পারে না?'

কাদের মৌলবি বলল, 'আলবাৎ পারে। আরো চারটে বিয়ে করতে পারে।'

শফী বলল, 'তার দেন মোহরের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।'

কাদের মৌলবি বলল, 'ভাল কথা।'

শওকত বলল, 'তারই মেয়েকে বিয়ে করতে চায় শফী।'

'তওবা তওবা।' ফস করে বলে উঠল কাদের মৌলবি।

শফীর মনে হল ঝাঁপিয়ে পড়ে কাদের মৌলবির টুঁটি টিপে ধরে। খামোশ খায়। ক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠল, 'নাদান বান্দা, তওবা তওবা করছিস, ধর্মের তুই কি জানিস, এক্ষেত্রে মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ। মৌলবি নামেই হয়েছিস, কিছুই জানিস না।'

মৌলবি ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকল।

হানিফ চাচা বলল, 'থামো, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তুমি যে মাকে কয়েকদিন আগে বিয়ে করেছিলে, তাকে তালাক দিয়েছ, আবার তার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও, এই কথা তো?'

শফী বলল, 'হ্যাঁ'।

হানিফ চাচা বলল, 'আর এই বিয়ে ধর্মসিদ্ধ, এই কথা তুমি বলতে চাইছ না? কিগো শফী?'

'হ্যাঁ'।

'আমি তো জানতাম, মাকে বিয়ে করার পর মেয়েকে বিয়ে করা চলে না।'

শফী বলল, 'ভুল জানা আপনাদের।'

কাউন্সিলর মোতলেব বলল, 'আমিও তাই জানি।'

'আপনিও ভুল জানেন। এক্ষেত্রে বিয়ে হওয়া হারাম নয়।'

'আপনাদের ভুল ভাঙাবার জন্যই দাদা আপনাদের ডেকেছে। ধর্মের মশায়ালা শুনুন, কিতাবে লিখেছে, মুখস্থ বলছি, শুনুন মৌলবিসাহেব, শুনুন কাউন্সিলর, শুনুন হানিফ চাচা, "বাপ মরিয়া যাওয়ার পর মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে, তবে মায়ের সেই স্বামীর সহিত মেয়ের বিবাহ হারাম।"

কাদের মৌলবি বলল, 'এই তো হারাম লিখেছে, তবে যে আপনি বিয়ে করতে চান?'

'খামোশ মৌলবিসাহেব, সবটা না শুনে ফুট কাটছেন কেন? শুনুন, তারপর কী বলেছে, "কিন্তু সেই স্বামীর সহিত সহবাস করিবার পূর্বেই যদি মা মরিয়া যায় বা তালাক প্রাপ্ত হয়, তবে মায়ের সেই স্বামীর সহিত মেয়ের বিবাহ হারাম নহে।" এ কথা স্পষ্ট বলা আছে। নিজেকে তো পণ্ডিত মনে করেন মৌলবিসাহেব। কিন্তু শাস্ত্র জানেন না।'

কাউন্সিলর মোতলেব বলল, 'কেতাবে যদি এ কথা লেখা থাকে তাহলে তো শফী মিঞা এ মেয়েকে বিয়ে করতে পারে।'

হানিফ চাচা বলল, 'না, কোনো বাধা নেই।'

কাদের মৌলবি বলল, 'ভুল জেনেছিলাম শফী, মাফ করে দিন আমাকে।'

হানিফ চাচা বলল, 'সহবাসের আগেই তারে তালাক দিয়েছিলে? শুনেছি তো, একরাত তোমার ঘরে ছিল?'

শফী বলল, 'আমি বাইরে ছিলাম। বাড়িতে ফিরে তেতলার ঘরে উঠিনি। বিবি একা ছিল। আমি কর্মচারীদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাই। কর্মচারীরাই সাক্ষী দেবে। তারপর ভোরবেলা বিবিকে তালাক দিই। আমার সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। ওই দিন আমি স্পর্শ পর্যন্ত করিনি বিবিকে। তাই এক্ষেত্রে তার মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ। আপনারা কতটা জানেন তার পরীক্ষা হয়ে গেল। আপনাদের ভুল শুধরে দেওয়ার জন্যেই এই বৈঠক।'

শওকতউল্লা বলল, 'আপনাদের আপত্তি আছে এই বিয়েতে?'

প্রথমে কাদের মৌলবি বলল, 'না, না, আপত্তি হবে কেন, এই বিয়ে তো জায়েজ।'

হানিফ চাচা আর কাউন্সিলার মোতলেব আলি মাথা কাত করে সায় দিল।

হানিফ চাচা মাথা চুলকোতে লাগল।

কাউন্সিলার বলল, 'তুমি কিছু বলতে চাও যেন হানিফ চাচা?'

কাদের মৌলবি বলল, 'আরে বলেই ফেল না।'

হানিফ চাচা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'তা বাপ শফীউল্লা, কদিন আগে মাকে বিয়ে করেছিলে, তারপর তার মেয়েকেই বিয়ে করতে চাও কেন? অন্য কোনো মেয়ে হলে কি তোমার সাধ মিটত না। আমার কাছে ব্যাপারটা খোলসা হচ্ছে না।'

শফী ক্ষিপ্ত হল এই প্রশ্নে। বলল, 'ওর মেয়েকে কেন বিয়ে করতে চাই, আমি আপনাদের বলব না। আমার ইচ্ছে, আমি বিয়ে করব।'

হানিফ চাচা আবার মাথা চুলকোয়। 'সে তুমি পার, কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

কাদের মৌলবি বলল, 'কথা তো মিটে গেছে, আবার কেন কথা বাড়াচ্ছ হানিফ চাচা? আমাকে জলদি যেতে হবে গোরস্থানে। কাফন দাফন করে মগরেবের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যাবে। আমার আর দেরি করা চলবে না। কথা শেষ, এবার আমাদের যাওয়ার পালা।'

'মেয়ের ঘরে প্রস্তাব গেছে?' হানিফ চাচার কৌতূহলের শেষ নেই।

শওকত বলল, 'যাবে। ঘটা করে বিয়ে হবে। এই বিয়েটাই শফীর আসল বিয়ে।'

শফী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল দাদার ওপর, 'আগের বিয়েটা কি তাহলে নকল ছিল? রীতিমত কলমা পড়ে এযিন নিয়ে বিয়ে হয়েছিল।'

কাউন্সিলার মোতলেব আলি বলল, 'আহ্ আগের বিয়ের প্রসঙ্গটা থাক না শফী ভাই।'

'থাকবে কেন, দেন মোহর পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ভালই করেছ এখন তোমার নতুন করে বিয়ে হচ্ছে যেন, মনে করো।'

শফী গোঁ ধরে, 'আগের বিয়েটাও বিয়ে, এটা যে বিয়ে হবে, এটাও বিয়ে। আমার কাছ থেকে কোনো অসততা পাবে না।'

শওকতউল্লা প্রত্যেককে একটা শাড়ি উপহার দেয়। আগে থেকে কিনে রেখেছিল। শাড়ি পেয়ে প্রত্যেকেই খুশি।

৪

মগরেবের নামাজের পর থেকে কথাটা সারা মেটিয়াবুরুজে চাউড় হয়ে যায়, শফী শাহনাজকে বিয়ে করার পর, তার মেয়ে শাবানাকে বিয়ে করছে। প্রথমে হানিফ চাচা প্রচার করে। তারপর এর মুখ থেকে ওর মুখে সারা মহল্লায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

শওকতউল্লা এই প্রচার চাইছিল। কেন না মহল্লা জানলে শাহনাজের বাড়িতে জানবে, যাতে করে এই বিয়ের প্রস্তুতি নেবে মেয়েপক্ষ—মানসিক এক প্রস্তুতি তৈরি হবে। এই বিয়ে যে হারাম নয়, এটাও প্রচার হয়ে যাবে। মহল্লার মানস প্রস্তুতিও তাতে তৈরি হবে। সেজন্য এই বৈঠকে হানিফ চাচাকে ডেকেছিল। হানিফ চাচা প্রচার করতে ওস্তাদ।

কিন্তু এই প্রচারে শফী ক্ষিপ্ত হল। তেতলার ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁশছিল। নীচে নেমে অফিসঘর থেকে দাদাকে ফোন করে।

'ভাইজান!'

'হ্যাঁ বল শফী।'

'একি শুনছি, সারা মহল্লা জেনে গেল?'

'জানুক না।'

'আমি কিন্তু হানিফ চাচাকে ছাড়ব না, পেটাব।'

'ভাইটি আমার একদম মাথা গরম করিস না। এই প্রচারের প্রয়োজন ছিল মহল্লার কাছে খবর পৌঁছচ্ছে তুই তাকে বিয়ে করতে চাস। সবাইকে প্রস্তুত কর দরকার। আমাদের বাড়ির মেয়েরাও এতক্ষণে জেনে গেছে। লক্ষ্মীটি ভাইটি আমার, ছোটমাকে তোকে বোঝাতে হবে, বলতে হবে তুই ধর্মবিরুদ্ধ কোনো কাজ করছিস না। না হলে আমাকে তলব করবে। আমি ছোটমায়ের সামনে দাঁড়াব না। তুই ওয়াদা করেছিস, ছোটমাকে বোঝাবি। সঙ্গে করে কিতাবটাও নিয়ে যেতে পারিস।'

'মাকে সাফ সাফ বলে দেব এ বিয়ে আমি করছি। এতে কোনো পাপ নেই। অতসব কিতাব ফিতাব দেখাবার কি আছে?'

'বেশ তুই মাকে সামলা, আমি অন্য দিকটা সামলাই।'

'বেশ, আজ রাতেই মাকে বলছি।'

'রাতে ঘুম টুম হয় তো?'

'ঘুম কমে গেছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, আর ঘুম আসতে চায় না।'

'চিন্তা করিস?'

'হ্যাঁ।'

'চিন্তাটা আমার ওপর ছেড়ে দে।' ফোনটা রেখে দেয় শওকতউল্লা। পেছনে
র দেখতে পায়, বাড়ির কাজের মেয়ে ফারজানা দাঁড়িয়ে আছে। ফারজানাকে
খ ফারজানাকে কিছু বলতে না দিয়ে শওকত বলল, 'ছোটমা বুঝি আমাকে
ছে?'

'হ্যাঁ, ছোট মা আপনাকে ডাকতে বলল।'

'বলে দিস আমি যেতে পারব না। শফীভাই আমার হয়ে একটু পরে গিয়ে
। বলবে।'

ফারজানা অন্তঃপুরে ফিরে যায়।

এদিকে অন্তঃপুরে চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শওকতউল্লার সৎ মা, বিবি, পুত্রবধূ ও মেয়ে সকলের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা।

শওকতউল্লার সৎ মা ও শফীউল্লার নিজের মা নিগার বানু সব সময় তওবা বা করে উঠছে। শফী যাকে বিয়ে করেছিল, তার মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছে? া তা নিয়ে কাউন্সিলার মৌলবি হানিফ চাচা বৈঠক করেছে? আর তাদের ক শওকতউল্লা বৈঠক বসিয়েছিল? শওকতের সব দোষ। তলব পাঠাও কতকে, ডেকে আনো শওকতকে।

শওকতের বড় পুত্রবধূ সাকিলার বার দুই বমি হল কথাটা শোনার পর। তার । শ্বশুর এমন বিয়ে করবে, শুনে তাজ্জব বনে গেছে।

শওকতের মেজ পুত্রবধূ শবনব পরভিন বিশ্বাস করল, লোকটা সব পারে। নাজকে তালাক দেওয়ার পর থেকে লোকটার প্রতি আস্থা হারিয়েছে, শ্রদ্ধা য়েছে। কেন তাকে তালাক দিয়েছে, এই প্রশ্ন করেছিল পরভিন। তাতে তাকে মান করে শফী। আর তালাক দেওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে এ বাড়ির গৃহশিক্ষক সর এ বাড়ির সংস্পর্শ ত্যাগ করে। পরভিনের পূর্বপ্রেমিক নাসেরকে হারায় নম শফীর জন্য। নাসেরের সঙ্গেই পরভিনের বিয়ে হত। কিন্তু এক দুর্ঘটনাজনিত ণে এ বাড়িতে বউ হতে হয়। অল্প শিক্ষিত তার স্বামী। প্রচুর টাকাকড়ি আছে। নে যে পরভিন ভাল নেই, এ কথা নাসেরকে জানালে হয়তো নাসের এ বাড়ির শন বন্ধ করত না। সপ্তাহে তিন দিন নাসেরকে দেখা জুটত তার। নাসের ন না, সে ভাল নেই।

পরভিনের ভাল না থাকা বড়ই কষ্টকর। ভাবে, পালিয়ে গেলে যদি বাঁচা যেত? হওয়ার নয়। টাকা পয়সার অভাব নেই, যেখানেই থাক না কেন খুঁজে বের র আনবে। তাছাড়া যাবেই বা কোথায়? মরতে পারলে বরং শান্তি হত।

আবার শফীউল্লা এ বাড়িতে এক কাণ্ড ঘটাতে চলেছে। বাইরে থেকে খবর সছে, শফী বিয়ে করবে যাকে বিয়ে করেছিল তার মেয়েকে। এর মধ্যে তার রেরও ষড় আছে। আজই বিকেলে শফীর তেতলা ঘরে বৈঠকে বসেছিল, াকার কয়েকজন মাতব্বরদের নিয়ে। শফীর মা অর্থাৎ ছোট মা শুনে ছটফট ছে। বিছানায় শুয়ে আছে। পরভিনের শাশুড়ি গুম মেরে আছে। শফীরই বাড়ির ঃপুরে মেয়েদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

বাড়ির কাজের মেয়ে শওকতউল্লাকে ডাকতে গিয়েছিল। শওকতউল্লা আস না, শফী এসে কৈফিয়ৎ দেবে, জানাল। ছোট মাকে জানানো হয়েছে। সবাই উৎক হয়ে আছে শফীর আসার অপেক্ষায়। খেতে আসবে। কদিন হল খেতে আস

রাতের নামাজ পড়ে তার ঘরে উঠে যায় পরভিন। কদিন ধরেই ভাব নাসেরকে একটি চিঠি লেখার কথা। শফীর এই বিয়ে করার সংবাদ পেয়ে আ উতলা আর মরীয়া হয়ে উঠল শবনম। লিখতে চেয়েছে কিন্তু লিখতে পারে ি কি এক দ্বিধা এসে জড়িয়েছে তাকে। ভয় পেয়েছে, চিঠির কথা যদি এ বাড় কেউ জানতে পেরে যায়? ঝুঁকির কথা ভেবেই নিষ্ক্রিয় থেকেছিল। এখন কো থেকে যেন একটা সাহস পায়। চিঠিটা কীভাবে পাঠাবে, সেটা একটা বড় সমস তবু চিঠিটা তো আগে লেখা দরকার। পরে না হয় ভাবা যাবে কীভাবে পাঠা যাবে। এক আবেগ কোথা থেকে সে পায় যেন। এই চিঠি লেখা তার এক আ মনে হয়। চিঠির ভেতর এক মুক্তিও খুঁজে পেতে চায় সে। নাসেরকে চিঠি ল খুব জরুরি মনে করে সে। নাসের জানুক, সব জানুক। নাসের কষ্ট পাবে ব নাসেরের কাছে এতদিন গোপন করেছিল সে। নাসের কষ্ট পাক, জানুক। পরভিনে জন্য কষ্টা পাওয়া তার উচিত হবে।

তাছাড়া কাকে বলবে শবনম পরভিন? কার কাছে বলে মন হালকা করবে ভালবাসার সেই মানুষটার কাছে সব বলে হালকা হবে। নাসের কি চিঠির উ দেবে? কীভাবে দেবে? কিছুই জানে না পরভিন। সে জানে শুধু নাসেরকে ত দুঃখময় জীবনের কথা বলবে।

সবাই অপেক্ষা করে আছে এ বাড়িতে শফীর আগমনের জন্য। এই ফাঁ তার তেতলা ঘরে উঠে একা বসে চিঠি লেখার আদর্শ সময়। কেউ আসবে তাকে বিরক্ত করতে। শফীর পাগলামিতে মন দিলে কি তার চলে? পাগল একট বদ্ধ পাগল। কেউ কি এসে পড়তে পারে, তার তেতলার ঘরে? আসুক না। কী লিখছে, কারোর দেখার অত মাথাব্যথা নেই। শুধু শুধু ভয় পাচ্ছে পরভিন সে এ বাড়ির শিক্ষিত বউ, লেখাপড়া করতেই পারে।

একটা ডায়েরি আছে। ডায়েরিতে অসংখ্য শাদা পাতা। একটুও কালির আখ নেই। কলমও ছিল। ডায়েরিটা নিয়ে বসল সে বিছনায়। সে ভাবল, সে কি ভু করছে চিঠি লিখে? সে কি অবৈধ কিছু করছে? বরং মনে করে সৎ কাজ করছে শুধু একটাই দ্বিধা, নাসের তার এই দুঃসময় জীবনের কথা জেনে দুঃখ পা কষ্ট দেওয়া হবে তাকে। মন আজ আবেগতাড়িত হয়েছে, আজ না লিখ কোনোদিন আর লিখতে পারবে না। এই আবেগকে কাজে লাগানো উচিত হ তার। কার কাছেই বা তার এই কষ্টের কথা জানাবে?

লিখতে যাবে অমনি বারন্দায় কীসের ছায়া নড়ল।

অনুচ্চ স্বরে বলে ওঠে পরভিন, ‘কে?’

'আমি।' ঘরের সামনের দরজায় দাঁড়ায় নাফিসা। তার ছোট ননদ। একেই ড়াত নাসের। নাসেরের পড়ানো ভালও লাগে নাফিসার।

এই মুহূর্তে নাফিসাকে দেখে চট করে মাথায় একটা মতলব খেলে যায় রভিনের। নাফিসাকে কাছে ডাকে সে। 'আয়, এখানে আয়।'

নাফিসা খুব ভাল মেয়ে। পড়াশোনায় খুব মন। ধীর, শান্ত মেয়ে। পরভিনের ব অনুগতও। বিছানায় এসে বসে। সে জানে, কেন এ বাড়িতে নাসের পড়াতে াসে না। নাসের খুব ভাল পড়াতও। নাফিসা ওই মাস্টারের কাছেই পড়তে চায়।

'তোকে যদি আবার পড়াবার জন্য নাসের মাস্টারকে একটি চিঠি লিখে দিই, ই তার স্কুলে তার হাতে লুকিয়ে দিয়ে আসতে পারবি?'

'হ্যাঁ পারব। তুমি চিঠি লিখে দেবে ভাবি?'

'ভাবছি, লিখে দিলে আবার যদি পড়ায়।'

'খুব ভাল হয়। আমাদের স্কুল আর মাস্টারের স্কুল তো কাছাকাছি। আমি ফিনে চলে যাব।'

'কিন্তু দেখিস কেউ জানতে না পারে। আমাদের বাড়ির কাউকেই জানাবি না।'

'না না।'

'সত্যি বলছিস?'

'হ্যাঁ।'

'চিঠিটা যে অবস্থায় দেব সেই অবস্থায় দিবি।'

'ঠিক আছে।'

'কারো চিঠি খুলে পড়তে নেই জানিস তো?'

'আমি জানি।'

'যদি চিঠি লিখে দিলে আবার তোকে পড়ায়, দেখি। তুই এখন যা, আমি এখন ন দিয়ে লিখি।'

নাফিসা চলে যায়।

নাসেরকে চিঠি পাঠানোর উপায় হাতের কাছেই ছিল, কিন্তু আগে মনে পড়েনি। রভিনের বিশ্বাস, নাফিসা ভাল মেয়ে, তাকে দিয়ে এ কাজ হবে।

লিখতে বসে পরভিন।

প্রিয় নাসের,

তোমাকে চিঠি না লিখে উপায় ছিল না। তুমি ছাড়া আর কাকে আমার মনের থা জানাব? তুমি এ বাড়িতে আসতে, সে যে আমার কষ্টকর জীবনে কত পাওয়া, ক মাত্র আমিই জানি। তুমি হয়তো ভেবেছ, বড়লোকের বউ হয়ে ঐশ্বর্যের মধ্যে বিন কাটাচ্ছি। মিথ্যে, তাহা মিথ্যে। তোমাকে দেখতে পেতাম, এই আনন্দে, দুঃসহ বনের ভার খানিকটা লাঘব হত। সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে আমাকে। থচ আমার দুঃসহ জীবনে তোমাকে দেখতে পাওয়া বাঁচার একমাত্র অবলম্বন য়ে উঠেছিল। আর সব কিছু শূন্য ও মরুভূমি। আমার দুঃখময় জীবনের কথা

তোমাকে জানাতে চাইনি, কেন না তুমি দুঃখ পাবে বলে বলতে পারিনি। তু
আসবে না, প্রতিজ্ঞা করেছ, তাই বলতে হচ্ছে আমার জীবনের সত্যি কথাটা,
যা শুনে আবার এ বাড়িতে এলেও আসতে পার, কেন না, তোমার খুব দ
আর নিশ্চিত করে আমার ওপর দয়াটা সব চেয়ে বেশি। তুমি কি এই ভি
আমাকে দেবে না? নাসিফাকে আবার পড়াতে আসবে আগের মতো? তোমা
নিয়মিত দেখতে পাব, এ আমার কম সুখ নয়। তুমি দয়াশীল, নিশ্চয় আ
ওপর দয়া করবে।

গোপনে এই চিঠি তোমাকে লিখছি, অনেক সাহস সঞ্চয় করে লিখছি। নিশ্চ
এই চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। তুমি আবার এসো। আমার মন ভাল থাকুক।

—ইতি

নিজের নামটা আর লেখে না পরভিন। ভয়, চিঠিটা কারো হাতে পড়ার ভ
তাহলেও, এই চিঠিটা যে সে লিখেছে, তার হাতের লেখা সাক্ষী। সাক্ষী নাফি
একটা ঝুঁকি নিশ্চয় নিচ্ছে। নিশ্চয় তা ভয়ংকর এক ঝুঁকি। চিঠিটা এদের কা
হাতে পড়লে, জ্যান্ত কেটে ফেলবে। পরভিন সরল মনে নাফিসাকে বিশ্বাস ক
নাফিসা কাউকে বলবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তাছাড়া নাফিসা
অনুগত। নাফিসা যদি কৌতূহলবশত চিঠি খুলে দেখে? বন্ধ খাম দেবে, নি
খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়বার মতো সাহস নাফিসার হবে না। চিঠি লেখার পর
যায় না পরভিনের। তবু সাহস তার কম নেই। যেন মরীয়া এক সাহস তার ম
ভর করেছে। নিজের সাহসের কথা ভেবে নিজেই হাসে সে। এক অর্থে তো
একটা প্রেমপত্র লিখল পরভিন। নাসেরকে ভালবাসা তার হারিয়ে যেতে
চিঠি লেখার পর মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে পরভিনের।

৫

চিঠিটা খামে ভরে মুখ বন্ধ করে চিঠিটা লুকিয়ে রেখে প্রসন্ন মনে ঘর থে
বেরিয়ে এসেছিল পরভিন। বারান্দার গ্রিলে এসে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।
একটা ভার লাঘব হল। মনের মধ্যে এক তরতাজা উপলব্ধি—মুক্তির শ্বাস ফেল
এতে তার কোনো পাপ হয় না, পাপ হতে নেই। বরং সে জীবন খুঁজছে।
বাঁচায় জীবন নেই, সেই বাঁচা বেঁচে কি লাভ?

খানিকক্ষণ বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখে নীচের সবাই বে
চুপচাপ, চাপা উত্তেজনায় কাটাচ্ছে। ভুলেই গিয়েছিল, শফী আসবে। চিঠি লিখ
যাওয়ার সময় এসব ভুলে গিয়েছিল পরভিন।

ছোট মা সেই সন্ধ্যে থেকে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, বিছানায় শুয়েই আ
ফারজানাকে দিয়ে একবার শওকতের কাছে খবর পাঠিয়েছিল, ডেকেছিল। শও
জানিয়েছে, শফী দেখা করবে।

নিগার বানু ভেবে পায় না, শফী এতখানি অমানবিক হয়ে উঠল কি কা

৲ করে নিজে বিয়ে করল, তারপর তাকে তালাক দিল। তারপর যাকে বিয়ে ।ছিল, তার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে। এই সব কাণ্ড কারখানা নিশ্চিত ı অসামাজিকতার লক্ষণ। কেউ কেউ ভেবে নিতে পারে অব্যবস্থিতচিত্তের ণ।

এই ছেলের মা সে? ভাবতেই কেমন শিউরে ওঠে, নিগার বানু। কিছুদিন আগে ন্ত শফীর পাণ্ডিত্যে জননী হিসাবে গর্ববোধ করতো নিগার বানু। মাকে বিয়ে ı তালাক দেওয়ার পর মেয়েকে বিয়ে করার সাধ করেছে, এই সংবাদ জানার শফীর প্রতি সমস্ত বিশ্বাস হারিয়েছে নিগার বানু। এ বাড়ির এত নাম ডাক, ম্রা এক ডাকে চেনে, সেখানে শফীর কাজকর্ম নিন্দনীয় হয়ে উঠলে মান ইজ্জত ধুলোয় ধূসরিত হয়।

শাহনাজের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য শফী ও শওকত মৌলবি কাউন্সিলর রা কারো কারোকে নিয়ে যেন আজ বিকেলে বৈঠক করেছিল। তার মানে ীর সঙ্গে সহযোগিতা করছে শওকতউল্লা। লোকে বলাবলি করছে, এ ক্ষেত্রে ক মাকে বিয়ে করার পরও মেয়েকে বিয়ে করা ধর্মসম্মত। চুলোয় যাক সে- বিধি-বিধান। মাকে বিয়ে করবার পর মেয়েকে বিয়ে করতেই হবে, এমন ার দিব্যি দিয়েছে কে তাকে? বিয়ে করতে চেয়েছে, কত মেয়ে আছে, বিয়ে তে পারে।

এখন মনে হয়, এত বছর পর্যন্ত বিয়ে করেনি, হঠাৎ পর পর শফীর বিয়ে তে চাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ ধরা পড়েছে। শফী কি পাগল হয়ে ছ? শফীর কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। এখনই শফী তার সঙ্গে দেখা করতে াবে, কথা বললেই ধরতে পারবে শফীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে কি না। তারপর ı ব্যবস্থা নেবে সে।

শওকত দেখা করতে চাইল না। শওকতের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছে তাই নিগার ।। শওকতের ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছে। অথচ এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শওকত । লোকজনদের ডেকে বৈঠক করেছে। সে যদি নিষ্ক্রিয় থাকত তা হলে অন্য া ছিল। সৎমা বলেই কি এমন ব্যবহার? ভেবে পায় না নিগার বানু। শওকতের াহেলায় মনে মনে বড়ই অপমানিত হয়েছে নিগার বানু।

বিকেলে শফীর তেতলার ঘরে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল। এখান থেকেই -সব খাবার-দাবার গিয়েছিল। লোকজনদের খাওন দাওন লেগেই থাকে। ভেবে ı আর পাঁচটি খাওয়া দাওয়ার মতো। মাথাওয়ালারা বসে বিধান খুঁজেছে। এটা যন্ত্র।

এর পেছনে ষড় আছে শওকতউল্লার। শাহনাজকে তালাক দেওয়ার খবর শুনে কে শওকত খুব খুশি হয়েছিল। আবার এই বিয়েতে উদ্যোগ নিচ্ছে। নিগার ্ আগে তাকেই তলব করেছে, অথচ আসেনি শওকত। এতেই বোঝা যায় কত অপরাধী। শফীর পাগলপনার প্রতি আস্থাই প্রকাশ করেনি, সশরীরে ইন্ধন াচ্ছে।

ভেবেছিল শওকতের কাছে ছুটে যায় নিগার বানু। যাওয়া উচিত ছিল ‹
কিন্তু হু হু করে প্রেসার বাড়ল। মাথা তুলতে পারছে না। শওকত নিজে ‹
আসতে চায়নি, অপমানিত হয়েছে নিগার বানু। তাই আর বার ডাকতে চা‹
শওকতের ওপর অভিমান করে শুয়েছিল। আর শফীর ওপর তার রাগ ‹
একটু বেড়ে উঠেছিল। বাধ্য হয়ে শফীর আসার অপেক্ষা করছে তাকে ‹
বানু।

বাড়ির লোকজন কেউ তার কাছে খুব একটা আসছে না। কাউকেই ডা‹
না সে। কাউকে চায়ও না। চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে নিগার।

মাঝে মাঝে বড় বউমা কিসমত ফারজানাকে পাঠাচ্ছে। ফারজানা এসে দাঁড়‹
কাছে।

ফারজানা এসে আবার দাঁড়িয়েছে। 'দাদি মা, আপনার কিছু লাগবে?'

'না কেউ কি এল?'

'না। দুই চাচার কেউ আসেনি।'

'ঠিক আছে, তুই যা।'

'আপনি কিছু খাবেন?'

'না।'

ফিরে যায় ফারজানা।

ছোট মার মাথার কাছে এসে বসে কিসমত। কপালে হাত দেয়। 'শরীরটা ‹
আছে তোমার ছোট মা?'

'আর শরীর ভাল থেকে কি হবে?'

কিসমত বলল, 'এখন খাবে ছোট মা?'

'না।'

'শফী কখন আসবে তার তো ঠিক নেই. তুমি অসুস্থ মানুষ খেয়ে নিতে পার‹

'কবরে গেলে শান্তি পাব, খেয়ে পাব না।'

'তুমি অসুস্থ মানুষ তুমি অত ভাববে কেন?'

'আমি যে মা, আমি যে তাকে পেটে ধরেছি।'

'সে তো আর ছোট নেই।'

'তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিও না বৌমা!'

'উঠে বসবে?'

'থাক; বেশ আছি।' কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে থেকে কিসমতের হাত নি‹
হাতের মধ্যে নেয় নিগার বানু। 'বড় বেটাকে ডেকেছিলাম, এল না। কেন‹
না। বলতে পার বৌমা? আমি কোনো দোষ করেছি?'

'কাজের মানুষ আসতে পারেনি।'

'আমি বুঝতে পারছি বড় বেটা আমার ওপর কোনো ব্যাপারে ‹
হয়েছে।'

তা হয়নি।'
তুমি বলছ?'
হ্যাঁ।'
াফী এসেছে। অন্তঃপুরে ব্যস্ততা। নিগার বানু কিসমতের হাত ধরে ছিল।
া ছেড়ে দেয়। তারপর চোখ বুঁজিয়ে ফেলে।
কসমত বেরিয়ে যায়। দালানে শফীর সঙ্গে কিসমতের মুখোমুখি।
াফী সুধোয়, 'ছোট মায়ের শরীর খারাপ নাকি?'
এই একটু খারাপ হয়েছে।' কিসমত খুব একটা শফীকে আমল দেয় না।
াফী নিগার বানুর ঘরে চলে যায়। কাছে গিয়ে হাত ধরে, 'মা, তোমার শরীর
প? কী হয়েছে? বড়ভাবি বলছিল তোমার শরীর ভাল নেই?'
আমার শরীরের খবর নিয়ে তোর কী দরকার?'
মা, তুমি আমার ওপর নারাজ হয়েছ?'
নারাজ হব না? তুই নাকি শাহনাজের মেয়েকে বিয়ে করতে চাস?'
বিয়ে করতে চাওয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই।'
ছি ছি ছি।'
ছি ছি করো না মা, তোমার গুনাহ্ হবে।'
তুই মাকে বিয়ে করলি, আবার মেয়েকে বিয়ে করবি?'
কোনো অন্যায় বে-শরিয়তি হবে না।'
না হোক, নিজের একটা রুচি বলে জিনিস আছে।'
আমাকে সে রূপে মুগ্ধ করেছে মা।'
এ তোর অন্যায় আবদার।'
না মা সত্যি। তাকে না পেলে জীবন আমার ব্যর্থ। আমার আমলনামা নষ্ট
আমার পরকাল বরবাদ হবে। আমি ওকেই বিয়ে করতে চাই।'
তাহলে তার মাকে বিয়ে করার আগে তাকেই বিয়ে করলি না কেন?'
তাকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। তাহলে তাকেই আগে বিয়ে করতাম,
মাকে নয়। বড়ভাই আমাকে সাথ দিয়েছে, মা তুমি নারাজ হয়ো না। না
আমি নষ্ট হয়ে যাব।' নিগার বানুর পা জড়িয়ে ধরে শফী।
আহ্ ছাড়।'
না, তুমি আমার ওপর নারাজ হচ্ছ। আগে বল, মেনে নেবে?'
মানতে মন চায় না। মনে হচ্ছে তুই যেন পাপ করছিস।'
কিতাবে স্পষ্ট লেখা আছে। এই বিয়ে ন্যায্য, ধর্মসম্মত। যারা এই বিয়ের
দ্ধাচরণ করবে, তারা পাপী অন্যায়কারী হবে। তখন তোমাকে আমি মা বলে
তে পারব না।'
'শফী!'
'মা আমি কোনো অন্যায় করছি না।' মায়ের পা ছেড়ে দেয় শফী।

শফীর হাত ধরে কাঁদতে থাকে নিগার বানু। সন্তানের প্রতি স্নেহ তাকে টা

'আমার ওপর আর রাগ করছ মা, তোমার রাগ আছে?'

'না। তুই যে আমার ছেলে।'

'মা!'

এই মা ডাকে বুক ভরে যায় নিগার বানুর।

৬

শফীউল্লার পাঠানো পঞ্চাশ হাজার টাকা আর গহনা পেয়ে শাহনাজ স্বপ্ন বি হয়ে কাটাচ্ছে। বাস্তবে কোনো মন নেই। শুধু জল্পনা-কল্পনা করছে, এ টাকা দি কী করবে? ভাবতে ভাবতে দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর ঘুমের ম স্বপ্ন। যেন তাকে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজকুমার নিয়ে চলেছে। বনজঙ্গল নদী নালা পা পর্বত পেরিয়ে চলেছে।

স্বপ্নটা অনেকক্ষণ ধরেই চলছিল। অনেকক্ষণ ধরেই শুয়ে ঘুমিয়েছিল শাহন হঠাৎ ঘুম এল। ঘুমোতে চায়নি। টাকা গহনা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করতে ক ভাবনাবিলাসে ঘুম এসে গিয়েছে।

শাবানা ঘরে এল। 'মা, তুমি এখনও ঘুমবে?'

ঘুম ভেঙে যায় শাহনাজের। শাহনাজ স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সে তাকায়, রাজকন্যার মতো তাকায়। তাকে ঘিরে আছে দাসদাসীরা। টাকা পয়সা সোনা কীসের অভাব? শাবানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে সেই আচ্ছন্নতায়।

শাবানা নাড়ায়, 'মা, ঘুম ভাঙাবে?'

'কে?'

'আমি মা। অবেলায় তুমি আর ঘুমিও না।'

দরজার বাইরে বারান্দায় বসে আছে নূরজাহান বানু। বোনঝি হঠাৎ করে আ টাকার মালিক হয়ে গেছে। তাকে এখন মান্য করে চলতে হবে। হঠাৎ করে ভ ফিরে গেল বোনঝির। অথচ প্রথমে এই বিয়েতে বোনঝি আপত্তি করেছি নূরজাহান বানুর তৎপরতায় নিমরাজি হয়। কদিন বিয়ে হল, তারপর তালা পেল, যেমন ছিল তেমনই থাকছে, মাঝখানে এতগুলো টাকা গহনা পেয়ে বোনঝি। একি কম ভাগ্য বোনঝির? বোনঝির ভাগ্যে খালারও ভাগ্য। শাহ তার মেয়ের মতো কি না। শাহনাজের নিজের মা কবে মারা গেছে। নূরজা বানু ছাড়া কেউ আত্মীয়ও নেই শাহনাজের। চুকিবালির কাজ করে তিনজন রোজগার করে খেতে দেতেই ফুরিয়ে যায়। খাইখরচা দেখাশোনা করে নূরজা তার হাতেই খোরাকির টাকাপয়সা পড়ে। দোকান বাজার তাকেই করতে শাহনাজ যে টাকা পেয়েছে, ভেবেছিল সে-সব টাকা তাকে রাখতে দেবে। আশা করেছিল নূরজাহান। কিন্তু শাহনাজ নিজের সুটকেশেই টাকাটা পুরে টাকাটা একবার হাতে করে দেখতে দিতে পারত না বোনঝি, সে কি নিয়ে নি

ানঝির এই ব্যবহারে খানিকটা আহত হয়েছে নূরজাহান। অভিমান হয়েছে তার। ানঝিকে এখন তোয়াজ করে চলতে হবে। বোনঝি উঠেছে দেখে চা আর সিঙাড়া ানতে বেরিয়ে পড়ে।

শাবানা বলল, 'মা, তুমি নিশ্চয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলে?'

'তুই কী করে জানলি, আমি খোয়াব দেখছিলাম।'

'বুঝি আমিও। তুমি এখন কত টাকার মালিক।'

'এসব টাকা তোর বিয়েতে খরচ হবে। গহনাগুলো তোর হবে। আলমের সঙ্গে তার বিয়ে দেব।'

'তোমার যদি বিয়েটা টিকত মা, তুমি আরও অনেক টাকার মালিক হতে। কন তোমাকে তালাক দিল বলবে?'

'তা তো জানি না। কেন তালাক দিয়েছে।'

'কারণ হয়তো একমাত্র লোকটা জানে। তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল?'

'না। কথা বলার আগে তালাক দিয়ে দিল। পাগল পাগল মনে হয়েছিল লাকটাকে। এখন দেন মোহরের টাকা দেওয়ার জন্য মনে হয় না লোকটা পাগল, নে হয় তালাকের পেছনে নিশ্চয়ই কিছু একটা কারণ ছিল, যে কারণের কথা একমাত্র লোকটাই জানে।'

'তোমাকে ভেঙে ফুটে বলেনি?'

'না শুধু তালাক দিয়েছিল।'

'তুমি শুধাতে পারতে।'

'আমি শুধাতে পারিনি। গালমন্দ করেছি। রাগ না করে থাকা গেল না। কথা নই বার্তা নেই ধরে বেঁধে বিয়ে করল। তারপর ঘরে তুলতে না তুলতে তালাক দল। এতে মরা মানুষেরও রাগ জন্মাবে—আমি তো জ্যান্ত মানুষ, আমার তো াগ হবেই।'

'টাকা পেয়েছ বলে লোকটাকে আর পাগল মনে হচ্ছে না তোমার, তালাক দওয়ার পেছনে কিছু একটা কারণ ছিল মনে করছ?'

'হ্যাঁ।'

সন্ধ্যা নেমে এল।

গরম চা সিঙাড়া নিয়ে ফিরল নূরজাহান। মেঝেয় কেটলি আর সিঙাড়া রেখে াখার তলায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে নূরজাহান।

শাহনাজ বলল, 'কি হল খালা, অমন করে বসে পড়লে?'

'মাথা ঘুরছে।' বলে চোখ বোঁজে নূরজাহান।

শাহনাজ ব্যস্ত হয়, 'কেন কী হল তোমার?'

'কিছু হয়নি, একটু চুপ করে থেকে আমাকে একটু ভাবতে দে।'

নূরজাহানের গায়ে হাত দেয় শাহনাজ। 'ওমা, গা যে গরম তোমার।'

'না জ্বর হয়নি, লোকজনের কথা শুনে গায়ের তাপ বেড়েছে। মাথাও ঘুরছে লোকে কত কথা বলছে।'

'কী ব্যাপারে, কী শুনলে খালা?'

'ওমা শাহনাজ, শফীউল্লা শাবানাকে বিয়ে করতে চায়, সেই জন্যে তোকে তালাক দিয়েছিল।'

'এ কথা শুনলে তুমি বাইরে রটেছে?'

'সবাই বলছে। হীরামন ড্রেসের বাড়িতে মৌলবি মোড়ল বসেছিল। তোকে বিয়ে করলেও, ধর্মে বিধান আছে মেয়েকে বিয়ে করতে কোনো বাধা নেই।'

কথাটা শোনামাত্র মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হতে শুরু করেছে। 'ইকি কং লো, তোকে বিয়ে করার পর তোর মেয়েকে আবার বিয়ে করতে চায়? তাহলে তো শাবানা রাজরানী হয়ে যাবে।'

'অমন রাজরানীতে দরকার নেই।' শাহনাজ চোখ কপালে তোলে। 'শাবানাকে বিয়ে করতে চাইলেই হল। আমি এ বিয়েতে রাজি হব না।'

'তোকে বড়লোক করেছে লোকটা—অত টাকা গহনা পেয়েছিস—আবার তোর মেয়েকে বড়লোক করবে।'

'আমি বেঁচে থাকতে, আমার মেয়েকে বিয়ে করতে ওকে দেব না।'

'তুই পারবি হীরামন ড্রেসের সঙ্গে টক্কর দিতে? মেয়ের নসিব ভাল হবে ভেবে বিয়েতে রাজি হওয়া উচিত হবে তোর।'

'যে মায়ের স্বামী হয়েছিল, সে আবার মেয়ের স্বামী হবে?'

'তোমাকে নিয়ে ঘর করেনি। এক্ষেত্রে চলে। আমার তো বড়লোক পা নাতজামাই পেতে সাধ হচ্ছে।'

মা ও নানির মধ্যে কথোপকথনে বিশেষ কিছু বুঝতে পারে না শাবানা। দুজনের যে কি একটা ব্যাপারে বিরোধ লেগেছে বুঝতে পারে।

আর তার বিয়ের কথা নিয়ে তো তারা কথা বলেই থাকে হামেশা। কি বিরোধ কীসের। ওদের কথা শুনতে শুনতে বুঝতে পারে। শফীউল্লা তাকে বিয়ে করতে চায়। আর মা তার বিরোধী। নানি শাদির পক্ষে। শাবানা মায়ের পক্ষে লোকটার সে বউ হবে? কেন? তার প্রতি লোকটার লোভ পড়েছে, বেশ বুঝতে পারে। বড়লোক সত্ত্বেও লোকটার বিয়েতে সম্মত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় অথচ শফীউল্লা কনে পচ্ছন্দ করেছে, মেটিয়াবুরুজের যে কোনো বাড়ির যো কোনো মেয়েকে পছন্দ করলে সে বিয়ে রোধ করা যায় না। তাদের কাছে প্রস্তাব আসা আগে জনমানসে প্রথমে প্রচার হয়েছে। শাবানাদের এই বিয়েতে সম্মত ও প্রস্তুত হওয়ার কথা। যে জন্য নূরজাহান বানু বিরোধিতা করতে পারছে না। কিন্তু শাবানা আর শাহনাজ বিরোধিতা করছে।

পাঠক, মা মেয়ের এই বিরোধ মনোভাব, মেটিয়াবুরুজের জনজীবনে বিরল এক মনোভাব। তারা দুজনেই জানে, শাবানার বিয়ে শফীর সঙ্গে হলে শাবানার ভাগ্য ফিরে যাবে। শাবানা সুখ ঐশ্বর্যের জীবন পাবে। বিরোধিতা করা অনিয়ম

নূরজাহান বানুকে ঘরে রেখে তারা মা মেয়ে অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে এল। মহল্লায় মহল্লায় দুজনে হাত ধরে ধরে ঘুরল। মহল্লায় মহল্লায় শুনতে পেল বলাবলি করছে, শফী বিয়ে করতে চলেছে শাবানাকে। সন্ধ্যা গাঢ় হওয়া সত্ত্বেও তারা ঘুরতে লাগল মেটিয়াবুরুজের রাস্তায় রাস্তায়, পথচারীদের মধ্যে মহল্লায় অলিতে গলিতে সেই কথার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তাদের কেউ চিনতে পারছে না, ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেপে দেখছে, জনমানসে তারা কতখানি আলোচিত। যথেষ্ট আলোচনা তাদের নিয়ে।

বাড়িতে বসে থাকলে তাদের নিয়ে জনমানসে সঠিক আলোড়ন উপলব্ধি করতে পারত না। বিরোধিতা করে যেহেতু, সেহেতু প্রতিপক্ষের রটনা ও জনমানসের চাহিদাকে আঁচ করা প্রয়োজন। যেহেতু এই বিয়ে ন্যায্য, মৌলবি মাতব্বররা বলে দিয়েছে, সেহেতু জনমানসের মধ্যে বিয়ে হওয়ার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। আবার এই বিয়েতে হীরামন ড্রেসের মালিক শওকতউল্লা জড়িত, সেহেতু জনমানসের কাছে যথেষ্ট মান্যতা পায়।

ঘুরে ঘুরে মা মেয়েতে দেখে শুনে শিউরে উঠল। মা চায় মেয়েকে আগলে রাখতে। মেয়ে চায় মায়ের হেফাজতে সুরক্ষিত থাকতে। মা বার বার মেয়ের হাত চেপে ধরেছিল। মেয়ে বার বার মায়ের হাতের বন্ধনে ধরা দিচ্ছিল। লোকে বলেছে, তাকে বিয়ে করবে শফী। মায়ের দিকে তাকিয়েছে শুধু। রাস্তায় সে নিয়ে আলোচনা করতে পারেনি। মা মেয়ের হাতে চাপ দিয়ে বিরোধিতা বুঝিয়েছে শুধু। মেটিয়াবুরুজের পথে পথে মেয়েকে নিয়ে ঘোরা যেন শাহনাজের এক প্রতিবাদ। নূরজাহান বানুর মতো সবাই হয়তো তাকে বোঝাতে চাইবে, মেয়ের নসিব তকদির ভাল হবে, এই ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে। সে-সব কথা বুঝবে না শাহনাজ। সে এই বিয়ের বিরোধিতা করবে। এই বিয়ে যাতে না হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

৭

আজ বুধবার মেটিয়াবুরুজ মহল্লায় আজ ছুটির দিন। ঘরে ঘরে, খোপে খোপে, দলিজে দলিজে যত সব শ্রমিক ছিল, তারা সব সকাল থেকে নানা দিকে বেরিয়ে পড়তে শুরু করবে। বেরচ্ছে। প্রত্যেক বুধবার মেটিয়াবুরুজের রাস্তা যানজটে ছেয়ে যায়। প্রায় সমস্ত কর্মচারীরা লুঙ্গির ওপর শার্ট চড়িয়ে নানা বয়সে নানা চেহারায় ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায় রাস্তায়। রাস্তায় যেন জুলুশ লেগেছে। হোটেলগুলো তো জমজমাট হয়ে ওঠেই। তাছাড়াও রাস্তায় রাস্তায় নানারকম খাবারের অস্থায়ী দোকান গড়ে ওঠে আজকের ছুটির দিনে। ফুটপাথে বিরিয়ানি বিকোতে শুরু করে। শিক কাবাব, টিকিয়া কাবাব, পরটা, ভুনা গোস্ত খায় কর্মচারীরা। দল বেঁধে খায়, দল বেঁধে বেড়ায়। সিনেমা হলগুলোতে ব্ল্যাক টিকিটের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। বেশি টাকা দিয়ে টিকিট কেটে সিনেমায় ঢুকে পড়ে এক একটা দল।

কর্মচারীরা সকাল ছটা থেকে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত প্রতিদিন কাজ করে। আজ কাজ করবে না। ছুটি। মুক্তির নিশ্বাস নিতে বেরিয়ে পড়েছে। গতকাল হপ্তা পেয়েছে, খরচও করবে। আজ আর মেসে খাবে না। হোটেলগুলোতে খাবে। কেউ কেউ বাস ধরে মেটিয়াবুরুজের বাইরে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে ধর্মতলা। সেখানকার সিনেমা হলগুলোতে ভিড় জমাচ্ছে।

ছুটির দিনে মেটিয়াবুরুজে বাইরের কেউ এলে রাস্তায় রাস্তায় উপচে পড়া ভিড় দেখে অবাক হয়। অবাক হয় না মেটিয়াবুরুজের মানুষ। তারা অভ্যস্ত। ওস্তাগার ম্যাটজিরাও আজকের দিনে ছুটি খায়। ওস্তাগারদের মেয়েরা নিজেদের গাড়ি চড়ে আজকের দিনে কেনাকাটা করতে যায় ধর্মতলায়। ধর্মতলায় যেতে তারা বেশি পছন্দ করে। বাড়ির পুরুষরাও মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ইচ্ছে খুশি ঘোরে। খায় দায় ফুর্তি করে। বুধবারে জনজোয়ার নামে মেটিযাবুরুজের রাস্তায়। বেশি ফুর্তি করে। কর্মচারীদের মনে বেশি ফুর্তি। ছটা দিন কাজ করেছে, আজ ছুটি। দেদার খাবে দাবে ঘুরে বেড়াবে। ঘরে তাই বন্দী হয়ে থাকতে চায় না। শুধু রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কেউ কেউ।

আজকের দিনে শওকতউল্লা ঘোষণা করেছে আসছে বুধবার শফীর সঙ্গে শাবানার বিয়ে। আসছে ছুটির দিনে বিয়ে হবে, ছুটির দিনেই প্রচার করেছে। শাবানার সঙ্গে অথবা শাবানার বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কথা না বলেই এই বিয়ের ঘোষণা করতেই পারে শওকতউল্লা। কেন না শওকতউল্লা এ মহল্লার সব চেয়ে ধনী মানুষ তার ভাইয়ের সঙ্গে মহল্লার যে কোনো মেয়ের বিয়ে হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। অসাধ্য নয় বলেই ঘোষণা করতে পারে। শাবানার ভাগ্য ভাল, এই নিয়ে লোকে কথা বলছে। আর এই ঘোষণা নিশ্চিত করেই শাহনাজ ও শাবানার কাছে পৌঁছে যাবে, তাই একরকম প্রস্তাবেরও কাজ করবে। আগে আগে ঘোষণা করে দিলে শাহনাজ ও শাবানাকে প্রস্তুত করে তোলা যাবে।

আলম আগেই শুনেছিল শাবানাকে শফীউল্লা বিয়ে করতে চেয়েছে। আজ শুনল বিয়ের দিন ঘোষণা হয়েছে। তার সঙ্গে যে শাবানার বিয়ের কথা কয়েকদিন ধরে চলেছিল, সে কথা ভুলে যায়। দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। কয়েকদিন শাবানার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সে-সব কথা নিজের কাছেই স্বপ্ন মনে হয়। সে যে শাবানাদের বাড়ি গিয়েছিল, সে কথাও মনে রাখার সাহস নেই। শফীউল্লা বিয়ে করছে শাবানাকে। তার সঙ্গেই আলমের বিয়ের কথা হয়েছিল? সে সব কথা মনে রাখতে নেই, ভুলে যেতে হয়। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে শাবানাকে তার ভাল লেগেছিল। এখন সে-সব কথা ভাবতেও ভয় হয়। শাবানা বলে কাউকে সে চেনে না, কেউ ছিল না।

সকালবেলা বন্ধু রজবকে নিয়ে আলম বেরিয়ে পড়ল মেটিয়াবুরুজের রাস্তায় রাস্তায়। চা খেল, নাস্তা করল। হাত ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল। আজকের কর্মসূচি কী হবে সে নিয়ে আলাপ আলোচনা করল নিজেরে মধ্যে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্থির

করতে পারল না। তাই উদ্দেশ্যবিহীনভাবে খানিকক্ষণ হাত ধরাধরি করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগল। মেটিয়াবুরুজের মধ্যে থাকবে না মেটিয়াবুরুজের বাইরে যাবে? চলতে চলতেই ঠিক করবে ভাবল তারা, তাই তারা চলা থামাল না। কোথাও দাঁড়িয়ে পড়ে শরবৎ কিনে খাচ্ছে। কোথাও পান কিনে খাচ্ছে। রাস্তার ধারে মাদুলি বিক্রেতা ম্যাজিক দেখাচ্ছে আগে, তারপর মাদুলি বিক্রি করছে। সেখানে ভিড়। সেখানে আলম আর রজব খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে সহজেই সময় কাটানো যায়, অবসর যাপন করা যায়, ছুটি কাটানো যায়। রাস্তা জুড়ে কত কি মজা। হকাররা অদ্ভুত সব খেলা দেখিয়ে স্বপ্নদোষের ওষুধ বিক্রি করছে। টিয়াপাখি ভাগ্য গণনা করে দিচ্ছে। নানারকম ওষুধ বিক্রি করছে। পায়খানা পরিষ্কার হওয়ার ওষুধ, মালিশের মলম, দৈব ওষুধ। ছুটির দিনে হকারদের জমজমাট উপস্থিতি। চুকিবালিরাও বেরিয়ে পড়ে। তাদের জন্য নানা কিশিম বিকোয় রাস্তায়। টিপ, চুড়ি, আয়না, নখপালিশ, ঠোঁটপালিশ, সেপটিপিন, ঘুনশি, রুমাল, থালা বাসন, কৌটো, বদনা, জাঁতি, কানখুশকি, স্নো পাউডার, কত কি। কেউ কেউ চুকিবালি বোরখা পরে বেরয়। নানা কেনাকাটা করে। তাদেরও তো ছুটি। এপাড়া থেকে ওপাড়া তারা ঘুরে বেড়ায়।

শাহনাজ মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায় রাস্তায়। নাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়ে। তারপর কিছুক্ষণ হাঁটার পর জানতে পারে শফী শাবানাকে বিয়ে করছে আসছে বুধবার।

বোরখা পরেই ছিল শাহনাজ। কিছুক্ষণ হাঁটার পর মেয়েকে থামতে বলে। শাবানা থেমে যেতে, শাবানাকে কাছে আসতে বলে।

শাবানা বলল, 'মা, কিছু বলবে?'

'আমি তোকে শুধোব একটা কথা, সত্যি কথা বলতে হবে।'

'কী কথা?'

'তোর কি সাধ যায় শফীকে বিয়ে করতে?'

'সাধ যায় না।'

'সত্যি করে বল?'

'সত্যি বলছি।'

'ওরা তো এদিকে দিন স্থির করে ফেলেছে।'

'তাহলে কী উপায় মা?'

'দেখি চল, আগে খুঁজি আলমকে।'

'আলমকে খুঁজে পেলে কী করবে?'

'রাতারাতি তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেব।'

'মা, তুমি পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখি না কেন!'

'আলমের বোধহয় সাহস হবে না, দেখো তুমি!'

'চেষ্টা করতে দোষ কোথায়! তোকে পছন্দ করেছিল। আর আমার টাকা গহনা রয়েছে।'

'নানি বাধ সাধবে।'

'নানির ঘরে ফিরছে কে? টাকা গহনা ব্যাগে ভরে বেরিয়ে এসেছি।'

'কোথায় যাবে তাহলে?'

'আছে। সে ব্যবস্থা আমার মনে মনেই আছে।'

'মাগো, বাঁচাও আমাকে ও লোকটার হাত থেকে।'

'মেটিয়াবুরুজেই তোকে লুকিয়ে রাখব।'

'আমার সঙ্গে তুমি থাকবে না?'

'আমি তুই একসঙ্গে থাকব।'

'মাগো!'

'চল আগে আলমকে খুঁজি। আলম তোকে বিয়ে করবে কি না আগে জানি। ওস্তাগারের দলিজে গেলে হয়তো পেয়ে যাব।'

হাঁটতে হাঁটতে তারা চলল হাজিরতন মোড়ে। সেখানে একজন ওস্তাগারের ঘরে কাজ করে আলম। মা মেয়ে গায়ে গা লাগিয়ে এগিয়ে চলল সেখানে। তারা ধীরে ধীরে হাঁটে, তাই সহজে পথ ফুরোয় না। ছুটির দিনে ব্যস্ততা বড় কম। শাহনাজ মেয়েকে আগলে নিয়ে চলতে লাগল। যত কাছে আসতে থাকে দলিজ, ততই শাহনাজের মানসিক উত্তেজনা বাড়ে। হয়তো আলম শাবানাকে বিয়ে করতেই চাইবে না। আলমের সেই সাহস হয়তো হবে না। তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি। হয়তো আলম রাজি হয়ে যেতে পারে। হয়তো আলম সাহস দেখাতে পারে। সাধারণ মানুষ কিছু অসাধারণ কাজ করে ফেলে না? তেমনই অসাধারণ কাজ করে দেখাল হয়তো আলম।

ওস্তাগারের দলিজে গিয়ে শাহনাজ বিফল হল। নাকি একটু আগে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে কিছু বলে যায়নি। তবে ফিরতে দেরি হবে বলে গেছে। আর একটু আগে এলেই পেয়ে যেত। কি আর করা যায়, রাস্তায় রাস্তায় না হয় আলমকে খুঁজবে।

রাস্তায় রাস্তায় খোঁজে আলমকে শাহনাজ। পেছন থেকে দেখতে আলমের মতো এমন কয়েকজনকে দেখল শাহনাজ। ভুল করে ডেকেও ফেলেছিল একবার। পেছন ফিরে তাকিয়েছিল অন্য একজন। শাহনাজ লজ্জা পেয়েছিল।

সিনেমা তলায় যায়। এই মাত্র নুন শো শুরু হয়ে গেছে। সিনেমাতলায় আলম নেই। হোটেলের সামনে দাঁড়ায়। আলম খেয়ে বেরচ্ছে কিনা দেখে।

শাহনাজ মেয়েকে বলল, 'চল হোটেলে খাই।'

'হোটেলে খাবে?'

'আর তো লিচুতলায় ফিরব না, দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিই আয়।'

'কোথায় যাবে?'

'বলব না। গেলেই জানতে পারবি।'

হোটেলে বসে খেতে লাগল মা মেয়ে। অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তারাও ছুটির মেজাজে আছে। সারা সপ্তাহ তারাও তো কাজ করে। ছুটির মেজাজে ঘোরাফেরা খাওয়া দাওয়া তাদেরও দরকার হয়। শুধু শাহনাজের বাড়তি উত্তেজনা শাবানাকে লুকিয়ে ফেলতে চাইছে। শফীউল্লার দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ জানবে না, সেখানে শাবানাকে রাখবে। কোথায় রাখবে, মেয়েকেও জানায়নি। চুপি চুপি শুধু সেখানে পৌছে যাবে। রাস্তায় যদি আলমের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাকে প্রস্তাব দেবে। আলমের সাহস থাকলে এগবে—তা না হলে আলমের ছায়া মাড়াবে না। চেনা পরিবেশ থেকে চলে যাবে। একেবারে অচেনা পরিবেশে। যেখানে কেউ তাদের চেনে না। যেখানে ছিল একেবারে তার বিপরীত দিকে। সেখানেও কাজ আছে, কাজ পাওয়া যাবে। চুকিবালির কাজ করবে।

অনেক আগে থেকে পরিকল্পনা ভেঁজে নিয়েছিল শাহনাজ। সকালে বেরিয়ে রাস্তায় যেই শুনতে পেল শাবানাকে আগামী বুধবার শফী বিয়ে করবে, ঘোষণা করেছে, এ কথা শুনে আজকেই এই মুহূর্তে খালার বাড়ি, লিচুতলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল শাহনাজ। খালা শফীর পক্ষে। শফীর হয়ে কাজ করত। তাদেরকে বোঝাতো। শাবানার কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে যেত। জোর করে শাবানাকে শফীর লোকজন তুলে নিয়ে যেতে এলে এই খালা সঙ্গ দিত, মেয়ে পক্ষের কর্ত্রী হয়ে যেত। কেন না খালার টাকার খুব লালচ। খালাকে লুকিয়ে মেয়েকে নিয়ে পালাতে চেয়েছে তাই শাহনাজ।

৮

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আলমকে খুঁজতে লাগল শাহনাজ। শাবানার চোখও খুঁজছিল। ছুটির দিন কোথায় যাবে? এদিক ওদিক আছে কোথাও। রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে চোখে পড়ে যেতে পারে। কিংবা আলমেরও চোখে পড়ে যেতে পারে শাহনাজ আর শাবানাকে। আলম তাদের দেখতে পেলে কি চেনা দিতে এগিয়ে আসবে? মনে হয় না। কেন না আলম এখন শাহনাজ শাবানাদের ছায়া মাড়াতে চাইবে কেন। কে না শফীউল্লা শাবানাকে বিয়ে করছে, ঘোষণাও হয়ে গেছে, আসছে বুধবার, সেই শাবানাদের চিনতে পেরে, তাদের কাছে যাওয়ার দুঃসাহস হবে না আলমের। অথচ সেই আলমকেই খুঁজছে এখন শাহনাজরা। হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে পথে পথে। হাঁটে, যেন ছুটি খাচ্ছে। ছুটিও খাচ্ছে, খুঁজছেও। আবার একই সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছে শাহনাজ। কোথাও গিয়ে লুকিয়ে ফেলবে। কিস্‌সাকাহিনীর ঘটনাক্রমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে মা মেয়ে। হয়তো পথেই ছিনতাই হয়ে যেতে পারে তার মেয়ে। না, আজকে বিয়ের দিন ঘোষণা হয়েছে, আজই শাবানার খোঁজে আসবে না শফীউল্লার লোকজন।

আজকের দিনটাতেই মুক্তি। যা করতে হবে আজকেই। কালকে করলে দেরি হয়ে যাবে। মেয়েকে নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই। শওকত শফীর লোকজন তাদের দেখলেও দোষ নেই। কেন না তারা মহল্লাতেই আছে, আছে বলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর শফী-শওকত ভাবছে, তার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এ তো সৌভাগ্য। এখানে রাজি না হওয়ার প্রশ্নই মাথায় আসে না। আজ ঘোষণা হয়েছে বিয়ের দিন, নিশ্চয় আগামীকাল প্রক্রিয়া শুরু করে দেবে। শওকত কালকেই নিশ্চয় লোক পাঠাবে লিচুতলায়। লিচুতলায় কাল মা মেয়েকে পাবে না। তখন কী ঘটনা ঘটবে, কেউ বলেত পারবে না। কীভাবে শাবানাকে খুঁজবে, সে কথা জানে শওকত-শফীরা। শাহনাজ মা-মেয়ে শুধু জানে, তাদের লুকিয়ে পড়তে হবে। কিছুতেই ধরা দেওয়া চলবে না। তাই আজই তারা গোপন ডেরার সন্ধানে চলেছে। শাহনাজই একমাত্র জানে, কোথায় তারা যাবে। মেয়ে মায়ের সঙ্গে চলেছে। এ বিয়েতে রাজি হলে যে বড়লোকের বিবি হত, সুখ ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকতো, সে সব তাকে তেমন প্রণোদিত করছে না। বরং বিরোধ গড়ে তুলছে। এত সব প্রলোভন সত্ত্বেও কেন যে এই বিয়েতে তারা বিরোধে নেমেছে, এ ব্যাপারে তারা অন্যদের বোঝাতে পারবে না। বিরোধিতা একমাত্র বিরোধের ব্যাখ্যা। এতে কতখানি সফল হবে, ধরা পড়বে কিনা, এসব ভেবে বিরোধে নামেনি শাহনাজ। মেয়েকে নিয়ে পালাতে চেয়েছে, যাচ্ছে, যাবে। এই পালিয়ে যাওয়া কিস্‌সা নিশ্চয়ই এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাক্রম। লেখক হিসেবে আমি তাকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য। কী ঘটবে, আগে থেকে আমিও জানি না। এক্ষেত্রে এই ঘটার প্রতি অনুসরণ করাই আমার উদ্দেশ্য হবে।

অতএব তারা পথ চলতে চলতে এগচ্ছিল, খুঁজতে খুঁজতে পালিয়ে যাচ্ছিল। শাবানা কখনো মায়ের গা ছোঁয়, কখনো হাত ধরে। আগে আগে মা যায়, পেছু পেছু মেয়ে যায়। কখনো হাত থেকে হাত ছেড়ে যায়, স্পর্শ থেকে স্পর্শ ছেড়ে যায়। কখনো মা এগিয়ে যায়, মেয়ে পিছিয়ে পড়ে। রিকশা মোটর সাইকেল অটো রিকশা গাড়িঘোড়ার বাধা কম নয়। তেমনই হাঁটা হয় মন্থর। এত সময় ধরে চলেছে যে তারা যেন দূর দূরান্তে পাড়ি দিচ্ছে।

শাবানা বলল, 'মা, আর যে হাঁটতে পারছি না।'

'হাঁপিয়ে পড়লে কি চলবে!'

'আর কতদূর?'

'আরো খানিকটা।'

'কোথায় চলেছি?'

'গেলেই জানতে পারবি।'

'আমাকে লুকিয়ে রাখবে?'

'হ্যাঁ, তোকে লুকিয়ে রাখব।'

'যদি ধরা পড়ে যাই।'

'সে সব জানি না। শুধু জানি তোকে লুকিয়ে ফেলতে হবে।'

'আমার ভয় করছে।'

'ভয় কি, আমি তো আছি।'

'তুমি পারবে?'

'তা জানি না। চেষ্টা করা আমার কর্তব্য।'

'আমাকে বিয়ে করতে চায় কেন লোকটা?'

'মাকে বিয়ে করেছে, আবার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।'

'কেন?'

'জানি না। তবে তোর রূপে লোভ পেয়েছে।'

'রূপ?'

'হ্যাঁ রূপ।'

'সত্যিই আমি সুন্দরী?'

'হ্যাঁ।'

'আমি নিজেই জানতাম না।'

সুন্দরী হয়ে মেটিয়াবুরুজে জন্মানো এই এক সমস্যা। যে কোনো বাড়ির সুন্দরীর দিকে বড়লোকের লোভ। বিয়ে করে তবে ক্ষান্ত হবে।

শাহনাজ বলল, 'আলমকে খুঁজছিস, না হাবার মতো হেঁটে চলেছিস?'

'তুমি তো তাকে খুঁজছ।'

'আরো এক জোড়া চোখ খুঁজলে দোষ কোথায়?'

'আমি যত দেখি, আলমের মতো কাউকে দেখি না।'

'অথচ আলম রাস্তায় এখানে ওখানে কোথাও আছে। দোকানে থাকতে পারে, দোকানে উঁকি দিয়ে দিয়ে খুঁজে যেতে পারিস।'

'দোকানের ভেতরও তো দেখছি।'

'কোথায় গেল লেড়কাটা?'

'জানি না।'

'আলম তোকে বিয়ে করলে বাঁচি।'

'বিয়ে করবে না।'

'কেন?'

'অত সাহস হবে না।'

'তবু চেষ্টা করে যেতে দোষ কী? তুই কি শফীর বিবি হতে চাস? এখনও বল, তাহলে ফিরে যাই লিচুতলায়।'

'না।'

'তাহলে তো লুকিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।'

'আর কতদূর?'

'এই তো হয়ে এল।'

'পা লুটিয়ে পড়ছে।'

'আরো একটু সবুর কর।'

'পিয়াস পাচ্ছে।'

'ওখানে গেলেই পানি খেতে পাবি।'

অতএব আবার হাঁটতে হয়। মাকে স্পর্শ করে শাবানা। শাবানা মেয়ের হাত ধরে কখনো কখনো। হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সাহস জোগায়। দেখতে দেখতে বিকেলের ছায়া পড়তে শুরু করেছে। ধূসর হয়ে উঠেছে চারপাশ। কাঁচি সড়কে এসে থেমে যায় শাহনাজ। তারপর মেয়ের হাত শক্ত করে ধরে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। একটা ঘুড়ি কারখানার সামনে গিয়ে পড়ে। ছোট একটা কারখানা। সেখানে আট দশ জন কর্মচারী বসে বসে ঘুড়ি তৈরি করছিল। মা মেয়ে কারখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

ভেতর থেকে একজন বুড়ো লোক বেরিয়ে আসে। মা মেয়েকে সে দেখতে পেয়েছে। 'বেটি তুই ইখানে?'

শাহনাজ বলল, 'বাবাজি, আমি তুমার কাছে এসেছি। অনেক বাত আছে তুমার সঙ্গে।'

'খুব বুরা খবর?'

'সকলের সামনে বলা যাবে না।'

'তবে হামারা ডেরায় চল।'

'মেয়েকে সাথে করে এনেছি দেখতে পাচ্ছ তো।'

'দেখতেই তো পাচ্ছি। চল, ডেরায় চল।'

বুড়ো নিয়ামত ঘিঞ্জি বসতির ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। গলির পর গলি ধরে হাঁটছে। মা মেয়ে পেছু পেছু চলেছে। অচেনা পাড়া, অচেনা মানুষ সব এখানে। নিয়ামত এই বসতিতে থাকে। নিয়ামতের কেউ নেই। বউ অনেক আগে মারা গেছে। তা বছর তিনেক আগে বাসের মধ্যে শাহনাজের সঙ্গে আলাপ। নিয়ামত তাকে মেয়ে বলে ডাকে। বলেছিল কোনো বিপদে পড়লে যেন তার কাছে আসতে না ভুলে যায়। মেয়ে বলে যে ডেকেছে, তার সম্মান রাখবে সে। আর বিপদে পড়লেই আসবে। কেন না বিপদের সময়ই আসল বন্ধু চেনা যায়। আজ বিপদে পড়েছে শাহনাজ। চলে এসেছে তার পাতানো বাপের কাছে।

নিয়ামত তার বস্তির ঘরে নিয়ে যায় শাহনাজ আর শাবানাকে। শাহনাজ বলল সব তার বিপদের কথা। নিয়ামত প্রতিশ্রুতি দিল তাদের এখানে লুকিয়ে রাখবে। শাহনাজ আর শাবানা নতুন আশ্রয়ে চলে এল। নিয়ামতের ঘরে সব আছে। বিছানাপত্তর আছে। রান্নার আয়োজন আছে। বসবার মোড়া থেকে সুপুরি কাটার জাঁতি পর্যন্ত আছে। শাহনাজ বুঝতে পারল, এখানে তাদের থাকতে তেমন কোনো অসুবিধে হবে না। শফী-শওকতের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এসে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে

৯

কতউল্লা ভাইয়ের খায়েশ পূরণ করতে কোনো রকম ব্যবস্থার ত্রুটি রাখছে তার ম্যানেজার ওসমান আলি আর শফীর ম্যানেজার জিয়াদকে সমস্ত য়োজনের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে। হাতে বেশি সময় নেই। এক সপ্তাহও সময় নেই ত। অথচ বিয়েটা হবে। আবার যা তা করে নয়। রীতিমত হাজার দেড়েক াক খাবে। বিয়েবাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। কেনাকাটার ফর্দও তৈরি। টাকা পয়সা জেই খরচ করছে। সে হোক না লাখ দুই খরচ। পানিকলে ইতিমধ্যে একটা াট কিনে ফেলেছে। কনে কনের মা ও কনের নানি সেখানে গিয়ে আপতত কবে। লিচুতলার বস্তি বাড়ি থেকে কনে আসাটা ভাল দেখাবে না, তাই নিজেই ই ব্যবস্থা নিয়েছে। শফীকে কিছুই করতে হবে না, সে শুধু দেখুক, তার বড়ভাই দায়িত্বপালন করে। বুদ্ধি আর টাকা পয়সা লাগবে। কাজ তো করে দেবে র্মচারীরা।

ঠিকঠাক এগচ্ছে, কোনো রকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই। শফীকে কোনো কিছুর দ্যোগ গ্রহণ করতে হবে না। সে শুধু বিয়ে করবার মালিক বিয়ে করবে। বড়ভাই াকতে, সে এসব করবে কেন? শফী প্রায়ই ফোন করে, জেনে নেয় অগ্রগতির থা। এগচ্ছে, ভালই এগচ্ছে। আজই জিয়াদ যাবে কন্যাপক্ষকে পানিকলের ফ্ল্যাটে ানান্তরিত করতে। একটা ম্যাটাডর যাবে, মালপত্তর নিয়ে আসবে তাদের।

শফী তেতলার ঘর থেকে খুব একটা নামে না। মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে াড়ায়। পরিস্থিতির ওপর নজর দিচ্ছে শুধু। তার কিছু করার নেই। আর অপেক্ষা রছে শাবানাকে জীবনে পাওয়ার। শাবানাকে জীবনে পাওয়া নিয়ে কেন এত তলা হল বলতে পারবে না শফী। ঐ একটি মেয়ের রূপ শফীর সমস্ত কিছু কড়ে নিয়েছে। এখন তাকে পাওয়া হবে শফীর জীবনের পরম পাওয়া। এখন ার জীবন নিঃসঙ্গ কাটছে। কয়েকদিন পরে এই ঘরে শাবানা আর সে থাকবে। এখন বাইরে আড্ডা দিতে, মজলিশ করতে তেমন ভাল লাগে না শফীর। বেশ আছে একা একা। শাবানাকে পাওয়ার ধ্যান নিয়ে বেশ কাটছে তার। তবে জিয়াদ ম্যানেজারের সঙ্গে বৈঠক করছে, ব্যবসা দেখছে।

বড়ভাইয়ের ফর্দে যেন শাবানার গহনা না থাকে, এ কথা ফোনে বড়ভাইকে জানিয়ে দিয়েছে। নিজের টাকায় শাবানার গহনা কিনতে চায় শফী। আর শাড়ি জামা পোশাক আশাক কসমেটিকস ওসব না হয় শওকতউল্লার ফর্দে কেনা হবে। আপাতত সাত আট ভরির গহনা নিজেই কিনে ফেলবে। জিয়াদকে টাকা দিলেই কিনে এনে দেয়। জিয়াদের সঙ্গে নিজে গিয়ে কিনবে কিনা ভাবছে শফী। সে এক উত্তেজক অভিযান হয়। বিবির জন্য গহনা কিনছে। বেশ একটা প্রেমার্ত ভাব তাতে থাকে। আর মনস্থির করেছে, এটা করবে সে। আজই বিকেলে লিচুতলার বাড়ি থেকে পানিকলের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসবার কথা। কাজটা করবে জিয়াদই। জিয়াদের অনেক কাজ। এদিকে ব্যবসা সামলাচ্ছে, ওদিকে বিয়ের তোড়জোড়

করছে। দাদার ম্যানেজার ওসমান আলিও বিয়ের বন্দোবস্তে হাত লাগাচ্ছে। নেমন্ত্
শুরু হয়ে যাবে কাল থেকে। এসব কাজ দাদাই করবে।

এখন শুধু তার পছন্দের পাত্রীকে পাওয়ার স্বপ্নে স্বপ্নে মজে থাকছে শফ
তার আর বেশি কিছু করার নেই। ঘুমোয়, জেগে ওঠে, আবার ঘুমোয়। ঘ
পায়চারি করে, বারান্দায় দাঁড়ায়। আর ভাবে শুধু ভাবে। জল্পনা কল্পনা করে ক
কিছু। আগে তো এমন ছিল না, কীভাবে পরিবর্তন হল তার? শাবানার র
তাকে এমন পরিবর্তিত করেছে। শাবানাকে দেখতে ইচ্ছে করে খুব তার। ভা
যায়, লিচুতলায় গিয়ে দেখা করে আসে। কিন্তু এক দ্বিধায় যেতে পারেনি। কা
শাহনাজকে দেখতে পাবে। শাহনাজকে দেখা তার পাপ হবে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী
মুখ দেখাও পাপ। এমন যদি সুযোগ থাকত, শাবানার সঙ্গে বিয়ের আগে য
শাবানার সঙ্গে প্রেম করতে পারত, তাহলে বেশ হত। দুজনে মুখোমুখি বস
কথা বলতে পারত। স্পর্শ করতে পারত না. স্পর্শ করা পাপ হত। শাবানা
দেখার ভেতরই কত সুখ। নির্জন ফুলের বাগানে যদি শাবানার সঙ্গে ঘুরে বেড়া
যেত! কত কথা বলত তারা দুজনে। শাবানা খুব সুন্দর পোশাক পরত। ত
শাড়ির আঁচল অথবা ওড়না হাওয়ায় উড়ত, আর শফীর মুখের ওপর পড়
ওড়না বা আঁচলে সুরভি থাকত, সেই সুরভির ঘ্রাণে মাতোয়ারা হত শফী

বাগানে হাঁটছিল শফী। আগে আগে হাঁটছিল শাবানা। শাবানার ওড়না হাওয়
উড়ে মুখে পড়ে শফীর। সুগন্ধ পায়। চারপাশে ফুলও ফুটে আছে বাগানে। ফুে
গন্ধেও বাতাস মুখরিত হয়ে আছে।

শফী একটু দাঁড়িয়ে পড়ে। গোলাপ গাছ থেকে একটি সদ্যফোটা গোলাপ তো

শাবানা পেছু ফিরে দেখে শফীকে। তারপর সেও থেমে যায়।

ফুল তুলে খানিকটা হেঁটে শাবানার কাছে পৌঁছে যায় শফী। তারপর হ
বাড়িয়ে গোলাপটা দেয় শাবানাকে।

শাবানা হাত বাড়িয়ে গোলাপ নেয়. আর হাসে। অদ্ভুত সুন্দর তার হা

শফী বলল, 'ফুলটা কেমন?'

'ভাল।'

'শুধু ভাল?'

'খুব সুন্দর।'

'তোমার চেয়ে কিন্তু সুন্দর নয়।'

এই কথা শুনে শাবানা খিল খিল করে হেসে ওঠে। 'যা, মিথ্যে বোলো ন

'সত্যি বলছি শাবানা, তুমি আমার কাছে এই ফুলের চেয়েও সুন্দর। ফু
চেয়েও বেশি সুরভিত।'

'তুমি আমাকে বেশি ভালবাস বলে বলছ।'

'দুনিয়ার সব কিছুই তোমার চেয়ে ভাল নয়।'

'শুনতে আমার লজ্জা করছে।'

'বান্দা তারিফ না করে পারে না।'
'আমি তোমার চোখে সত্যি সুন্দর?'
'সুন্দর, খুব সুন্দর।'
'তবে আমাকে স্পর্শ করছ না কেন? স্পর্শ করলে আমাকে ভাল লাগবে।'
'স্পর্শ আমি করতে পারি না, আমার পাপ হবে।'
'কেন?'
'কেন না তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।'
'বিয়ে না হলে কি ভালবাসার নারীকে স্পর্শ করা যায় না?'
'না, যায় না।'
'বিয়ে তো হবেই।'
'তা হলেও।'
'কেন?'
'আমি ধার্মিক। ধর্মবিরুদ্ধ কিছু কাজ আমি করতে পারি না।'
'আমার মাকে তুমি বিয়ে করেছিলে।'
'তাহলেও তোমাকে বিয়ে করা আমার অন্যায় হবে না।'
'কেন তালাক দিলে?'
'বলব না।'
'আমাকে বিয়ে করতে চাও কেন?'
'তোমাকে ভালবাসি বলে।'
শুনে শাবানা হাসে। অদ্ভুত সুন্দর হাসি।

উদ্যানে তারা পাশাপাশি হেঁটে বেড়ায়। হাত ধরে না। পাশাপাশি হেঁটে চলে ্ধু। দুজনে দুজনের দিকে তাকায়। হাসি বিনিময় করে, দৃষ্টি বিনিময় করে। কথা লে। ভালবাসা তৈরি করে চলে। রাত নেই, দিন নেই, শুধু তাদের এই প্রেমে াকা চলে। চলতেই থাকে। নিরন্তর। কখনও তারা বিচ্ছিন্ন হয় না। কখনও তাদের বরোধ আসে না। অথচ তারা স্পর্শ করে না একে অপরকে। তাদের প্রেম পবিত্র। ারা বোধহয় প্রেমের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

শফী বলল, 'তোমাকে বিয়ে করবার পর আমাকে এমনই প্যার মহব্বৎ করবে তা?'

'চিরকাল।'
'আমি যদি গরিব হয়ে যাই?'
'তাহলেও এমনই ভালবাসব।'

'সত্যিই তোমার ভালবাসার তুলনা হয় না শাবানা। আল্লার রহমত পেলে তামাকে আমি রাজরানী করে রাখব।'

১০

াবানার সঙ্গে সত্যিই যেন এই ঘটনায় যায় শফী। সত্যিই যেন এই কথোপকথনে ায়। তার কল্পনা ও বাস্তবের ভেদজ্ঞান থাকে না। আর তার মাথায় মুহূর্তে প্রাচীন

কাহিনী এসে বসে। নবি রশুলের কাহিনী। খোয়া যায় একটি কাহিনীতে। সে এব প্রচলিত কিস্‌সা।

হজরত আইয়ুব ছিলেন হজরত এয়াকুবের বড়ভাই। তিনি সিরিয়া দেশের মানুষ। আইয়ুব ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি দশজন ভিখিরিকে খাইয়ে তবেই প্রতিদিন আহার গ্রহণ করতেন। আর নতুন পোশাক তখনই পরতেন, যখন তিনি দশজন বস্ত্রহীন মানুষকে পোশাক দিতে পারতেন।

আল্লাহ্ তাঁকে অঢেল ধনসম্পদ দিয়েছিলেন। অনেক সন্তান সন্ততিরও জনব ছিলেন তিনি। পার্থিব আনন্দসুখ সত্ত্বেও তিনি আল্লার এবাদতে দিনরাত মশগুল থাকতেন। এভাবে আইয়ুবকে দেখে একজন শয়তান আল্লাকে জানাল, 'হে আল্লা আইয়ুব যে এত ধর্মপ্রাণ হয়েছে, অন্নহীন বস্ত্রহীন দরিদ্রকে যে দেখে, তাকে ধনসম্পদ দিয়েছেন বলেই না এসব করতে পারে। তাকে যদি ধনসম্পদ না দিতেন তাহলে সে আপনার প্রার্থনা করত না। আমাকে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন, তখন দেখা যাবে আপনাকে কতটা মানে।'

আল্লা শয়তানকে আইয়ুবের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু শয়তান আইয়ুবকে কিছুতেই বিপথে নিয়ে যেতে পারল না। শয়তান হার স্বীকার করল

ফেরেস্তারাও আল্লার কাছে আরজি জানালেন এই বলে যে, 'আইয়ুবকে ধনসম্পদ দিয়েছেন বলেই সে আপনার এবাদত করে। তাকে সব রকম আরাম বিলাসে রেখেছেন বলেই শোকর আদায় করে।

তখন আল্লাহ্ ফেরেস্তাদের বললেন, 'এমন কথা শয়তানও বলেছে। তোমরা এই অভিযোগ করছ আইয়ুবের বিরুদ্ধে। আমি তোমাদের জানাই আইয়ুব এবাদত করছে ধনসম্পদ পেয়েছে বলে নয়, এই ধনসম্পদ আরাম বিলাস তার কাছ থেকে কেড়ে নিলেও সে আমার সেই রকমই এবাদত করবে। বরং এখন যতটা আমার প্রতি অনুগত, অভাবের দিনে অনেক বেশি আমার অনুগত থাকবে।'

কথিত আছে এর কিছুদিন পর হজরত আইয়ুব আল্লার কাছ থেকে রোগভোগ প্রার্থনা করে বসলেন। রোগভোগে থেকেও সে আল্লার এবাদত থেকে বিচ্যুত হবে না, সেই পুণ্য লাভ করার সাধ জানালেন।

তখন আল্লাহ্ জানালেন, 'হে আইয়ুব, তুমি কি আমার কাছ থেকে বর্তমানে যে সুস্থ জীবনে আছ তা বজায় রাখতে চাও না অসুখ বিসুখ দারিদ্র্য চাও?

'হে প্রভু, আমি আপনার সুখ-সম্পদের চেয়ে তোমার দুঃখ দারিদ্র্যই পছন্দ করছি।'

অতএব হজরত আইয়ুব রোগভোগে পড়লেন। তাঁর শরীরে বিষাক্ত এক ফোঁড়া হল। ফোঁড়ায় পচন ধরল, পোকা কিলবিল করতে লাগল। এতই দুর্গন্ধ যে কাছে কেউ ঘেঁষতে পারে না। তাঁর ধনসম্পদ নষ্ট হতে লাগল। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে ত্যাগ করতে লাগল। ছাদ চাপা পড়ে তাঁর সন্তান-সন্ততিরা মারা গেল। কিন্তু

তিনি আল্লার এবাদত থেকে সরে থাকলেন না। অবশেষে ঘায়ের পোকারা তাঁর চোখ দুটো খেতে শুরু করল। সবাই তাঁকে ছেড়ে গেছে। চার বিবির মধ্যে তিন বিবি সরে পড়েছে। একমাত্র হজরত ইউসুফের নাতনি রহিমা বিবি তাঁকে ছেড়ে গেলেন না। এরজন্য তিনি পঞ্চসতীর একজন হয়েছিলেন।

একদিন হজরত আইয়ুব বিবি রহিমাকে ডেকে বললেন, 'বিবি, সবাই তো ছেড়ে গেল, তুমি পড়ে আছ কেন, তুমিও আমাকে ছেড়ে যাও।'

তখন রহিমা বিবি বললেন, 'প্রিয়তম আমার, যেদিন তোমার সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য ছিল, তখন সে সব ভোগ করেছি, আজ তোমার বিপদের দিনে বিপদেরও ভাগ নিতে চাই তাই। তবেই তো তাকে বিবি বলে। এর ফল আমি আল্লাহ্র কাছ থেকে পাব।'

হজরত আইয়ুব আঠারো বছর এই রোগ ভোগ করেছিলেন।

গ্রামের মানুষ আইয়ুবকে গ্রামের বাইরে বের করে দিল। একটি একটি করে সাতটি গ্রাম থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। শেষ মেষ তিনি পথের ধারে একটি গাছের তলায় আশ্রয় পেলেন। তাঁর একমাত্র সঙ্গী বিবি রহিমা। বিবি রহিমা দিনের বেলা গ্রামে গিয়ে লোকের বাড়িতে কাজ করে স্বামীর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে আনতেন।

একদিন বিবি রহিমা সারাদিন ঘুরে ঘুরে কোনো কাজ পেলেন না। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ফিরে গিয়ে ক্ষুধার্ত স্বামীকে কী খাওয়াবেন, দুশ্চিন্তায় পড়লেন। অতঃপর খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। অবশেষে এক বিধর্মী রমণীর দেখা পেলেন। তাকে বললেন, 'আমাকে কিছু খাবার ধার দাও, ক্ষুধার্ত স্বামীকে আমি খাওয়াব, পরে তোমাকে শোধ করে দেব।'

সেই রমণী বললেন, 'ওসব ধার-কর্জের হুজ্জোতিতে আমি নেই। যা হবে নগদানগদি। তোমার অত সুন্দর চুল থাকতে ধারকর্জ কি। তুমি তোমার চুলগুলো কেটে দাও, আমি তোমাকে খাবার দিচ্ছি।'

অশ্রুতে প্লাবিত হল রহিমার মুখমণ্ডল। কি করে এই চুল দেবেন তিনি। বললেন, 'এ চুল তুমি আমার থেকে চেও না বোন। আমার স্বামী অসুস্থ, দুর্বল, লাঠি ধরার মতো তাঁর ক্ষমতা নেই। তিনি আমার এই চুল ধরেই ওঠা বসা করেন। এ চুল তোমায় আমি দিতে পারব না।'

বিধর্মী মহিলাও চুল না নিয়ে খাবার দেবে না।

খাবার না নিয়ে গেলে স্বামী অভুক্ত থাকবেন ভেবে রহিমা বিবি চুল দিয়েই খাদ্য সংগ্রহ করলেন।

এই সময় এক শয়তান পীরের ছদ্মবেশে আইয়ুবের কাছে গিয়ে বলল, 'তোমার বিবি চুরি করেছিল, তাই তার মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এ কথা শুনে হজরত আইয়ুব অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। দারিদ্র্যে পড়ে রহিমা বিবির এই পদস্খলন হল? চুরি করে এনে কত কি খাওয়াচ্ছে কে জানে। এসব

ভেবে তিনি এত কাঁদতে লাগলেন যে তাঁর আঠার বছরের রোগের যন্ত্রণায়ও এত কাঁদেননি। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন এই কাজের শাস্তিস্বরূপ রহিমাকে একশো বেত মারবেন। প্রাণের বিবিকে ভুল বুঝে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বিবি ছিলেন পঞ্চসতীর এক সতী। তাঁর ইমান, সততা, স্বামীভক্তি ছিল অসাধারণ।

শফী কাহিনীতে খোয়া গিয়েছিল। আবার বাস্তবে ফিরে আসে। মনে হয়, শাবানা কি তার তেমন অনুগতা হবে না? শাবানাকে কল্পনায় তেমনই গড়ছে শফী।

দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিল শফী। দরজায় ঠুক ঠুক। ঘুম ভেঙে যায়। বিছানা ছেড়ে ওঠে। তারপর দরজা খুলে দেয়। সামনে দাঁড়িয়ে আছে জিয়াদ। 'কী ব্যাপার?'

'আজ্ঞে আমি লিচুতলায় যাব। ওনাদের পানিকলের ফ্ল্যাটে তুলে দিয়ে আসতে যাব।'

'তা যা না, সে তো ভাল কথা।'

'বড়কর্তা আজ দুপুরে কাজটা করতে বলেছেন।'

'ঠিকই আছে। আটকাচ্ছে কোথায়?'

'আটকাচ্ছে না। যা ঘটছে আপনাকে জানিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য। তাই আপনার ঘুম ভাঙিয়ে বলে যেতে বাধ্য হলাম। এই গুস্তাফি আমার মাপ করে দেবেন কর্তা।'

'ঠিকই করেছিস আমার ঘুম ভাঙিয়ে। যা, ওদেরকে নতুন ফ্ল্যাটে তুলে দিয়ে আয়। দেখিস, ওদের কোনো কষ্ট না হয়।'

'সে সব আমার দায়িত্ব। আমি থাকতে ওদের কোনো তকলিফ হতে দেব না।'

'সবাইকে তো ফ্ল্যাটে তোলার কথা, তাই না?'

'হ্যাঁ, সবাইকে তো কয়েছে বড়কর্তা?'

'ওর মা তো থাকবে?'

'তা থাকবে।'

'আমার সঙ্গে তার কোনো সাথ সম্বন্ধ হতে নেই কিন্তু জিয়াদ! আমি তাকে তালাক দিয়েছি।'

'আপনার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে হবে ছোটকর্তা। সে মেয়ের মা আপনার ছায়া মাড়াবে না। আমার বউ গিয়ে পাখিপড়া করে আসবে।'

'তোকে অনেক কিছু সামলাতে হবে।'

'সে আমি জানি।'

'লোকজন অনেক খাবে।'

'সেও জানি। বড়কর্তা হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বেন।'

'বড়ভাই আমাকে খুব ভালবাসে।'

'যাকে পাচ্ছেন আপনার বিয়ের কথা বলছেন, দাওয়াত করছেন। অনেক খদ্দেরদেরও দাওয়াত করছেন দেখছি। গনিভাইকে ব্যস্ত করে ছাড়ছেন।'

'বড়ভাই তার ম্যানেজারকে না জড়ালে এতবড় কাজ কী করে হবে? বড়ভাইয়ের বুদ্ধি আছে বলেই এত বড় কারবারি হয়েছে।'

অন্যদিকে মন চলে যায় শফীর। সেই শাবানার ভাবনায় মন চলে যায়, যাকে সে বিয়ে করবে। ইচ্ছে যায় তার কাছে কোনো পয়গম পাঠাতে। কোনো প্রেমপত্র যদি পাঠাত, মনটা ভাল হত তার। মন তার সহজে নরম হয়ে ওঠে। আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে। আর কদিন পরেই তো বিয়ে। শাবানাকে জীবনে পাবে। কাছে পাবে।

শফীকে আনমনা দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জিয়াদ।

জিয়াদকে দেখতে না পেয়ে কিছুক্ষণ পরে শফী চ্যাঁচায়—'জিয়াদ!'

সিঁড়িতে তখন জিয়াদ থর থর কাঁপে।

আবার ওপরে উঠে যায়।

'কিছু বলবেন?'

'না, তুই যা।'

জিয়াদ মাথা নীচু করে আবার বেরিয়ে যায়।

১১

জিয়াদ ম্যাটাডোর রেখে ড্রাইভার খালাসি নিয়ে ঢুকে পড়ে নূরজাহান বানুর ডেরায়। নূরজাহান বানু বারান্দায় বসে চুকিবালির কাজ করছিল। নূরজাহান বানু মুখ তুলতেই জিয়াদের সঙ্গে মুখোমুখি, 'ও বাপ, তুমি?'

'হ্যাঁ চাচি, আমি। তোমাদের নে যেতে এয়েচি।'

'কোথায়? শুনলুম মালিকের সঙ্গে মোর লাতিনের বে? রটে গেছে যে!'

'বিয়ের দিন পাকা হয়ে গেছে, তাই নে যেতে এলাম। এখেন থেকে বে হলে মালিকের তো মান থাকে না, তাই তোমাদের জন্য পানিকলে নতুন ফ্ল্যাট ব্যবস্থা হয়েছে চাচি। তুমিও যাবে, তোমার বোনঝি, লাতিন যাবে। ওখেন থেকে বে হবে। তোমাদের সব মালপত্তর ম্যাটাডোর ভরে নে যেতে এয়েচি।'

'হায় আল্লা, ই কি সৌভাগ্য লো। কিন্তু ওরা যে নেই।'

'কারা?'

'মা মেয়ে। সকাল থেকে নেই।' গতকাল সকাল থেকে নেই বলল না নূরজাহান।

'কোথাও গেছে। চলে আসবে।'

'তাহলে অপেক্ষা করতে বলিস ভাইপো।'

'আমি কিন্তু অপেক্ষা করব না। মালপত্র ম্যাটাডোরে তুলব। কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাঁঝের আগে ফিরবে নিশ্চয়।'

খালাসি ড্রাইভারদের ইশারা করতেই ঘরের মালপত্র ওঠাতে শুরু করে দেয়।

নূরজাহান বানু মুখ হাঁ করে বসে থাকে। বাধা দিতে পারে না। বাধা দেবে কেন? এ তো তার সৌভাগ্য, নতুন ফ্ল্যাটে উঠবে।

বাড়ির সবকিছুই ম্যাটাডোরে তুলছে জিয়াদের লোক। জিয়াদ তদারক করছে। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। কোনো কিছু বাকি রাখছে না ম্যাটাডোরে তুলতে। শুধু বাড়ি বদলে যাবে। মানুষগুলোর মালপত্র যা ছিল তা থাকবে।

মানুষগুলোও নতুন ঠিকানায় চলে যাবে। ব্যবস্থাটা নিঃসন্দেহে ভাল। আরাম বিলাসে থাকবে, ভদ্র ও সুস্থ জীবনযাপন পাবে। কে এতে রাজি না হয়ে পারে! যে ঘটনাটা ম্যাজিকের মতো ঘটে যাচ্ছে তার চোখের সামনে, সেদিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তা নিয়ে ভাববারও অবকাশ পাচ্ছে না নূরজাহান বানু। ভাববে কি, এমন সৌভাগ্য কার হয়?

যেন নূরজাহান বানুর মনে হল, সত্যি সত্যি তার বোনঝি আর নাতনি এসে পড়বে। আর তারা সবাই মিলে নতুন ফ্ল্যাটে যাবে। বোনঝি নাতিন যে বেপাত্তা এ কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে না, তাই ভাবছে না। ভাবতে ভাল লাগছে যা, তা ভাবছে। ভাবছে নতুন ফ্ল্যাটে, আরাম আরাম, সুখ। একদিন এক রাতের জন্য বোনঝি মেয়েকে নিয়ে গেছে, এখুনি নিশ্চয় এসে পড়বে। এমনটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে নূরজাহান বানুর।

ঘরে বসেই গতকাল বিয়ের ঘোষণা শুনেছিল। পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে এসেছিল। তাদের মেঠাই খাওয়াবে ওয়াদা করেছে। বোনঝি নাতনি বেড়াতে গেছে ফিরে এলে নাতিনের বিয়ে নিয়ে কথা বলবে নিজেদের মধ্যে। নাতিনের ভাগ্য ফিরে যাবে। তার ছিটে-ফোঁটা পেলে নূরজাহানও বর্তে যাবে। সেই খুশিতে ডগমগ করছিল নূরজাহান। মা মেয়ে কখন ফেরে সেই অপেক্ষায় ছিল। দুপুর গেল, বিকেল হল। বিকেল পেরিয়ে সন্ধে নামল। ফিরল না। রাত নামল, তখনও ফিরল না মা মেয়ে। শাহনাজের সুটকেশে তালা খোলা। খুঁজে দেখল তাতে টাকা আর গহনার পুঁটুলি নেই। তখন ভাবল মা মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। ভাবল, এ বিয়েতে তারা রাজি নয়। কেন? এমন বোকা মা মেয়ে কোথাও দেখেনি তো সে। ফিরবে না পাখি উড়ে গেছে। তখন এসব ভেবেছিল নূরজাহান বানু। এখন এসব ভাবছে না। এখন আশায় বুক বাঁধছে, একটু পরেই মা-মেয়ে ফিরে আসবে। তারা যেন গতকাল নিরুদ্দেশ হয়নি, আজই বেরিয়েছে কোথাও—আর একটু পরেই ফিরে আসবে। কে কোথায় থাকতে দেয়, এই বুড়ির ডেরা ছাড়া গতি নেই। একদিন এক রাত কোথাও হয়তো থেকে গেছে। ফিরে আসবে। আশায় বুক বাঁধে নূরজাহান বানু। নাতিনের ভাগ্যে সুখের দিন আসছে, সুখের দিনকে আঁকড়ে ধরতে চায়। মনকে প্রবোধ দেয়, মা মেয়ে ফিরে আসবে।

মালপত্তর সব ম্যাটাডোরে উঠছে। আর একটু পরেই উঠবে নতুন ফ্ল্যাটে এই মাল তোলার ঘটনাটা ঘটতে দেয় নূরজাহান বানু। সে জানে বোনঝি, নাতনি নেই, ফিরে আসার জন্য যায়নি, তাদের যাওয়াটা পালিয়ে যাওয়াই হয়েছে। তবুও এই নতুন ব্যবস্থার ঘটনায় অংশ গ্রহণ করতে সাধ যায় তার। নিয়ে যাক না মালপত্তর। তাকে বোনঝিকে নাতনিকে নিয়ে যাওয়ার কথা। এরা কীভাবে নিয়ে যাবে, সে কথা ভাববে কেন? যাদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব, তারাই ভাববে। তাকে নিয়ে যাবে, সে শুধু যাবে, এইটুকু তার দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালন করতে সারাক্ষণ প্রস্তুত নূরজাহান বানু।

কিন্তু এই মা মেয়ে কি বে-আক্কেলে মেয়েমানুষ! এতদিন তার ঘরে আছে, তাকে না বলে নিরুদ্দেশ হল? নেমোখারাম। দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিল। নিজের মেয়ের মতো করে রেখেছিল। বোনঝি নয়, নিজের মেয়ে জ্ঞান করত। কেউ এমন সুখের মুখে লাথি মারতে পারে! শুধু নিজের সুখ জলাঞ্জলি দিল না, মেয়ের সুখকেও বরবাদ করল। এই বুড়ির সুখকেও নষ্ট করল। এই বুড়ো বয়সে কত ভাল থাকা যেত! যত ভাবছে, ততই মাথা টন টন করে উঠছে নূরজাহান বানুর।

মালপত্তর সব উঠে গেছে। ম্যাটাডোর চলে গেছে পানিকলের উদ্দেশ্যে।

দরজায় সামনে নূরজাহান বানু বসেছিল।

জিয়াদ বলল, 'চাচি, কোথায় তোমার বোনঝি নাতনি আসছে না যে?'

নূরজাহান বানু বলল, 'তাই তো।'

'ফিরলেই তোমাদের অটো করে নিয়ে যাব। কোথায় গেছে?'

'তা তো জানি না।'

'এদিক ওদিক ঘুরছে বোধহয়?'

'তাই হবে।'

'তাহলে এসে পড়বে।'

'এসে পড়লে বাঁচি বাপ।'

'কখন গেছে?'

'সে তো কাল সকালবেলা বেরিয়েছে।'

জিয়াদ চমকে ওঠে, 'অ্যাঁ, তাহলে পাখি কি পালাল?'

'পালাবার মতলবই তো, আমাকে বলে পর্যন্ত যায় নি।' অমনি কাঁদতে শুরু করে দেয় নূরাজাহান বানু।

জিয়াদ বুঝতে পারে, সাংঘাতিক বিপদে পড়ে গেছে। মা মেয়েকে নিয়ে যেতে এসে মা মেয়েকে পাচ্ছে না। এদিকে মা মেয়েকে ফ্ল্যাটে তুলতে না পারলে মালিক খাপ্পা হবে। এক কেলেঙ্কারি বাধবে। তার কাজে এমন সব বাধা এলে, চাকরি রক্ষে করা মুশকিল হবে। আগে একদিন মালিকের জুতো খেয়েছে, এবার লাথি ঝাঁটা খাবে। কী করবে এই মুহূর্তে ভেবে উঠতে পারে না। এই কাজটা করতে পাঠিয়েছে শওকতউল্লা। তার কাছে অসফল হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ।

কান্নারত নূরজাহান বানুকে দরজার কাছে রেখে দিকশূন্যহীন দৌড়ে যায় জিয়াদ মোড়ের দিকে। এক নিশ্বাসে দৌড়ে এসে দাঁড়ায় মোড়ে। টেলিফোন বুথে লাফিয়ে ঢোকে। ফোন করে।

'বড় কর্তা বলছেন?'

'হ্যাঁ, কে জিয়াদ? কী খবর?'

'মালপত্তর সব চলে গেছে। কিন্তু'—

'কিন্তু কি?'

'মা মেয়ে বেরিয়েছে, ফেরেনি।'

'সন্ধ্যে পর্যন্ত দ্যাখ, ফিরবে।'

'আজ্ঞে গতকাল ঘর থেকে বেরিয়েছে।'

'গতকাল? কোথায় গেছে?'

'তা তো জানি না।'

'বুড়িকে পাসনি?'

'পেয়েছি। সে বলল, সে কিছু জানে না। তাকে নাকি বলে যায় নি। এখন সে দরজার সামনে বসে পা ছড়িয়ে কাঁদছে।'

'বাঞ্চোত, বুড়িকে সসম্মানে পানিকলের ফ্ল্যাটে তুলে দিয়ে আয়।'

'আর মা মেয়েকে কোথায় পাব? তাদেরও তো তুলে দিয়ে আসতে বলেছিলেন।'

'যাকে পেয়েছিস, তাকে আগে তুলে দিয়ে আয়। তারপর আমি দেখছি। ছাড়বি না, দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করার আছে তোকে। মা মেয়ে পালিয়েছে বুঝতে পারলি?'

'বুড়ি তো তাই বলছে।'

'তাহলে এই বিয়েতে মা মেয়ে রাজি নয় তোর জ্ঞানবুদ্ধিতে বুঝছিস কি?'

'তা বুঝেছি। কিন্তু এই বিয়ে না হলে ছোটকর্তার অবস্থা খুব খারাপ হবে।'

'এই বিয়ে হবে না কে বলল তোকে। সে ভাবনা তোকে করতে হবে না তুই বুড়িকে ফ্ল্যাটে তুলে দিয়ে আয়। আমি খোঁজ নিচ্ছি কোথায় আছে মা মেয়ে সে সব তোর দ্বারা সম্ভব হবে না।'

১২

সন্ধ্যায় অফিস ঘরে এসে শফী ফোন করে বড়ভাইকে। সেই মাত্র মগরেবের নামাজ পড়া শেষ হয়েছে। এখন ফোনেই বেশি কথা হয় বড়ভাইয়ের সঙ্গে। অথচ ফুট পঁচিশ দূরেই শওকতউল্লার বসবাস। ওখানে থেকেই ব্যবসা চালনা করে। বিয়ের অগ্রগতি এবেলা ওবেলা জানতেই শফী ফোন করে। আজ ওদের পানিকলের ফ্ল্যাটে তোলার কথা ছিল। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। নিশ্চয় খুব ভালভাবে চুকে বুকে গেছে।

'আমি শফী বলছি।'

'হ্যাঁ বল।'

'খবর কি?'

'খবর সব ঠিকই আছে। বুড়িটাকে পানিকলের ফ্ল্যাটে তোলা গেছে।'

'আর মা মেয়ে?'

'ওরা এদিক ওদিক কোথাও আছে।'

'পাওয়া যায়নি ওদের?'

'আনতে যখন যায়, ওরা তখন বাড়িতে ছিল না।'

'কোথাও তো বেরতেই পারে।'

'আমার সঙ্গে টক্কর দেবরা জন্য বেরিয়েছে।'

'তার মানে?'

'মা মেয়ে কোথাও লুকিয়েছে।'

'সে কি?'

'যতই লুকোক না, আমার খুঁজে বের করতে একদিন সময়ের বেশি লাগবার কথা নয়। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে গেলে এই যা।'

'কীসের গোলমেলে?'

'মা মেয়েকে গুণ্ডা দিয়ে তুলে আনতে হবে এই যা।'

'দেখো, শাবানার গায়ে একটু আঁচড় পর্যন্ত না লাগে।'

'ওর মায়ের এসব সাজিস।'

'ঠিক ধরেছ বড়ভাই। ওর মা আমার ওপর খুব ক্ষার।'

'বুঝেছি। সব বুঝেছি।'

'কিন্তু এত সহস হয় কী করে?'

'ঠিকই তো।'

'আমি ও মেয়েকে না পেলে কিন্তু আর বিয়ে করব না।'

'ও মেয়ের সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে রে ভাই। আমর ওপর সে ভার ছেড়ে দে না। আমি এখান থেকে বসহেঁ সব ব্যবস্থা করছি।'

'তোমার ওপর ভরসা আছে বড়ভাই।'

'কিচ্ছু ভাবিস না।'

'ভাবব না?'

'না।'

'কিন্তু ভাবনা যে এসে পড়ছে।'

'দাবিয়ে রাখ। খোশ মেজাজে থাক।'

'ঠিক আছে। রাতে আর একবার ফোন করব।'

'করিস।'

'খোদা হাফিজ।'

'খোদা হাফিজ।'

ফোন রেখে তেতলায় উঠতে থাকে শফীউল্লা। বড় ভাই বলেছে তাকে কিছু ভাবতে হবে না। সে ভাবে না। কেতাব পড়ে, ঘুমিয়ে, ঘরের ভেতর পায়চারি করে, শাবানার সঙ্গে আসছে বুধবার নিশ্চিত বিয়ে হচ্ছে এই সুখকল্পনা করে কাটাবে। মনে নিশ্চিন্তি তৈরি করবে।

দেখল দরজার সামনে জিয়াদ এসে দাঁড়িয়েছে।

জিয়াদের দিকে কটমট তাকিয়ে থাকল শফী।

জিয়াদ বলল, 'আমার কোনো দোষ নেই। মা মেয়েকে লিচুতলায় পাওয়া যায়নি। তবে বড়কর্তার নির্দেশে বুড়িটাকে পানিকলের ফ্ল্যাটে তুলে দিয়ে এসেছি। মালপত্রও সব গেছে।'

'বেশ করেছিস। বড় ভাইয়ের কথা মতো কাজ করে যা।'

'বড়কর্তার সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় যোগাযোগ রেখে চলেছি।'

'তুই যা, আমাকে একা থাকতে দে।'

জিয়াদ ফিরে যায়।

শফী বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কী কথায় সময় কাটাবে সে নিয়ে তার ভাবনা। হয়। একবার ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে কিনা। ভাবে, রাত হলে ঘুরে বেড়াবে। বেশ চিন্তামুক্ত হওয়া যায় এই ঘুরে বেড়ানোতে।

সেই কল্প বহিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে। যে কল্প বহিনের কল্পভাবনায় তার শিশুপুত্রকে গোরস্থানে কুড়িয়ে পেয়েছিল। আর সে শিশুকে নিয়ে সারা মেটিয়াবুরুজ ঘুরে বেড়িয়েছিল। এই ঘরে তাকে এনেছিল। তার সঙ্গে খেলেছিল। সেই কল্প বহিনের সঙ্গে তার শুলুকের সম্বন্ধ। সে শুলুক দেয়। আর সাতদিন সময় দেয় সেই শুলুকের সমাধান করতে। বেশ নিশ্চিন্ত থাকা যায় এই কল্প সম্পর্কে। সেই সম্পর্কের কথা ভাবতে শুরু করে দিল শফী। সেই আনারকলি শুলুক বহিনের সম্পর্কের কল্প ভাবনায় মেতে উঠতে লাগল। তার শিশুপুত্র সাঈদকে নিয়ে সে খেলা করতে পারবে। তাকে শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলতে পারবে।

আনারকলি বহিনের জন্যে মন কেমন করে ওঠে শফীর। কল্প ঘটনায় গিয়ে একটা শুলুক আনা যায়, আর সেই শুলুকের সমাধান খুঁজতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবে ভেবে বেশ কাটানো যায়। এটা একটা খেলা। এই খেলা এখন এই মুহূর্তে তার ভাল লাগবে। সে কোনো সমস্যায় পড়েনি, আদতে তার কোনো সমস্যা নেই বহিনের কাছ থেকে একটা করে শুলুক পাচ্ছে, আর দিনরাত সেই শুলুকের সমাধান খুঁজছে। খুঁজে পেয়ে সমাধান বলে আসছে। আবার একটা শুলুক নিয়ে আসছে কি সুন্দর এক মেতে থাকা। কি রোমাঞ্চকর এই অভিযান। এখন কল্প সম্পর্কে মেতে থাকা তার পক্ষে ভাল হবে। শাবানাকে নিয়ে তার মা শাহ্নাজ কোথাও পালিয়ে গেছে, এই বাস্তবতার মানসিক চাপ বহন করতে হবে না। বহন করবার কথাও নয়। বড়ভাই সব মুশকিল আসান করে দেবে। সে শুধু বিয়ে করবার মালিক, বিয়ে করবে। তার মাঝখানে কোথায় কি ঝামেলা পাকছে, সে সব দিকে তার তাকানো চলে না।

তবে শাবানার কথা তার খুব মনে পড়ে। শাবানার মুখ মনে পড়ে। শাবানাকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা অনুভব করে। নিজের মন আশ্বাস তৈরি করে আর কদিন পরে তো বিয়ে হচ্ছে, এত উতলা হওয়ার প্রয়োজন নেই। আবার উতলা না হয়েও পারে না শফী। কেন? জানে না। শাবানাকে দেখা অবধি মন ভাল নেই তার। তার মাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করবার শরিয়তি সুবিধে তৈরি করল শফী। শাহ্নাজের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মাত্র, ঘরে উঠেছিল মাত্র, কিন্তু তার সঙ্গে কাটায়নি সে। তাকে স্পর্শ করেনি, তার সঙ্গে মিলন হয়নি তার।

শাবানাকে তার মা কোথায় লুকিয়ে রাখল কে জানে। কোথায় কোনখানে অবহেলায় পড়ে আছে মেয়েটি। তার ভাবী বধূ। তার কিছু কষ্ট হলে শফীরও কষ্ট হবে।

বারান্দায় কীসের একটা শব্দ। যেন কে খেলনা নিয়ে খেলছে। শফী ঘরের ভেতর বসে ঠিক ধরতে পারে না। বারান্দায় শব্দটার প্রতি শফীর ঘন হয়ে আসে মন। উঠে পড়ে। ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। দেখে সাঈদ একটা খেলনা নিয়ে খেলছে। সেই কল্পশিশু। মুখে তার অদ্ভুত হাসি। সে এক আশ্চর্য শিশু। শফীর সে চেনা। শফীকেও চেনে শিশুটি। পেছনে এসে দাঁড়িয়ে শিশুটির আনমনে খেলতে থাকা দেখতে থাকে শফী। শফী হাসে। অদ্ভুত ভাল লাগা বোধ তৈরি হয় তার মধ্যে। শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়। তারপর তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোফে। কল্প ঘটনায় চলে যেতে থাকে সে।

বিবাহ অভিযান পর্ব

আগামী বুধবার শফীউল্লার বিয়ে। আয়োজন চলছে। নেমন্তন্ন শুরু হয়ে গেছে। বড় ভাই শওকত প্রবল উৎসাহে নেমে পড়েছে। সহযোগিতা করছে দু'জন ম্যানেজার, ওসমান আর জিয়াদ। আড়ম্বরের কোনো ত্রুটি না হয়। এ বাড়িতে যেভাবে ধুমধাম করে বিয়ে হয়, সেভাবেই বিয়ে হবে। সারা বাড়ি সাজানো হবে আলো দিয়ে। বিয়ে বাড়ি সাজানো হবে আলো দিয়ে। নেমন্তন্নতে কেউ বাদ না যায়। শফীকে কিছুই করতে হবে না। তার বিয়ে করার কথা, বিয়ে করবে। কন্যা প্রস্তুত হয়ে যাবে। এখন কন্যা কোথায়, আত্মগোপন করেছে কোন মহল্লায়, এসব জানার কোনো দরকার নেই শফীর। যেদিন বিয়ে, সেদিন কন্যা ঠিক প্রস্তুত থাকবে, বিয়ের আসরে পৌঁছে যাবে। সে-সব দায়িত্ব শওকতউল্লার। কন্যা তার লিচুতলার বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে, এ খবর শওকতের কাছে থাকলেও কোনো দুশ্চিন্তা নেই তার, আয়োজনে দ্বিধাও নেই।

কিন্তু মেটিয়াবুরুজের আকাশে বাতাসে ক্রমশ খবরটা ছড়ায়, কন্যা তার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথায় যেন আত্মগোপন করেছে। জনমানসে কৌতূহল, চাপা উত্তেজনা। জনমানস এক নতুন কিস্সার গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠেছে। মেটিয়াবুরুজের আকাশে বাতাসে সেই কিস্সার গন্ধের ঢেউ। জনমানস চাইছে, শাবানা যেন ধরা না পড়ে, আর শওকত বিফল হোক। এটা জনমানসের চাহিদা। জনমানসও তাই এই কিস্সার চরিত্র হয়ে উঠেছে। কলওয়ালা থেকে ম্যাটজি, ছোটখাটো ওস্তাগার থেকে সাধারণ কর্মচারী, চুকিবালি, ছোঁড়া, দোকানওয়ালা, হোটেলওয়ালা, ফিরিওয়ালা, হাটের মুটে, রিক্সাওয়ালা সবাই চাইছে শাবানাকে শওকতউল্লা খুঁজে না পাক।

জনমানস শাবানার আত্মগোপনের কিস্সা নিজেরা নিজেদের মতো করে তৈরি করে। তারা শাবানাকে মেটিয়াবুরুজের বাইরে কোথাও আত্মগোপন করতে বলে না। মেটিয়াবুরুজে থাকবে, অথচ শওকতের লোক তাকে খুঁজে পাবে না। কেন না শওকতের সঙ্গে শাবানা টক্কর দেবে এভাবে, জনমানস চাইছে। একেবারে মেটিয়াবুরুজ ছেড়ে চলে গেলে চলবে না। তাহলে মাঠ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হবে। শওকতের নাকের ডগায় থাকবে, অথচ শওকত তাকে খুঁজে পাবে না।

জনমানসের নিজস্ব কিস্সায় শাবানা বেরিয়ে এসেছিল এক রাতে, তার মায়ের হাত ধরে। জ্যোৎস্না রাত, কিন্তু মেঘে ঢাকা ছিল চাঁদ। সেই ছায়া ছায়া মৃদু আলোর ভিতর পথ চলছিল। ছায়া-অবয়বে তারা চলছিল। তাদের কেউ চিনতে পারছিল না। তারা জ্যোৎস্নার ছায়ার ভিতর মেটিয়াবুরুজের কোথায় হারিয়ে যায়। আর একটা গোপন কুঠরি পায়, সেই কুঠরিতে তারা সেঁদিয়ে যায়। সেই গোপন কুঠরিটা

অলৌকিক। বাস্তবে কখনো দেখা যায় না। অথচ সেই কুঠরিটা এই মেটিয়াবুরুজেই আছে। সেই কুঠরির ভেতর কন্যাকে সেবা করবার জন দাসদাসী আছে। এমনকী সশস্ত্র সৈন্যরা তাকে ঘিরে রাখে। সেই কন্যা অপরূপ সুন্দরী। তার হাসি আরো সুন্দর। সে একমাত্র আলমকেই ভালবাসে, আলমের গলায় মালা দিতে চায়।

আলম লুঙ্গি পরে ময়লা শার্ট গায়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ওস্তাগারের ঘরে কল চালায়, সেলাই করে। সবাই জানে আলম সেই আলম, কিন্তু জনমানসের চাহিদা যে আলম অন্যরকম। আসল আলম এই কিস্‌সায় হারিয়ে যায়। আলমও বিশ্বাস করে না, সে আলম, সে। তারও ইচ্ছা, সে আলম অন্য কেউ। জনমানসে আসল আলম অবহেলা পায়। ঝঞ্ঝাটও তার খুব একটা হয় না। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারে, নানাস্থানে যেতে পারে। সেও চায়, শাবানা এমন কোথাও লুকিয়ে থাকুক, যাকে শওকতের লোক ধরতে না পারে, সন্ধান না পায়। সেজন্য তাকে যদি কিছু করতে হয়, করবে। তার জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, প্রাণ দেবে। আসল আলমও জনগণের অংশ হয়ে যায়।

নাকি শওকত ওসমান আর জিয়াদকে দিয়ে খুঁজিয়েছে। মহল্লায় মহল্লায় টহল দিয়েছে, খোঁজখবর নিয়েছে, —কোথায় সেঁদোতে পারে মা-মেয়ে? কোনো হদিস করতে পারেনি তারা। বিফল হয়েছে। সব মহল্লায় খুঁজেছে, অথচ পেল না? জনগণ অলৌকিকতা পেল। নিশ্চয় জ্যোৎস্নালোক তাদের লুকিয়ে রেখেছে। নিশ্চয় রাতের অন্ধকার তাদের আশ্রয় দিয়েছে। মেটিয়াবুরুজের ভিতরে নিশ্চয় আর-এক মেটিয়াবুরুজ আছে, সেখানে কোথাও কোনো মহল্লায় কোনো গোপন কুঠরিতে আছে। তারা মানবী, তারা জিন পরি নয় যে উবে যাবে। আছে, মেটিয়াবুরুজেই আছে। মেটিয়াবুরুজ তাকে লুকিয়ে রেখেছে। শওকতের নাগালের বাইরে থাকবে।

জনগণ গান বাঁধল। অদ্ভুত কাহিনী কিস্‌সার গান। কন্যার অলৌকিক লুকিয়ে পড়ার গান মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। তারা তাদের মতো গল্প তৈরি করছে, কিস্‌সা তৈরি করছে। কেউ কেউ বলছে জ্যোৎস্নার ভিতর অদৃশ্য ঘোড়া তাদের নিয়ে গেছে। মেটিয়াবুরুজের কোনো এক গোপন কুঠরিতে তাদের পৌঁছে দিয়েছে। বিশেষ জ্যোৎস্নালোক ছাড়া কেউ তাদের দেখতে পাবে না। বিশেষ সময়ে, বিশেষ জ্যোৎস্নালোকে তাদের দেখা যেতে পারে। তারা মায়াবী ও অলৌকিক হয়ে দেখা দেবে।

সত্যি সত্যি শওকত ওসমান আর জিয়াদকে মেটিয়াবুরুজের মহল্লায় মহল্লায় ছানবিন করতে পাঠিয়েছিল। গত কাল রাতে। ওসমান গিয়েছিল একদিকে, জিয়াদ গিয়েছিল আর-একদিকে। তারা পাড়ায় পাড়ায় খবর নিয়েছিল। মা মেয়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে? খবর দাও। তার জন্য রুপেয়া পাবে। মেয়েকে তুলে আনার দায়িত্ব আমাদের। কোথায় আছে বল, কার বাড়িতে আছে বল। কেউ স্বীকার করল না, তারা মা মেয়ের সন্ধান জানে। যত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছে, তারা প্রত্যেকেই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে। যেন তারা মা মেয়ের হারিয়ে যাওয়া এই প্রথম শুনছে। যেন তারা এই মহল্লার লোক নয়, এই কিস্‌সা জানে না। জিয়াদ আর ওসমানকে তারা সব অপরিচয়ের চোখে দেখল। যাদের যাদের

কাছ থেকে মা মেয়ের খবর জিয়াদ আর ওসমান জেনেছে, যাদের যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, তারা যেন বহিরাগত, মেটিয়াবুরুজের কেউ নয়, এরকম ব্যবহার পেয়েছে তাদের কাছ থেকে।

এরকমটা কীভাবে ঘটল, শওকত বুঝে উঠতে পারে না। অথচ জিয়াদ আর ওসমানকে মহল্লার সবাই চেনে। শওকতের লোক বলে তাদের খাতিরও আছে। তাহলে এমন ব্যাপার ঘটল কেন? আসলে জনমানস এই ঘটনা নির্মাণ করেছে, তাই এই রকম। তারা চায়, মা মেয়ের সন্ধান ওরা না পায়।

সত্যি সত্যি জিয়াদ আর ওসমান মা মেয়ের সন্ধান করতে বেরিয়েছিল গত রাতে। চেনা লোকজন পেয়েছিল, তাদের চিনেছিল মহল্লার লোকজনও। কিন্তু মা মেয়ের ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। আকাশ থেকে পড়েছিল। জানলে নিশ্চয় বলত। তাদের কথা বিশ্বাস করেছিল ওসমান আর জিয়াদ। কেন না তারা খাতির করে পান সিগারেট খাইয়েছিল। সেলাম দিয়েছিল। শওকতকে এসে তারা জানালে শওকত ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। বুঝি এই মারে, সেই মারে। গালগাল করছিল। নিকম্মা, ঢেড়স। তারা মালিকের গালমন্দ হজম করেছিল। শওকত বলেছিল, 'আমি দেখছি, তোদের দ্বারা কিছু হবে না।'

তারপর শওকত ভাবতে লাগল, কী করা যায়। মুহূর্তে ভেবে পেল না কী করা যায়। নিশ্চিত করে জানল, সমস্যায় পড়েছে। কিন্তু বিশ্বাস আছে সমস্যা সে উৎরে দেবে। কেন না তার টাকা আছে। আর তার ইচ্ছাও আছে। শফীর কাছে ওয়াদা করেছে। তার হেরে যাওয়া চলবে না। সব আয়োজন পাকা হতে চলেছে, আর মা মেয়ের খোঁজ পাবে না? মেটিয়াবুরুজে যেখানেই লুকোক না কেন, ঠিক সন্ধান তাদের পাবে।

অমনি ফোন বেজে উঠল। 'কে, ছোটভাই?'

'হ্যাঁ, আমি শফী।'

'কী বলছ?'

'মা-মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল?'

'পাওয়া যাবে।'

'পেলে কি না বল।'

'না পাওয়ার কী আছে?'

'ওসমান আর জিয়াদ যে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ ওরা গিয়েছিল। ঘুরে বেড়িয়ে এসেছে।'

'সন্ধান পায়নি?'

'উতলা হয়ো না ভাই, ঠিক সন্ধান পাওয়া যাবে।'

'আমি কি নিজে খুঁজতে যাব?'

'ছি ছি একি বলছ। তুমি খুঁজতে যাবে মা মেয়েকে? খোঁজার লোকের অভাব পড়ল নাকি?'

'না, বেশ ঘুরে বেড়ানো যেত।'

'ঘুরে বেড়াতে পার। কিন্তু খোঁজ না। ছোট কাজ কোর না।'

'আমি তো রাতের বেলা ঘুরে বেড়াই মেটিয়াবুরুজের পথে পথে।'

'তা ঘুরে বেড়িও, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মা-মেয়েকে খুঁজতে যেও না।'

'বেশ, তাহলে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি?'

'হ্যাঁ, আসছে বুধবার তোমার বিয়ে। আর ঐ কন্যার সঙ্গে।'

'কন্যা কি আত্মগোপনের ধকল সইতে পারবে?'

'কেন?'

'অসুখ করবে না? রোগা হয়ে যাবে না?'

'তুমি কি তার জন্য খুব ভাবছ?'

'না ভেবে পারি না। উদ্ধারের সময় তার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত না লাগে।'

'ওসব ভেবো না।'

'তোমার ওপর তোয়াক্কা করে আছি।'

'ভরসা রাখো আমার ওপর।'

'কী ব্যবস্থা করছ? কীভাবে উদ্ধার হবে।'

'সে পরে বলব।'

কথা শেষ হয়ে যায়। ফোন রেখে দেয় শওকত। সে জানে, তাকে কিছু একটা কঠিন কাজ করতে হবে। আর খুব তাড়াতাড়ি। দু-তিন দিনের মধ্যে। কেন না আর পাঁচদিন বাকি আছে বিয়ে হতে। তার মধ্যে কামিয়াব হতে হবে। কিন্তু ভাবতে গেলে ঘুম পায় বড়।

২

হীরামন ড্রেসের অন্দরমহলে কথাটা পৌঁছেছে—মা মেয়ে পালিয়েছে। মেটিয়াবুরুজের কোন মহল্লায় কোন ঘরে লুকিয়েছে, কেউ বলতে পারছে না। কাজের মেয়ে ফারজানার মুখ থেকে অনেকটা শোনা। ফারজানা জনপদ থেকে শুনে এসেছে। তারা নাকি এমন এক অলৌকিক কুঠরিতে আছে, তাদের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হবে। বড় বউ সাকিলা, মেজবউ শবনম পরভিন এমনকী ননদ নাফিসা চাইছে, মা-মেয়ের সন্ধান না পাক। তাদেরই বাবা ও শ্বশুর খুঁজছে তাদের। তাদেরই চাচা আর চাচা শ্বশুরের সঙ্গে সেই কন্যার বিয়ে হবে, অথচ তারা বিফল হওয়ার বাসনায় আছে। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা, এই বুঝি ধরা পড়ে যায়। যেন তারা কোনো শয়তানের হাতে ধরা পড়ে যায়, এমনই তাদের উত্তেজনা। সব সময় এক গা-ছমছমানি ভাব তাদের।

শুনেছে জিয়াদ আর ওসমান খুঁজতে তাদের গত রাতে মহল্লায় মহল্লায় টহল দিয়েছে। নানা জিজ্ঞাসাপড়া করেছে। কিন্তু সন্ধান পায়নি। এই বিফলতা তারা পছন্দ করেছে। শবনমের সঙ্গে সাকিলা তাই নিয়ে কথা বলে এসেছে। যেন টিটকিরি করছে। ভুলেই গেছে তারা তাদের শ্বশুরের প্রতি টিটকিরি করেছে। নাফিসাও তাদের সঙ্গ দিয়েছে।

নাফিসা বলল, তার চোখ দিয়ে সারাক্ষণ কেন জল পড়ছে, জানে না। দুই তাদের ছোট ননদের মুখ ধরে চোখ দেখতে লাগল। সত্যিই চোখ দিয়ে অশ্রু য়ে পড়ছে। কেন? জানে না।

শবনম পরভিন বলল, 'ভেতরে ভেতরে কান্না আছে কি?'

নাফিসা বলল, 'তা তো জানি না।'

শবনম পরভিন হাসল। তার হাসির মধ্যে প্রকাশ পেল, এ মেয়ে এতই ছোট ভেতরের কান্না বোঝবার বয়েস হয়নি। তার জন্য বয়সে পোড় খেতে হয়, দ্ধ হতে হয়।

শবনমের হাসির অর্থ ধরতে পারল সাকিলা। কেন না তার যুবতী বয়েস।

নাফিসা বলল, 'হাসলে কী ভেবে?'

শবনম বলল, 'বড় হলে বুঝতিস।'

'আমি নাইনে পড়ি।'

'তুই এখন ছোট।'

নাফিসা বলল, 'শাবানাকে কি খুঁজে পাবে?'

শবনম বলল, 'জানি না।'

সাকিলা বলল, 'কিছুই জানি না।'

নাফিসার চোখ থেকে অনবরত অশ্রু গড়াচ্ছে এ কথাটা বাড়ির আর মেয়েদের য় পৌঁছল। নাফিসার মা জানল, দাদি জানল। কাজের মেয়ে ফারজানা জানল। প্রথমে মা কিসমত নাসিফার চোখের অশ্রু দেখতে এল। মুখ ধরে দেখল। ফিসার তুলতুলে মুখ, স্পর্শে ভাল লাগে। মাও হাসল আশ্চর্য রকম হাসি। প্রৌঢ়ার সর অর্থ আর এক রকম। তারপর এল দাদি নিগার বানু। সেও নাফিসার ধরে দৃষ্টি বিনিময় করল। দেখল চোখের অশ্রু। এবং বৃদ্ধা আর-একরকম সি হাসল। তারপর এল ফারজানা সেও দেখল। কিশোরী আর এক রকম হাসল। কিন্তু অশ্রুপাত হয়ে চলেছে কেন, কেউই কোনো কারণ খুঁজে পেল না। চোখে কিছু পড়েছে? কুঁটি বা বালি? নাফিসা জানাল কিছুই পড়েনি। অথচ অশ্রুপাত চ্ছ।

মা কিসমত দুশ্চিন্তায় পড়ল।

দাদি অদ্ভুত কথা বলল। বলল, 'দেখ কোথায় কী হারিয়েছিস, মনে নেই, চোখ তো জানে, সেই শোকে চোখ কাঁদছে।'

নাফিসা মনে করতে পারল না, কোনো কিছু হারিয়ে যাওয়ার কথা।

নিগার বানু বলল, 'পরে হয়তো মনে পড়বে।'

নাফিসা শবনমকে একা পেয়ে বলল, 'বল তো মেজভাবি, আমি কী হারিয়েছি?'

শবনম আকাশ থেকে পড়ল, 'আমি কি জানি, তুই কি হারিয়েছিস!'

'এখন মনে পড়ছে না?'

'হয়তো পরে মনে পড়বে।'

'ভেতরে কান্না নেই সত্যি?'

'মনে করতে পারছি না।'

'কি মন তোর? পরে হয়তো মনে পড়বে, কীসের জন্য কাঁদছিস তুই।'

'কিন্তু তুমি আমাকে বল, কন্যাকে কি খুঁজে পাবে?'

'তা তো জানি না।'

'খুঁজে পাওয়া উচিত হবে না।'

'ওরা তো খুঁজে পায়নি।'

'না খুঁজে পেলে ভাল হবে।'

বাড়িতে বাড়ির মেয়েরা কাজ করে, ওঠে বসে, চলাফেরা করে, আর ত নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে শাবানাকে খুঁজে পাবে কিনা তাই নিয়ে। ম তাদের বড় দুশ্চিন্তা। যদি খুঁজে পেয়ে যায়? এদিকে বিয়ের কেনাকাটা হচ্ছে। ন জায়গায় দাওয়াত পৌঁছচ্ছে। আত্মীয় কুটুম্বরা ফোন করে জানাচ্ছে। তারা হাস তাদের হাসির মধ্যে টিটকিরি আছে। মেয়েরা সে-সব সয়।

সাকিলা বলেই ফেলল, 'চাচাশ্বশুর এমন বিয়ে পাগল হয়ে গেল, পৃথিবী দুটো এমন দেখিনি।'

নিগার বানু, শফীর মা শুনল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

শবনম পরভিনের মন ভাল নেই। কিছুই ভাল নেই। শফী তাকে অপ করার দিন থেকে খুবই বেদনাহত হয়ে আছে। ঐ লোকটার পাগলামির ক নাসেরকে এ বাড়িতে হারিয়েছে শবনম। লোকটাকে ঘৃণার শেষ নেই শবনমে সে যদি পুরুষ হত, কিছু একটা করতো। এ বাড়িতে নারীদের কোনো অধিকা নেই। সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আদৌ কোনোদিন ক্ষমতা ছিল কি? ি না। বাড়িতে পুরুষরা যা করবে দেখে যেতে হবে, কোনো প্রতিবাদ করা য না। এসব কথা ভেবে শুধু কান্না পায় শবনমের।

রাত আটটার পর শবনম তেতলার ঘরে ছিল। পাশের ঘরে ছিল নাফি হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যায়। শবনম বেরিয়ে এসেছিল বারান্দায়। সেখানে নাফি সঙ্গে ধাক্কা লাগে।

শবনম নাফিসাকে বলল, 'এখনও কাঁদছিস বোন?'

'হ্যাঁ, চোখ কাঁদছে, আমি কাঁদছি না।'

শবনম গ্রিলে মুখ ঠেকিয়ে বাইরের দিকে তাকায়।

নাফিসা বলল, 'কী দেখছ?'

'অন্ধকার দেখছি। তুই দেখবি?'

'দেখব।'

'তবে দেখ।'

নাফিসাকে কাছে নিয়ে দাঁড়ায় শবনম পরভিন।

নাফিসা বলল, 'এই যা, ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী ভুলে গিয়েছিস?'

নাফিসা ফিসফিস করে বলে ওঠে, 'নাসের মাস্টার তোমাকে একটা চিঠি য়েছে, দিতে ভুলে গেছি।'

শবনম রোমাঞ্চিত হয়। নাসের তাকে চিঠি লিখেছে। তার চিঠির উত্তরে চিঠি য়েছে। 'কোথায় চিঠিটা রেখেছিস?'

'আছে সে।'

'কোথায়?'

'বইয়ের ব্যাগের ভেতর।'

'কেউ জানে না তো?'

'না।'

'চিঠিটা এনে দে।'

'এখন কী করে আনব। এখন তো অন্ধকার। আলো আসুক।'

কিন্তু শবনমের তর সইছে না। ভেতরে ভেতরে রোমাঞ্চিত হচ্ছে। অনেকদিন র নাসেরের আবার চিঠি। কী লিখেছে নাসের? পড়বার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। ন্ত চিঠিটা হাতে নিয়ে বুকের কাছে ধরলে তার ভাল লাগবে। কিন্তু নাফিসা র দেবে বলছে কেন? আলো এলে দেবে বলছে কেন? এখনই এনে দিক। ন পড়তে না পারলেও চিঠিটাকে স্পর্শ করবে, বুকে চেপে ধরবে। পরে না আলো এলে পড়বে। চিঠিটা পড়বার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে? ে সারা রাত যদি আলো না আসে? এমন তো প্রায়ই হয়ে থাকে। যদি কেবল ন্ট হয়? কিন্তু চিঠিটাকে এখনই পেতে চায়। অন্ধকারে নাফিসাকে পেছন থেকে ড়িয়ে ধরে। 'ও বুবু, চিঠিটা এনে দে না।'

'এই অন্ধকারে কীভাবে আনব?'

'আমি সঙ্গে যাচ্ছি। হাতড়ে হাতড়ে আনতে হবে। পারবি?'

'তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

'বলছি তো যাব সঙ্গে। পারবি না?'

'চল দেখি? একটু আলো নেই? একটা দেশলাই?'

'না। সব তো নীচের ঘরে।'

'আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি।'

'তবে চল।'

নাফিসার কোমর পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে রাখে, আর নাফিসা অন্ধকার ড়ে যেতে থাকে। বারান্দা পেরিয়ে ঘরের চৌকাঠ পেরয়। অদ্ভুত খেলা। মজা য় দুজনে। হাসতে থাকে দুজনে। অন্ধকার ঘরের ভেতর হাঁটে নাফিসা। এটা টায় ধাক্কা লাগে। এটা ওটা পড়ে যায়। নাফিসা হাতড়ায়। নীচু হয়। শবনম র গায়ে গা লাগিয়ে থাকে। নাফিসা ব্যাগের অবস্থান খুঁজে চলে। ব্যাগটা যেখানে খেছিল, সেখানে এসেছে তো? কিন্তু হাতড়েও পায় না। না পাওয়ার জন্য হাসি

পায় নাফিসার। ভাবি তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আছে, ভঙ্গির স্পর্শে সু
পায় আরো।

'হাসছিস কেন, খোঁজ?'

'খুঁজছি তো।'

আর একটু অন্য জায়গায় গিয়ে খোঁজে। না খুঁজে পাওয়াতেই যেন তার আনন্দ
যেন এই খোঁজার অভিযান অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলুক। আর মেজভাবি তা
এমনভাবে জড়িয়ে থাকুক। এটা তার ভাল লাগে। জানে, অথচ মেজভাবি চিঠি
পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। হাসি পায়। খল খল করে হাসে। 'ও ভা
আমার যে চোখ থেকে আর পানি পড়ছেনি, হাসছি।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

অন্ধকারে শবনম নাফিসরে চোখ ছুঁতে যায়। মুখের ভেতর আঙুল ঢুকে যা
তারপর চোখ পায়। সত্যি শুকনো চোখ। 'কি করে হল?'

'হাসছি যে।' খল খল করে হেসে ওঠে নাফিসা।

'নে খোঁজ।'

'খুঁজছি গো।'

হামা দেয় নাফিসা। পেছু পেছু নাফিসাকে ধরে শবনমও হামা দেয়। 'তুই খুঁজছি
না, ইচ্ছে করে দেরি করছিস।'

'তুমি কি করে জানলে?' হেসে ওঠে নাফিসা।

'ওমা তোর পেটে পেটে এত?'

'এই তো পেয়েছি।'

'দে চিঠিটা।'

'ব্যাগ পেয়েছি। চিঠিটা—'

'মেরেই ফেলব, দেরি করলে।'

'আমাকে ধরে রাখো।'

'এই তো ধরে আছি।'

'পাচ্ছি না কেন?'

'পেতেই হবে তোকে।'

'আমার কোয়েশ্চেন পেপারের মধ্যে মিশে গেছে।'

'স্পর্শে বুঝতে পারবি অন্যরকম।'

'পেয়েছি, নাও।'

নাফিসার হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নেয় শবনম। একটা খাম।

তারপর ওরা একে অপরকে ধরে বারান্দায় ফিরতে থাকে। বারান্দায় খানিক
বাইরের আলোর আভা আছে। নিজেদের ছায়া-অবয়ব দেখতে পায় তারা। শব
চিঠিটা হাতে ধরে চেপে ধরে বুকে। যেন হু হু করে কেঁদে ফেলবে এখনই

৩

ধানখেতি বস্তির সমস্ত মানুষ বোবা কালা হয়ে গেছে। কেউ ভিন পাড়ার লোক এসে যদি শুধোয় মা মেয়েকে এখানে কোথায় রেখেছে, জান নাকি? সকলে ব্যা-ব্যা করবে। কেউ মুখ খুলবে না। ধানখেতি বস্তির সাধারণ মানুষ দরিদ্র বটে, কিন্তু তাদের মন আছে। মানুষ হিসেবে যে সাচ্চা, এটা প্রমাণ দেওয়ার বড় একটা সুযোগ পেয়েছে তারা। তারা কেউ ঘুড়ির কর্মচারী। কেউ কেউ কাম করে ওস্তাগারের দলিজে। কেউ কেউ মেয়েরা চুকিবালি। কেউ কেউ মেয়েরা ঘুড়ি শিল্পের কাঠি বানায়। কেউ কেউ আছে জুয়োর আড্ডা বসায়। দু-চারজন মাস্তান আছে। তাদের সেরা মাস্তান রুস্তমকে নিয়ে তাদের গর্ব। পাড়ায় মাস্তান না থাকলে বল ভরসা পাওয়া যায় না। বিপদে-আপদে রক্ষা করবে কে? অন্য পাড়ার মাস্তান এসে মেরে যাবে না? পাড়ার বউ বেটিদের তুলে নিয়ে যাবে না?

লোকজন বউ বেটি সকলেই সর্তক মা-মেয়েকে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে। অনেকদিন পরে তারা একটা কাজের মতো কাজ পেয়েছে। শফী কিছুতেই মেয়েটাকে বিয়ে করতে না পারে। প্রতিটি ঘরের মানুষ তাই উত্তেজনা বোধ করে। চুপি চুপি খোঁজ নিয়ে থাকে, মা মেয়ে ঠিক আছে তো? সুরক্ষিত আছে তো? তাদের ঠিক থাকার খবর ফিস ফিস করে চালাচালি করে।

গতকাল রাতে জিয়াদ এসেছিল মা-মেয়ের খোঁজে। জিয়াদ যাদের যাদের জিজ্ঞেস করেছে মা-মেয়ের সন্ধান, প্রত্যেকেই না বলেছে, যেন তারা এই প্রশ্নে আকাশ থেকে পড়েছে। কিছুই জানে না তারা। জিয়াদ ঘুরে বেড়িয়েছে রাস্তায় রাস্তায়, বস্তির গলিতে গলিতে। ঘরের ভেতর থাকা বউ বেটি এ দৃশ্য দেখে নীরবে মুখ টিপে হেসেছে। চাপাস্বরে মুখ খিস্তি পর্যন্ত করেছে।

রাতে রুস্তম মাস্তান এসেছিল মা-মেয়ের খোঁজ নিতে। মায়ের পা ছুঁয়ে বলে গেছে, 'জান যায় সেও ভি আচ্ছা, বহিনকে নিয়ে যেতে দেব না।'

মা-মেয়ের খোঁজ পেলে মেয়েকে তুলে নিয়ে যেতে চাইবে শওকতের লোক, তার জন্য প্রতিরোধ চাই, এই প্রতিরোধ চাইছে বস্তির মানুষজন। হয়তো সংঘর্ষ হবে। হয় হোক প্রাণহানি। 'জান যায় সেও ভি আচ্ছা, বহিনকে নিয়ে যেতে দেব না।' রুস্তম মাস্তানের কথার প্রতিধ্বনি সবার বুকের মধ্যে বাজতে লাগল। পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছে, পাড়ার দায়িত্ব তাকে বাঁচানোর। পাড়ার কোনো ইজ্জত নেই? মা-মেয়েকে তুলে নিয়ে গেলে পাড়ার ইজ্জত থাকবে? পাড়ায় কি কেউ ব্যাটাছেলে নেই? না কি পাড়ার সবাই ভয়ে ইঁদুরের গর্তের মধ্যে ঢুকে আছে? কে আছিস, মাইকে লাল, আয়! বহিনকে তুলে নিয়ে যেতে এলে টক্কর লাগবে। জান লিব, না হয় জান দিব।

অনেক রাতে শফীও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বস্তির ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যেমন মালিকের বাতিল ঘোড়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, তেমনটা মনে হয়েছিল সকলের। সবাই দেখে চাপা হাসি হেসেছিল। মন্তব্য করেছিল, 'পাগল!'

জুয়োর আড্ডার লোকজন সারারাত জুয়ো খেলেছে। কিন্তু পালা করে জুয়ো খেলেছে। একদল খেলেছে, একদল পাড়ায় পাহারা দিয়েছে। রুস্তম মাস্তানের হুকুম, তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। কেন না জুয়োর লোকেরাই রাত জাগে, তারাই পাহারা দিতে পারবে।

মা-মেয়ে নিয়ামতের বিছানায় শোয়। আর নিয়ামত শোয় ঘরের বাইরে চিলতে বারান্দায়। রুস্তম তাকে একটা বাঁশি দিয়ে গেছে, গড়বড় বুঝলেই যেন শুধ্‌ধু সে বাঁশি বাজায়। রুস্তমের লোকজন তৈরি থাকে সব সময়, তারা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন শুরু করে দেবে। নিয়ামত নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারে তাই। মা মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছে সে শুধু। রক্ষা করার দায় পাড়ার সকলের।

মা আগে ঘুমোয় না। মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে তবে ঘুমোয়। মেয়ের শিয়রে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঘুম পাড়ায়। মেয়ে ঘুমলে তবে মা ঘুমবে। বস্তির রাস্তায় কুকুর ডাকে, মা ভয় পায়। মেয়ে ভয়ে হাত চেপে ধরে মায়ের। মেয়েকে অভয় দেয় মা, 'কিছু ভয় নেই, আমরা তো আছি।'

বাইরে কোথাও ভোঁ বাজল। গার্ডেনরিচ কারখানায় ভোঁ বাজে।

মেয়ে বলে, 'মা কটা বাজে?'

মা বলল, 'বারটার ভোঁ বাজল।'

'বারটা? এত রাত হয়েছে?'

'রাত হয়েছে, এবার তুই ঘুমা।'

'ঘুম যে ধরছে না।'

'চোখ বুজে রাখলে আপসে ঘুম আসবে।'

'আমার কপালে হাত বুলিয়ে দাও।'

'এই তো দিচ্ছি।'

মা-মেয়ের ঠিক ঠিক ঘুম হয় যাতে, বস্তিতে মদ খেয়ে এসে স্বামীর বউ পেটানো কিছুদিনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে রুস্তম। রাত বারোটার পর নিশুত নিদ্রাপুরী হয়ে ওঠে ধানখেতির বস্তি যেন। জায়ে জায়ে চুলোচুলি, শাশুড়ি বউয়ে খিটিমিটি যেন বন্ধ থাকে। মা মেয়ে অন্য পাড়ার মেয়ে, এসব করলে নিজের পাড়ার ইজ্জত যাবে। কুটুম্বের কাছে মান থাকবে না। শিশুদেরও অকারণে মারে না মায়েরা, যাতে করে চিল চিৎকার করে কেঁদে না ওঠে। পাড়ার কুকুরদেরও খেতে দিতে হয়। রাতের বেলা কুকুর না কাঁদে। কুকুরের কান্না অমঙ্গলজনক।

এক সময় মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত আলোয় মেয়ের মুখ দেখে মা। কি সুন্দর মেয়ে। যেন রাজকন্যা। কি রূপ তার। বুকের ওপর রাখা হাতটা সরিয়ে নামিয়ে দেয়। নিজেরও ঘুম পায়। হাই ওঠে। কিন্তু ঘুমতে পারে না। দুশ্চিন্তায় ঘুমতে পারে না। কদিন ধরেই ধকল যাচ্ছে।

ঘুমিয়ে পড়লে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে। যেন মেয়ে পাশে নেই। ঘুমের মধ্যে

হাতড়েও মেয়েকে পায় না। পরে ঘুম ভাঙলে হাতড়ে দেখতে পায় মেয়ে পাশেই শুয়ে আছে। নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে।

বিছানা থেকে উঠে জল খায়। বাইরে কীসের খুট করে শব্দ হয়। শাহনাজ সর্তক হয়ে ওঠে। কিছু নয়, ঘরের ভেতর ইঁদুর চলাফেরা করছে। আবার শুয়ে পড়ে মা। আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

পালা করে জুয়োর লোক পাড়ায় পাহারা দেয়। লাঠি দিয়ে লাইটপোস্টে মারে। ঠং ঠং শব্দ হয়। যেন তারা ডিফেন্স পার্টি। যেন তারা চোর পাহারা দিচ্ছে। অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই চোর আছে। যারা আজ চুরি করতে যায়নি, জুয়ো খেলতে এসেছে। এরা পাড়ারই চোর। পাড়ায় চোর থাকা ভাল। কেন না পাড়ায় চুরি হবে না। পাড়ার চোররা কখনো নিজের পাড়ায় চুরি করে না। ধরা পড়লে মান থাকবে না। এমনই তারা সৎ ও বিশ্বস্ত।

সর্তক থাকে বউ বেটিরাও। তারা নাকি বেপাড়ার লোকের পায়ের শব্দ পাড়ার লোকের পায়ের শব্দ আলাদা করতে পারে। বেপাড়ার লোকের পায়ের শব্দ রাস্তায় বাজছে কিনা সর্তক থাকে, উৎকর্ণ থাকে। পাড়ার বউ বেটিদের ঘুম ছমকে ছমকে ভেঙে যায়। রাস্তায় পথচারীরা সারাক্ষণই যায়। কেন না কারখানায় কাজ করা লোক কারখানাতে যাওয়া ও ফেরার জন্য এই বস্তির ভেতরের সর্টকাট রাস্তা ব্যবহার করে। তাদের চেনা পদশব্দ। তারা প্রতিদিনই যায় আসে। অন্যরকম পদশব্দ হচ্ছে কিনা, সতর্ক থাকে। বেশি সতর্কতার জন্য পদশব্দে ঘুম ভেঙে যায়, শোনে বেখাপ্পা পদশব্দ কি না। বোঝে শওকতের লোক মা-মেয়ের সন্ধান পায়নি, তবুও সাবধানতার মার নেই। সতর্ক থাকে।

পাড়ার লোক রাতের সময় চেনে। কেন না ঘণ্টায় ঘণ্টায় কারখানায় ভোঁ বাজে। আর গঙ্গায় জাহাজ স্টিমার ভোঁ বাজায়। কারখানার ভোঁ আর জাহাজ স্টিমারের ভোঁয়ের তফাৎ তারা বোঝে। কারখানার ভোঁ টানা বাজে। জাহাজ স্টিমার ভোঁ করে থেমে যায়। কাছেই বিচালি ঘাট। সেখানে লঞ্চ ফেরি সার্ভিস আছে। ওপারে নাজিরগঞ্জে যায়। ওপারটা হাওড়া, এপারটা কলকাতা। মাঝখানে গঙ্গা। কাছেই নবাববাড়ি, ইমামবাড়ি। পাড়াটা নবাবের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল।

একটু পরেই ঘুমে অচৈতন্য মেটিয়াবুরুজ। ধানখেতিও নিশুত। শুধু জুয়োর লোকরা তখনো পাহারা দিয়ে চলেছে।

নিয়ামতের ঘরের ভেতর মা মেয়ে নিশিন্তে ঘুমচ্ছে।

৪

ছোঁড়া, যার নাম আসাদ, সে শাবানার প্রথম পাতানো ভাই। সেই ছোঁড়ার কাছে পৌঁছে গেছে শাবানার আত্মগোপনের কিস্‌সা। তাকে খুঁজছে শওকতের লোকজন। ধরা পড়লে বহিনের বিপদ হবে। ছোঁড়ার বয়েস বছর বারো। বিধবার সন্তান। ওস্তাগার বাড়িতে ফাইফরমাসের কাজ করে। বেশি কাজ চুকিবালিদের ঘরে ঘরে

মাল পৌঁছে দেওয়া, আর ফিনিস মাল ফিরিয়ে নিয়ে আসা। আসাদের সঙ্গে শাবানার সেই সূত্রে ভাইবোনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মেটিয়াবুরুজের আকাশে বাতাসে এই খবর বয়ে বেড়াচ্ছে। আসাদেরও কানে পৌঁছে যায়। আসাদ কি স্থির থাকতে পারে? যেমন করে হোক বহিনের সঙ্গে দেখা করবে সে—বহিনের বিপদের দিনে বহিনের পাশে দাঁড়ানো তার কর্তব্য।

সকালবেলা আর ওস্তাগারের দলিজে যায় না আসাদ। বহিনকে খুঁজতে বেরলে কিন্তু কোথায় আছে কিছুই জানে না। লিচুতলায় নেই, জানে আসাদ। তবুও লিচুতলায় যায় সে। লিচুতলার বাড়ি শুনশান। দরজায় তালাচাবি। কী করবে এখন কোথায় যাবে সে? মনে পড়ে যায় কানার কথা। যে কানা টিকিট ব্ল্যাক করে 'খাতুন মহল' সিনেমায়। যে কানা কিনা শাবানাকে বহিন পাতিয়েছে। তার কাছ থেকে খবর পাওয়া যেতেও পারে।

কানা বলল, 'বহিনকে আজ রাতে খুঁজব।'

'আমি কার কাছে গিয়ে খুঁজব? কে খোঁজ দিতে পারে?'

'চলে যা জুয়োর আড্ডায়, দাউদের কাছে। সে খোঁজ দিতে পারে তোকে। কিন্তু চুপি চুপি। তুই যে বহিনের পাতানো ভাই, এই পরিচয় দিবি তাকে। না হলে পেট থেকে একটাও বাত খিঁচতে পারবি না।'

'আর সে যদি না বলতে পারে?'

'তাহলে পকেটমার শাহাজাদার কাছে যাবি।'

'কোথায় পাব তাকে?

'বাসেই পেয়ে যাবি। বাসে পকেট মারে।'

'সে যদি বলতে না পারে?'

'তাহলে যাবি রুস্তম মাস্তানের কাছে।'

'আরিব্বাস, রুস্তম মাস্তান?'

'ভয়ের কি, তুই তো বহিনের ভাই, তোর ভয় কি, বরং তোকে খাতির করবে।'

'বহিনের খোঁজ পাব?'

'দেখ, পেলেও পেতে পারিস। কিন্তু সাবধানে, কেউ বুঝতে না পারে।'

প্রথমে ছোঁড়া গেল দাউদের জুয়োর আড্ডায়। দাউদ তখন ঘুমচ্ছিল। সে যখন শুনল বহিনের খোঁজে এসেছে, মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, 'ভাগ, বহিন ফহিন কাউকে আমি চিনি না।' শওকতের লোক ভেবেছে ছোঁড়া দিয়ে সন্ধান করতে পাঠিয়েছে। রিস্ক নেওয়া চলবে না। অথচ জুয়োয় রিস্ক লাগে, কিন্তু জীবনে নয়।

চলতে চলতে পা লুটিয়ে পড়ল ছোঁড়ার, বাসের মধ্যে পেয়ে গেল শাহাজাদাকে। কিন্তু শাহাজাদা কিছুতেই মুখ খুলবে না। তারও সন্দেহ, এ নিশ্চয় শওকতের চর। বহিন কোথা আছে যদি বলে দেয়, আর শওকতের লোক পৌঁছে যায় তার কাছে! এমন অন্যায় কাজ তার দ্বারা হবে না। রুস্তম মাস্তান পিটিয়ে কিমা বানিয়ে

দেবে তাহলে। 'যা বে তোর বহিন কোথা আছে, আমি কি জানি? মেরে খাল খিঁচে দেব।'

ছোঁড়া চলল, চলতে লাগল। মাস্তান রুস্তমের কাছে। রুস্তম তখন নাস্তা খাচ্ছিল।

রুস্তমের এক সাগরেদ সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'কে বে, কে এসেছে?'

'একটা আধলা দেখা করতে এসেছে।'

'কে সে?'

'চিনি না। বলছে তোমার সাথে দেখা করতে চায়।'

'কী বলছে কি?'

'কিছুই বলছে না।'

'পাঠিয়ে দে।'

রুস্তমের সাগরেদ ছোঁড়াকে রুস্তমের কাছে নিয়ে যায়।

রুস্তমের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ছোঁড়া।

রুস্তম একবার তাকাল ছোঁড়ার দিকে। 'কি রে, বাত কি?'

'বহিনের সাথ দেখা করব।'

'কে বহিন তোর?'

'শাবানা।'

'কোন শাবানা?'

'লিচুতলায় ঘর, যাকে শফী বিয়ে করতে চায়। যে লুকিয়ে আছে, যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ চোখে ছোঁড়াকে দেখল রুস্তম। তারপর বলল, 'নাস্তা খাবি আয় লেড়কা।'

রুস্তমের পাতে পড়ে ছোঁড়া নাস্তা খেল।

তারপর রুস্তম তার এক সাগরেদকে ছোঁড়ার সঙ্গে দিল, যে তাকে তার বহিনের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। ছোঁড়া চলে গেল।

রুস্তমের এক সাগরেদ বলল, 'ওস্তাদ, এ লেড়কা যদি শওকতের চর হয়?'

'আঁখ দেখেছিস এ লেড়কার? এমন আঁখ যার সে ক্যাচড়া কাম করতে পারে না। মেরা বিশ্‌ওয়াস এ সাচ্চা লেড়কা।'

অতএব ছোঁড়া পৌঁছে গেল শাবানার কাছে।

শাবানা ছোঁড়াকে পাশে বসিয়ে গল্প করতে লাগল। সে এই কদিন যে-সব আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছে, সে-সব সবিস্তারে তাকে বলতে লাগল। অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন। সাপ, মাছ আর উড়ন্ত ঘোড়াদের সব কাহিনী। যারা তাকে দেশান্তরে নিয়ে গেছে। আর অদ্ভুত সব ফলমূল খাইয়েছে।

সে সব গল্প শুনতে শুনতে ভাইটি পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে ভাল করে বিছানায় শুইয়ে দেয় শাবানা। তারপর তার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

ছোঁড়ার ঘুম যখন ভাঙল, তখন বিকেল।

ছোঁড়াকে শরবৎ খাওয়াল। ফিরনি খাওয়ায়।

শাবানার সময় কাটানোর সঙ্গী দেখে সকলেই খুশি। শাবানাকে হাসতে দেখল সকলে। সকলে তাকে বিষণ্ণ বিমর্ষ দেখে আসছিল। যেন মেয়েটা হাসতে ভুলে গেছে। যেন মেয়েটা হাসতে জানে না। কোনোদিন হাসেনি।

ধানখেতির বউবেটিরা ভালমন্দ খাবার করলে কন্যাকে খেতে দিয়ে যায়।

মা তার রুমালে সরু সূচ দিয়ে ফুল তোলে। তারও সময় কাটে বেশ।

সন্ধ্যার আগে ছোঁড়া ফিরে যাবে। তার আগে তারা কড়ি খেলতে লাগল। একবার ছোঁড়া জেতে, একবার শাবানা জেতে। অদ্ভুত তারা হাসতে হাসতে খেলে।

মা বলল, 'অত হাসিস না মা।'

'কেন?'

'আমার ভয় করে।'

'ভয় করে? কেন?'

'কেন জানি না। দুশমনের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।'

'একটু হাসলাম। বেশি তো হাসিনি।'

মা ভয়ে শিউরে শিউরে উঠছে। এই মেয়েকে দুশমনের হাত থেকে কোথায় লুকোবে? ভয় হয়, এখানে কি তেমন সুরক্ষিত? হীরামন ড্রেস পরিবারের লোকজন সত্যিই কি তাদের সন্ধান পাবে না? মায়ের মন শঙ্কায় দুলে ওঠে। ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়। মেয়ের অত ভয় নেই। মেয়েকে যারা রক্ষা করছে, বরং তাদের ভয় বেশি। মেয়ে আনন্দে আছে, ফুর্তিতে আছে। ছোঁড়ার সঙ্গে কড়ি খেলে কাটাচ্ছে।

মা বলল, 'ছোঁড়া, সন্ধে হতে যে চলল, এবার যাবি না?'

ছোঁড়া বলল, 'যাই।'

মেয়ে বলল, 'না, আর একটা দান খেলতে হবে।'

আর-এক দান খেলতে শুরু করল তারা।

মেয়ের রকম দেখে হাসি পেল মায়ের।

তারপর খেলা শেষ।

ছোঁড়া এবার ফিরে যাবে।

ছোঁড়া বিদায় নিয়ে চলে যেতে যাবে, এমন সময় শাবানা তার হাত টেনে ধরে। 'তোর চোখ দুটো কি সুন্দর রে।' ছোঁড়ার মুদিত দুটি চোখের পাতার ওপর পর পর দুটি চুমু খায় কন্যা।

ছোঁড়া ফিরে গেল।

ছোঁড়া চলে যাওয়ার পর মা বলল, 'ছোঁড়ার ওপর এত মায়া বাড়াচ্ছিস কেন?'

'ভাল লাগে আমার। আমার ভাই নেই, ও আমাব ভাই।'

মা কিছু বলল না।

ভাই চলে যেতে বোনকে বিষণ্ণ বিমর্ষ দেখল মা।

মা মেয়ের হাসি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কখন হাসে, দেখবে। তবে মায়ের মন ভাল হবে। একটু আগে হাসছিল বলে অভিযোগ করেছিল, এখন হাসি দেখতে চাইছে। অন্তত মুখে প্রসন্নতা ভরে থাকুক। কে জানে, এই মেয়েকে ধরে রাখতে পারবে কি না। শফীর নজর পড়েছে। শফী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। পাগল একটা লোক। এখানে শাবানাকে লুকিয়ে রেখেছে শুধু, আত্মরক্ষা করার শক্তি কতটুকু আছে তার? তবে ধানখেতি তাকে আগলে রাখতে চায়। প্রাণ থাকতে তারা মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে দেবে না। ধানখেতির ঘরে ঘরে সেই সতর্কতা, প্রতিরোধ। পথে পথে সে সতর্কতা, প্রতিরোধ। মেটিয়াবুরুজের জনগণ চাইছে, এই লড়াইয়ে শাবানা জিতে যাক। জনগণের প্রত্যেকের জয় হবে। শাবানা শফীর হস্তগত হলে মেটিয়াবুরুজের জনগণের হার হবে। এমন পরাজয় আখ্যানের কোনো পাঠকই চায় না। পাঠকদেরও অখুশি করা হবে। ফলে পাঠকের চাহিদার কথা, রচনাকারের মাথায় রাখতে হচ্ছে। কিন্তু ঘটনা কী ঘটবে, তাতে রচনাকারের হাত নেই।

মা দেখল মেয়ে বসে বসে কাঁদছে।

মা বলল, 'কি হয়েছে মা তোর, কাঁদছিস কেন?'

মেয়ে কিছু বলে না, কেঁদেই চলে।

'বল, কী ভেবে কাঁদছিস?'

তবু কিছু বলে না মেয়ে, কেঁদেই চলে।

'কেন কাঁদছিস বলবি তো। মা হই, মাকে বলবি না?'

'ভাইটির জন্য কাঁদছি। এতক্ষণ ছিল, একসঙ্গে খেলেছি। ও চলে যাওয়ার পর থেকে কান্না পাচ্ছে।'

'যদি আপন ভাই হত!'

'ও কথা বোলো না মা, ও আপন ভাইয়ের বাড়া।'

'ও আবার আসবে দেখবি।' মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলোয় মা। তাকে শান্ত করতে চায়, তার কান্না থামাতে চায়। মেয়ে তেমনি কেঁদে চলে ভাইটির জন্য।

৫

চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইব্রাহিম অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরলেন। এবং সিরিয়ার দিকে চলতে লাগলেন। যাত্রাপথে খাজানায়ে ওজা নামক স্থানে গিয়ে দেখলেন

এক দৃশ্য, বহু লোকজন মিছিল করে চলেছে, সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে আছে তারা। তারা এক ময়দানে সমবেত হচ্ছে। কি উদ্দেশ্যে তারা জমায়েত হচ্ছে, কিছুই জানেন না ইব্রাহিম। ইব্রাহিম তাদের মধ্য থেকে একজনকে শুধোলেন, 'কোথায় চলেছেন, বলবেন কি?'

আগন্তুক বলল, 'এই দেশের বাদশার মেয়ে অপরূপ সুন্দরী, সারা পৃথিবীতে তার রূপের তুলনা নেই। আমরা হলাম এক এক দেশের রাজা বা রাজপুত্র, আমরা তার পাণিপ্রার্থী হতে চলেছি। কিন্তু কাউকেই রাজকুমারীর পছন্দ হচ্ছে না বিশেষ। এখন আমরা চলেছি তার স্বয়ংবর সভায়, দেখা যাক কি হয়।'

স্বয়ংবর সভার কথা শুনে ইব্রাহিম তাদের সঙ্গে চলতে লাগলেন। ময়দানে পৌঁছে ইব্রাহিম ময়দানের এক কোণে গিয়ে বসলেন। তাঁর কোনো ভাল পোশাক ছিল না। দীন দরিদ্র বেশ তাঁর। এক সময় রাজকুমারী সত্তর জন সহচরী নিয়ে ময়দানে এলেন। তাঁর মাথায় সোনার মুকুট আর মুখে সোনালি মুখোশ। তিনি সবাইকে দেখে যেতে লাগলেন। যখন ইব্রাহিমের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন দেখতে পেলেন, ইব্রাহিমের কপালে নূর চমকাচ্ছে। এই নূর ইব্রাহিমের মোহাম্মদীর অংশ।

ইব্রাহিমকে দেখে রাজকুমারী প্রেমে পড়ে গেলেন। রাজকুমারী তাঁর মুকুটখানা খুলে ইব্রাহিমের কোলের ওপর রাখলেন। সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল। রাজকুমারী স্বামী পছন্দ করেছেন।

রাজপুরুষরা ইব্রাহিমকে বাদশার কাছে নিয়ে গেল। বাদশা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলনে, 'মা, এমন গরিব হতদরিদ্র স্বামী তোমার পছন্দ?'

রাজকুমারী জানালেন এই পুরুষ তাঁর স্বামী হবেন।

ধুমধাম করে ইব্রাহিমের সঙ্গে রাজকুমারী শায়রার বিয়ে হয়ে গেল।

কিছুদিন পর ইব্রাহিম মনস্থ করলেন, সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তিনি।

বিবি শায়রা শুনে বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

ইব্রাহিম বললেন, 'তোমার বাবা কি তোমাকে যেতে দেবেন?'

'তুমিই আমার সব, সর্বস্ব। বাবা না চাইলেও তোমার সঙ্গে আমি চলে যেতে পারব।'

বিবি শায়রা তাঁর বাবার কাছ থেকে অনুমতি পেলেন, ইব্রাহিমের সঙ্গে যাত্রার ব্যাপারে।

ইব্রাহিম শায়রাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। যেতে যেতে পথচারীদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলেন, মিশরের রাজা অতি দুষ্টু ব্যক্তি। একজন

নারীলোলুপ। সুন্দরী নারীরা তার খপ্পর থেকে বাঁচতে পারে না। তাদের সে ভোগ করবেই। সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে যাত্রা করছ, পথমাঝে রাজার লোকরা তোমার বিবিকে কড়ে নিতে পারে।

পথচারীর মুখ থেকে এ কথা শুনে ইব্রাহিম ভীত হলেন। কী করবেন তিনি? তাঁর স্ত্রী তো পৃথিবীর সেরা সুন্দরী। কীভাবে নিয়ে যাবেন তাঁকে। একটাই মাত্র পথ। অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলেন, শায়রাকে লুকিয়ে নিয়ে যাবেন। একটা বড় সিন্দুক বানালেন, আর সেই সিন্দুকের মধ্যে শায়রাকে লুকিয়ে রেখে, বাইরে থেকে মস্ত তালা ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর সিন্দুকটা উটের পিঠে চাপিয়ে চলতে লাগলেন। শহরে পৌঁছলেন তিনি। রাজার মাশুল আদায়কারী তাঁদের আটকালো। মাল দেখে মাশুল ধার্য করা হবে।

ইব্রাহিম সিন্দুক খুলতে চাইলেন না।

মাশুল আদায়কারীর সন্দেহ বাড়ল। সিন্দুক খুলে দেখল, ভেতরে অপরূপ সুন্দরী এক নারী। তার রূপের আলোয় চোখ ঝলসে যায়। পথ রক্ষীরা তাঁদের রাজার কাছে নিয়ে গেল।

রাজা ইব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করল, 'এই মেয়েটি তোমার কে?'

'আমার স্ত্রী।'

'একে আমার কাছে সমপর্ণ কর।'

শায়রা এ কথা শুনে আল্লাকে স্মরণ করলেন।

ইব্রাহিম নিরুপায়।

রাজা তখন আদেশ দিলেন বাঁদীদের, শায়রাকে যেন গোসলখানায় নিয়ে গিয়ে গোসল করিয়ে, নতুন পোশাক পরিয়ে, গায়ে সুরভি ছড়িয়ে তার কাছে নিয়ে আসা হয়।

সেই মতো বাঁদীরা শায়রাকে গোসল করিয়ে পোশাকে সুরভিতে সাজাল।

এই সময় আল্লাতালা জিব্রাইলকে ইব্রাহিমের কাছে পাঠালেন। রাজার সঙ্গে শায়রার সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা যা হবে, সব শুনতে দেখতে পাবেন, জিব্রাইল সে ব্যবস্থা করলেন।

যখন সেই শয়তান রাজার কাছে শায়রাকে উপস্থিত করা হল, তখন রাজা শায়রার রূপে মুগ্ধ হয়ে হাত ধরে কাছে টানল। অমনি রাজার হাত অবশ হয়ে গেল। যখন রাজা শায়রাকে ভোগ করতে উদ্যত হল, অমনি আল্লার হুকুমে পৃথিবীর মাটি রাজার হাঁটু অবদি গ্রাস করে নিল।

তখন রাজা অবাক হয়ে বলল, 'এ নারী নিশ্চয় যাদু জানে।'

শায়রা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, 'ওরে শয়তান, আমি যাদু জানি না, আমার

স্বামী আল্লার বন্ধু, তিনি আল্লার কাছে আমার জন্য নিশ্চয় দোওয়া করেছেন, তাই তুই আমাকে ভোগ করতে পাচ্ছিস না।'

এই কথা শুনে রাজা তার দুষ্কর্মের জন্য অনুতাপ করে উঠল। অমনি তার হাতের অবশ অবস্থা ভাল হয়ে গেল। হাঁটু পর্যন্ত মাটির ভেতর গেঁথে গিয়েছিল সে, মাটি তাকে মুক্ত করে দিল।

অনেক রাত হয়েছে। শফী ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে কাবা শরীফের ছবির দিকে তাকিয়ে কিস্‌সাকাহিনীতে খোয়া গেছে।

অনেকক্ষণ ধরে ম্যানেজার জিয়াদ দরজার বাইরে আছে দাঁড়িয়ে। মালিককে আত্মস্থ দেখে তবেই তো মালিকের অনুমতি নিয়ে ভেতরে যেতে পারে! জিয়াদ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর এবার দেখল, মালিক সামান্য নড়াচড়া করছে। গলা খাঁকারি দিল জিয়াদ। তবুও শুনতে পেল না মালিক।

তারপর ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল শফী। দু-চার পাক পায়চারি করবার পর আবার জিয়াদ গলা খাঁকারি দিল।

পাশ ফিরে শফী দেখল, 'কি হল, ঘরে আয়।'

জিয়াদ ঘরে ঢোকে।

'কী হয়েছে।'

জিয়াদ আমতা আমতা করে। 'বড় মালিক ফোন করতে বলেছেন।'

'কখন বলল?'

'অনেকক্ষণ।'

'তাহলে তুই এখন বললি।'

'আজ্ঞে—'

'বাঞ্চোৎ।' সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামতে শুরু করে শফী।

'আমি শফী বলছি।'

'কে ছোটভাই?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো, আমার কাজ আমি শুরু করে দিচ্ছি। বিয়ের আর মাঝে দুদিন বাকি আছে। আজও ওসমান আর জিয়াদকে মহল্লা টহল দিয়ে মা মেয়ের হদিস আনতে পাঠিয়েছিলাম। ছানবিনে ওরা অসফল। আমার কাজ আমি শুরু করে দিচ্ছি। এতে প্রাণহানি হলে আমার করার কিছু নেই।'

'শাবানার কিছু হবে না তো?'

'আরে না না, যার সঙ্গে বিয়ে তার কিছু হয়!'

'তবে কার প্রাণ যেতে পারে?'

'যে তাকে আনতে বাধা দেবে।'

'ও তাই বল। কিন্তু তারা কোথায় আছে, তারই তো খবর পেলে না।'

'সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। রুস্তমের চেয়ে বড় মাস্তান ধরছি।'

'রুস্তমকে ধরলে তো কাজ হাসিল হয়ে যেত।'

'রুস্তম মাস্তান মা মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছে খবর পেয়েছি।'

'তাহলে আনু মাস্তানকে ধর।'

'তাই তো ধরেছি। বিশ পঞ্চাশ হাজার খসবে। তার জন্যে ভাবি না। মান সম্মানের ব্যাপার জড়িয়ে। বিয়ের সমস্ত আয়োজন শেষ। নেমন্তন্ন বাকি নেই। তুই ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তোমার ওপর ভরসা রাখি দাদা।'

'বেশ। এবার ঘুমোওগে।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে।'

'আর কথা নেই।'

'ঠিক আছে। আরো দু-চারটে কথা বললে পারতে।'

'না।' ওপার থেকে ফোন রেখে দেয় শওকত।

অফিস ঘরের বাইরে জিয়াদ দাঁড়িয়েছিল। ফোন রেখে তার দিকে রাগতঃ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় শফী। 'ওপরে আয়, কথা আছে।' কথাটা বলে ফটফট শব্দ করতে করতে তেতলায় উঠে গেল শফী।

জিয়াদ বুঝতে পারল, মালিক নিশ্চয় তার ওপর চটেছে। কণ্ঠস্বরে ও ভঙ্গিতে স্পষ্ট। কিন্তু যেতে হবে। জুতো পেটা করলেও, জুতোপেটা সহে নিতে হবে। দেরি করা চলবে না, তাহলে আরো ভারী শাস্তি হবে।

ভীরু বুকে ভীত পায়ে তেতলায় উঠে যায় জিয়াদ। তারপর দরজা খুলে ভেতরে তাকায়।

শফীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। শফীর চোখ ভেতরে ডাকছে।

জিয়াদ ঘরে ঢুকতেই, শফীর হাতের কাছে ছিল বেড়াল মারার লাঠিটা, সেটা দ্রুত টেনে নিয়ে জিয়াদের পেটে খোঁচা দেয় শফী। 'হারামজাদা, নিকম্মা, মা-মেয়ে কোথায় সেঁদিয়েছে, তাঁর খোঁজ আনতে পারলি না? এই তুই ম্যানেজার!'

৬

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মেয়ের হেঁচটি উঠতে শুরু করল। কিছুতেই হেঁচকি বন্ধ হচ্ছে না। মা জল খাওয়ায় তবুও হেঁচকি বন্ধ হয় না।

কে যেন আবে জম জমের পানি নিয়ে এসে খাওয়াল, তাতেও হেঁচকি বন্ধ হল না।

পাড়ার একজন বউ পাড়ার মৌলবির কাছ থেকে পানিপড়া আনতে গেল। ফিরে এসে সেই জল খাওয়াল। তাতেও কিছু হল না। যে-কে-সেই। কাছে ভিতের প্রতিবেশীরা পেরেসান হয়ে গেল, মেয়ের হেঁচকি বন্ধ হচ্ছে না।

মায়ের পাতানো বাবা নিয়ামত নাতনির এই অবস্থা দেখে কাজে যেতে পারল না। সে ছুটল হেকিমের কাছে, ওষুধ আনতে। হেকিম জানল সবকিছু, তারপর একশিশি ওষুধ দিল। ওষুধ খাওয়ানো হল, তবুও সারল না।

যত হেঁচকি তুলছে মেয়ে, ততই কাহিল হয়ে পড়ছে। তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছে তার মা। মুখে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। হেঁচকি হয়ে চলছেই মেয়ের। মেয়ে কথা বলতে পারছে না, খেতে দেতে পারছে না। মেয়ের এই অবস্থা দেখে মা প্রাণে কষ্ট পায়। তারও খাওয়া দাওয়া বন্ধ। কাছে ভিতের প্রতিবেশীরা চুপি চুপি আসে, খবর নিয়ে যায়, দেখে যায়। অনেকে অনেক কিছু বাৎলায়। সে সব কিছু করা হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

শেষমেষ একজন বলল এক গণৎকারের কথা। মুদিয়ালিতে থাকে। তাকে আনানো হোক।

বৃদ্ধ এক গণৎকার এল। সে মেঝেয় আঁক কেটে কী সব গুণল। তারপর বলল, 'ও প্রিয় কাউকে দেখতে চায়, তাকে দেখতে পেলে হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে।'

'কে প্রিয়?' মা তো হদিস করতে পারল না।

গণৎকার টাকা নিয়ে ফিরে গেল। বলে গেল, 'মেয়েকে শুধোলে, মেয়ে যদি মনে করতে পারে, তাহলে মেয়েই একমাত্র বলতে পারে।'

গণৎকার চলে যেতে মা মেয়েকে শুধলো, 'কে গো মা?'

মেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল, কিছু বলতে পারল না।

ভাবনায় মায়ের মুখ ভেঙে চুরে গেল। 'ওমা. তুই কি শফীকেই প্রিয় ভেবেছিস?'

মেয়ে মাথা নাড়িয়ে না জানায়। মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। জনগণের চাহিদার বিরুদ্ধে যায়নি মেয়ের রায়।

'তাহলে বলল মা, প্রিয় মানুষটা কে?'

মেয়ে বলতে পারল না।

'সে কি আলম?'

মেয়ে না জানাল।

'তাহলে তোর নানি? নূরজাহান বানু?'

মেয়ে না জানাচ্ছে।

গণৎকার বলে গেছে, মেয়েকে মনে পড়াতে সাহায্য করতে হবে। পাড়া প্রতিবেশী কতজনের নাম করে মা, কারো কথাই বলে না মেয়ে, কাউকেই প্রিয়

করে না, যে কি না তার কাছে এলে তার হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে।

শাবানাও ভাবতে লাগল, কিন্তু ভেবে কাউকেই পেল না। সারাক্ষণ হেঁচকির টানে বুক উঠছে নামছে। সেদিকেই মন চলে যাচ্ছে। ভাবতেই পারছে না।

মা ভেবে ভেবেই সারা হয়। তারপর মনে পড়ে যায় ছোঁড়ার কথা।

মা বলল, 'ওমা, ছোঁড়া নয় তো?'

মেয়ের মনে পড়ে যায়, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করে ওঠে।

কথাটা শুনে মায়ের চোখে জল চলে আসে। মুশকিল আসান হবে তাহলে। ছোঁড়া এত প্রিয় মানুষ মেয়ের? সে কিনা তার পাতানো ভাই। কিন্তু সে তো গতকাল এসেছিল, আজ আসবে কী করে? সে যদি নিজে নিজে আসার অধিকার পেত, তাহলে নিশ্চয় সকাল-বিকেল আসতো। তাকে তো এই বস্তিবাড়িতে রুস্তমের এক সাগরেদ চোখ বেঁধে এনেছিল। ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল চোখ বেঁধে। তাকে আনতে গেলে রুস্তমের শরণাপন্ন হতে হবে। রুস্তমের অনুমতি ছাড়া বেপাড়ার কেউ মা-মেয়ের কাছে আসতে পারবে না। রুস্তম মাস্তানের কাছে খবর পাঠাতে হবে। বলতে হবে সব বৃত্তান্ত। এতক্ষণে নিশ্চয় রুস্তম সব জেনে গেছে। গণৎকারের বিধান নিশ্চয় জানে না। নিয়ামত যাবে বলতে। আর ছোঁড়াকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা রুস্তমই যেন করে। কেন না বেপাড়ার ছেলে সে। হাজি রতন মোড়ে নাদের ওস্তাগারের দলিজে কাজ করে। ছোঁড়া সে। ছোঁড়া বললেই হবে না, নাদের ওস্তাগারের দলিজে গণ্ডাখানেক ছোঁড়া আছে, যে কাউকেই ধরে আনলেই হবে না। তার মধ্যে প্রিয় ভাইটিকে ধরে আনতে হবে। তার তো একটা নাম আছে? কি নাম তার? অদ্ভুত, মনে পড়ছে না মায়ের। মাথা চুলকোয় মা, মনে করতে পারে না, ছোঁড়া বলে ডাকলেই সাড়া দেয়, ছোঁড়া নামেই বেশি পরিচিত, তাহলে তো হবে না, নির্দিষ্ট ছোঁড়াকে তাদের দরকার।

এইটুকু তথ্য জেনেই নিয়ামত পৌঁছে গেছে রুস্তমের ডেরায়। নির্দিষ্ট নাম জানতে চাইল রুস্তম, নিয়ামত বলতে পারল না। বলল, 'নাদেরের দলিজে এক গণ্ডা ছোঁড়া আছে, তাদের মধ্যে একজন।'

'ব্যস, হয়েছে, হয়েছে, ব্যবস্থা করছি।' অভয় দেয় রুস্তম, নিয়ামতকে আশ্বস্ত করে। 'তুমি ফিরে যাও। চারজনকেই হাজির করছি।'

নিয়ামত ফিরে যায়।

তাহের আর পটকাকে ডাকল রুস্তম। ঘরের ভেতর গিয়ে তাদের সঙ্গে কীসব ফিস ফিস করল। তারা বেরিয়ে গেল।

নিয়ামত ফিরে গিয়ে বলল, 'ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

মা বলল, 'ব্যবস্থা কীসের কি হবে, কাকে বলতে কাকে ধরে আনবে! তুমি

চলে যাওয়ার পর ছোঁড়ার নাম মনে পড়ল। আসাদ।'

নিয়ামত বলল, 'একটু আগে মনে পড়তে কী হয়েছিল?'

মা বলল, 'ভুলো মন।'

'চারজনকেই হাজির করছে রুস্তম মাস্তান।'

মা হেসে লুটোপুটি খায়, 'রুস্তমের বুদ্ধি বটে।'

'মেয়েকে বাঁচাতে হবে তো!'

মেয়ে হেঁচকি দিয়েই চলে। থামবার লক্ষণ নেই।

মা তার গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। কীভাবে ঠিক হবে মেয়ে? ছোঁড়া এলে যদি মেয়ে ঠিক হয়ে যায়। ছোঁড়াকে হাজির করা হোক। দেরি যেন না হয়। ছোঁড়া কি মেয়ের হেঁচকি বন্ধ করতে পারবে? ছোঁড়াকে দেখলেই মেয়ের হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে? যাবে? যাবে কি? মায়ের সংশয়। মা পড়েছে বিপদে। এই অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাবে সে? কোনো পীরের দবগায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে কি? এ মেয়ের ওপর তো শফীর লোভ, কোথাও তো বেরনো যাবে না। ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। লুকিয়ে পড়তে হবে, আরো গোপন কোনো জায়গায়। রুস্তম ওয়াদা করেছে বাঁচাবার। মায়ের মন আশঙ্কায় শিউরে শিউরে ওঠে। মাটির ভেতর যদি লুকিয়ে পড়বার উপায় থাকত, মাটির তলায় লুকিয়ে পড়ত। এখন দরকার মেয়ের হেঁচকি বন্ধ হওয়া। মেয়েকে নাওয়ানো যাচ্ছেন না, খাওয়ানো যাচ্ছে না চুল বেঁধে দেওয়া যাচ্ছে না, ঘুম পাড়ানো যাচ্ছে না। মেয়ে অসুস্থ। হেঁচকি দিতে দিতে পেরেসান হয়ে পড়ছে। কোথায় আসাদ ছোঁড়া, তার বহিনকে এসে বাঁচাক 'আসাদ রে আ যা, তেরা জানে জিগর, কলিজা কা টুকরা, তেরা বহিন কে বাঁচা।' এই বলে চিৎকার করে উঠল মা।

বস্তিতে তখন তাহের আর পটকা এক গণ্ডা ছোঁড়াকে চোখ বেঁধে হাজির করেছে। নাদেরের দলিজ থেকে তুলে এনেছে। চেঁচায়—'কোন লেড়কা বাতাও।

সবাই ফিস ফিস করে বলে দিল আসাদকে নিয়ে যেতে হবে।

এক লেড়কাকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে তিন লেড়কাকে নিয়ে ফিরতে লাগল তাহের আর পটকা। বাকি তিনজন যারা কামে লাগবে না ইজ্জতের সঙ্গে তাদের যেন খাতির করা হয়, ওস্তাদের তেমনই হুকুম আছে। হোটেলে তাদের মাংস ভাত খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করতে ছুটল। আর ম্যাটিনি শোয়ে তাদের ফিলিম দেখাবে

আসাদ ছোঁড়ার জন্য মা শরবৎ তৈরি করে রেখেছিল। শরবৎ খায় আর বহিনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে, অমনি মেয়ের হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়। মেয়ে তখন উঠে বসে ছোঁড়ার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। কপালে চুমু খায়। তারপর তারা কড়ি খেলতে শুরু করে দিল।

সারা বস্তি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মেয়ের হেঁচকি বন্ধ হয়েছে, খবরটা চুপি চুপি ড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ চুপি চুপি দেখে যায়। বস্তি আবার সচল হয়, স্বাভাবিক য়।

ছোঁড়া আর বহিন কড়ি খেলতেই থাকে।

মেয়ে মাকে ডেকে দেখায়, 'দেখ মা, ভাইটির চোখ দুটি কি সুন্দর।'

মাও দেখে আশ্চর্য হয়। 'সত্যিই তো!'

বোন বলল, 'তুই আমার চিরকালের ভাই।'

তারপর তারা কড়ি খেলতে লাগল। একবার বোন হারে, একবার ভাই হারে। রাহারি নিয়ে তাদের গোলমালও বাঁধে। ভাই বোনের চুল টেনে দেয়। ভাইকে বান মাথায় গাঁট্টা মারে। তারপর তাহের আর পটকা সিনেমা হলে পৌঁছে দেয় ছাঁড়াকে।

৭

াজিরতন থেকে চারটে ছোঁড়া গায়েব হয়েছে। এ খবরে মহল্লায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি য়েছে। স্তব্ধ মেটিয়াবুরুজ। বাস বন্ধ করে দিয়েছে পাবলিক। কেন চারটে ছোঁড়া পহৃত হল, তার উদ্দেশ্য কী, কেউই বুঝে উঠতে পারছে না। জনরোষ ফেটে ড়ছে।

নাদেরের দলিজ থেকে নাদেরের চোখের সামনেই চারজন ছোঁড়ার অপহরণের শ্য ঘটে। দুজন লোক এসে তাদের থাপ্পড় মারতে মারতে দলিজ থেকে বের রে, আর রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল একটা ট্যাক্সি, তাতে তুলে উধাও হয়ে যায়। অপহরণ রতে মাত্র চার মিনিট সময় লেগেছিল তাদের। অদ্ভুত, তাদের হাতে কোনো স্ত্রশস্ত্র ছিল না। এত দ্রুত ঘটেছে যে কেউই তাদের চিনতে পারেনি। আর তাদের ুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল।

জনরোষের চাপে রাস্তার দোকান পট পট বন্ধ হয়ে যায়। বাস বন্ধ করে দেয় াবলিক।

ছোঁড়াদের উদ্ধার করা হোক। বেপাড়ার মাস্তান এসে পাড়ার ছোঁড়াদের তুলে নয়ে যাবে, তার কোনো প্রতিকার হবে না? মহল্লার মাস্তানরা কোথায় গেল? াড়ার আনু মাস্তানের কানে এ খবর গেল।

আনু মাস্তান নিজে থেকেই তৈরি হচ্ছে। এটা তার পাড়া, ইজ্জতের সওয়াল। ছাঁড়াদের উদ্ধারের ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। মেটিয়াবুরুজে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রুস্তম। এ নিশ্চয় রুস্তম মাস্তানের সাগরেদদের কাজ। রুস্তমের সঙ্গে ্যাকশানে এমনিতেই তৈরি হচ্ছিল আনু। কেন না শাফীর হোনেওয়ালা বিবিকে

লুকিয়ে রেখেছে। তাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা আনুকেই করতে হবে। কেন না আজ সকালে শওকতউল্লা তাকে ফোনে এই কাজের অর্ডারটা দিয়েছে। বিশ পঞ্চাশ হাজার যা লাগবে দেবে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কন্যাকে উদ্ধার করতে হবে।

কন্যা উদ্ধারের ছক কষছিল সকাল থেকে আনু। সব সাগরেদদের এত্তেলা পাঠিয়েছিল, তারা এসে হাজির। এদিকে আবার নতুন বিপত্তি ঘটেছে। তার আগে ছোঁড়া গায়েবের হদিস করতে হবে। খানিকক্ষণ হিসেব কষে আনু মাস্তান বুঝতে পারল, এ কাজ রুস্তমের। কেন না, তার সঙ্গে রুস্তম টক্কর দিতে চায়। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না, এ ছোঁড়ারা রুস্তমের কী কাজে লাগবে? এরা সব হত দরিদ্র ঘরের ছোঁড়া, এদের বাড়ির লোকদের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবি করা মূর্খের কাজ হবে। একটা ফুটো কড়িটি পর্যন্ত আদায় হবে না। তাহলে ছোঁড়া অপহরণের উদ্দেশ্য কী?

নিশ্চয় উদ্দেশ্য কিছু একটা আছে। এখন তার কাজ হবে, ছোঁড়াদের উদ্ধার করা। এই নিয়ে ভাবতে লাগল আনু। তাই নিয়ে সাগরেদদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল। দু-চারজনের সঙ্গে আড়ালে গিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলছে।

আনুর ডেরায় নাদের গেছে। নাদেরের চার ছোঁড়ার চার মা গেছে। দু-একজন সাগরেদ তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে। তাদের ওস্তাদ যখন কথা দিয়েছে, ছোঁড়া উদ্ধার হবেই। মায়েরা কান্নাকাটি করছিল খুব। তাদের রিস্তেদাররা দু-চারজন এসেছিল কেউ কেউ ছোঁড়াদের ফুপু, খালু, চাচা, মামা এসেছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে আনু তাদের আশ্বস্ত করল। 'আমি ব্যবস্থা করছি, ছোঁড়াদের উদ্ধার হবেই। কিন্তু কেউ কি বলতে পার, এই ছোঁড়া গায়েবের উদ্দেশ্য কী? এটা আমার জানা খুব দরকার আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না এই ছোঁড়ারা কেন পাকড়াও হল? নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে, কিন্তু সেই কারণটা কী?'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কেউ কিছু বলতে পারল না। আনু যে তিমিরে সবাই সে তিমিরেই।

কিন্তু তার জন্য বসে থাকলে চলবে না আনুকে। আনুর সাগরেদরা ছড়িয়ে পড়ল মোটরসাইকেল নিয়ে মেটিয়াবুরুজের মহল্লায় মহল্লায়। নিজেও বেরল মহল্লার মানুষজন আশ্বস্ত হল। আনু অ্যাকশানে গেল। ছোঁড়াদের উদ্ধারে নেমেছে

কিন্তু ছোঁড়াদের মায়েরা নিজেদের ধরে নিজেরা কাঁদতে লাগল। অদ্ভুত তাদের কান্না। অদ্ভুত তারা চিৎকার করে কাঁদছিল। নানা কথা বলে বলে কাঁদছিল। পাড়ার লোকজন তাদের খাওয়াতে চায়, কিন্তু তারা খেতে পারে না। চা খায় না, পান পর্যন্ত খায় না। তারা বলে ছোঁড়া উদ্ধার হলে তবে তারা খাবে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে পাড়ার লোকেরা আসে। তারা আনুর ডেরার বাইরে রোয়াকে বসে

থাকে। ভিড় হয় তাদেরকে ঘিরে। এক একজন এক এক রকম ভঙ্গিতে ভাষায় তাদের সান্ত্বনা দেয়। মেয়েরা কেউ কেউ তাদের হাত ছুঁয় যায়, কেউ কেউ পিঠে হাত রাখে, কেউ কেউ চুমু খেয়ে যায়।

একজন মায়ের মাঝে মাঝে ফিট হচ্ছে। তার ফিটের ব্যামো আছে। তাকে নিয়ে জনগণ ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। তাদের ঘিরে ভিড়, উদ্বেলতা। ভিড় জমে, ক্রমশ ভিড় জমতে থাকে তাদেরকে ঘিরে। যতক্ষণ না ছোঁড়া উদ্ধার হচ্ছে, ততক্ষণ তারা আনুর ডেরা থেকে উঠছে না। আনুর ডেরায় তারা হত্যে দিয়েছে।

এক এক সময় এক এক জন এক এক রকম খবর আনছে, তাদের চেনা কে যেন ছোঁড়াদের দেখেছে, পাঁচুড় মসজিদের সামনে। বোরখা পরা কোনো মহিলা তাদের সঙ্গে কথা বলছিল। কেউ কেউ এসে বলছে ইমামবাড়ায় তাদের দেখা গেছে। দেখা গেছে বিচালিঘাটে, গঙ্গার তীরে। তারা ওপারে চলে যায়নি তো, হাওড়ায়? এ পথ দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে বোধহয়। দিল্লি বোম্বে পাচার করা হয়েছে হয়তো। কত রকম গায়েবি খবর আসে। মায়েরা কান্না থামিয়ে সে সব খবর মন দিয়ে শোনে। অদ্ভুত আখ্যানগন্ধ এই সব খবরে। তারা খবর যখন শোনে, তখন তাদের কান্নার ক্লেশ সইতে হয় না। ছোঁড়াদের খবর কিস্‌সা নিত্য নতুন তৈরি হতে থাকে। প্রতিটি মুহূর্ত তারা নতুন রকম কিস্‌সায় মেতে ওঠে। এক এক সময় মায়েরা ভুলে যায়, তারা ছোঁড়াদের মা।

ছোঁড়ারা কোন বোরখা পরা মেয়ের সঙ্গে কথা বলে? সেই বোরখা পরা মহিলা কে হয় তাদের? কীসের কথা হয়? সেই নারীটি কি কোনো সমস্যায় পড়েছে? মেয়েটির ব্যাপারে ছোঁড়াদের ভূমিকা কী? এই নিয়ে কথা হয়, এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা হয়। অনেকে অনেক রকম কথা বলে। কেউ কেউ বলে ছোঁড়ারা সহি সালামতে আছে। তাদের গায়ে কোনো আঁচড় পর্যন্ত কেউ কাটতে পারবে না।

বেলা বাড়ে। দুপুর ঘন হয়। মেটিয়াবুরুজ বন্‌ধ। গাড়িঘোড়া বন্ধ। পাড়ার ছেলেরা রাস্তায় ক্রিকেট খেলে। দোকানপাট বন্ধ।

খবর পাওয়া গেল মুদিয়ালির মোড়ে ছোঁড়াদের একটা হোটেলে দেখা গেছে। হোটেলওয়ালা তাদের বলল ছোঁড়ারা এখানে খেয়েছে। তারপর তারা কোথায় গেছে, কেউ কিছু বলতে পারল না। রাস্তায় লোকদের জিজ্ঞাসা করা হল। কেউ বলল উত্তর দিকে যেতে দেখেছে তাদের। কেউ বলল দক্ষিণ দিকে। উত্তর দিকে খুঁজতে গেল লোকজন, দক্ষিণ দিকেও খুঁজতে গেল লোকজন। সারা মেটিয়াবুরুজ জুড়ে ছানবিন চলছে। ছোঁড়ারা কোথায় যেতে পারে? নিশ্চয়, কোথাও আছে, পাওয়া যাবে তাদের। মায়েরা রোয়াক ছেড়ে উঠছে না, তাদের ঘিরে ভিড় জারি থাকছে। নিত্য নতুন ভিড়। একদল আসছে, একদল যাচ্ছে।

অবশেষে আনু মাস্তানের দল কাঁচি সড়কের সিনেমা হলে পৌঁছে গেল। তারা সমস্ত খবরাখবর নিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছে, ছোঁড়ারা নিশ্চয় সিনেমা হলে ম্যাটিনি শোয়ে ঢুকেছে। আর তারা শাহরুখ খানের 'বাজিগর' দেখছে। সেই দুটোয় ঢুকেছে, পাঁচটার আগে বেরবে না।

পি-সন সিনেমা হলের সামনে আনু মাস্তানের বাহিনী পৌঁছে গেছে চারটের সময়। আনুও মোবাইলে খবর পেয়ে পৌঁছে গেছে। বাহিনী অপেক্ষায় আছে, ওস্তাদ কী বলে, সেই মতো তারা অ্যাকশন শুরু করবে। সিনেমা হলের ম্যানেজারকে প্যাঁদাবে কি না। কিংবা ভাংচুর করবে কিনা? কিংবা শো বন্ধ করে দিয়ে ছোঁড়াদের বের করে আনবে কিনা। আনু এসে বলল, ওসব কিছু করা চলবে না। মানুষজন সিনেমা দেখছে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তা না হলে পাবলিক খেপে যাবে। জনরোষের সামনাসামনি হতে চায় না। সব মাস্তানরাই জনরোষকে ভয় করে। অতএব অপেক্ষা করতে থাকল তারা।

চার ছোঁড়া সিনেমা হলের ভেতর, আর তাদের উদ্ধারের জন্য হলের বাইরে আনু মাস্তান ও তার বাহিনী। তারা কোল্ডড্রিংকস, পান খাইনি খাচ্ছে।

খবর পেয়ে পাড়ার লোকজন ছুটল সিনেমা হলের সামনে। তারা ফুলের মালা নিয়ে তৈরি। অদ্ভুত জনসমাগম, অদ্ভুত জনগণের মন। পাঁচটার সময় সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে এল চারজন ছোঁড়া। উদ্ধার করা হয় তাদের। মেটিয়াবুরুজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

৮

বিনা রক্তপাতেই ছোঁড়াদের উদ্ধার করা গেছে। কোনো রকম অ্যাকশানে যেতে হয়নি। এমন মসৃণভাবে যে ছোঁড়াদের উদ্ধার হবে, ভাবা যায়নি। যেন তারা অপহৃত হয়নি, সিনেমা গিয়েছিল, সিনেমা থেকে ফিরে এসেছে।

তাহলে দু-জন মুখে রুমাল বেঁধে যে নাদেরের দলিজ থেকে চারজন ছোঁড়াকে থাপ্পড় মারতে মারতে ট্যাক্সিতে তুলে উধাও হয়েছিল, সেটা কী? এই ছোঁড়াদের অপহরণের ব্যাপারে গভীর ষড়যন্ত্রের কিছু আছে। এর রহস্য বের করবার দায়িত্ব আনুর। অতএব আনু চার ছোঁড়াকে জনগণের হাতে তুলে দিলেও ভুলে যায়নি এদের পেট থেকে বের করতে হবে সেই রহস্যের সূত্র।

জনগণ তো ফুলের মালা পরিয়ে সারা মহল্লা চার ছোঁড়াদের ঘোরাল রিক্সায় চড়িয়ে। কিন্তু সন্ধেয় তাদের পৌঁছতে হবে আনুর ডেরায়। আনু বের করবে তাদের মুখ থেকে সেই রহস্যের কথা, যা কেউ জানে না। তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের দিয়ে কী করানো হয়েছে, সমস্ত বৃত্তান্ত জানা বোঝা উচিত হবে আনুর।

অতএব ছোঁড়াদের তোলা হল সন্ধ্যায় আনু মাস্তানের ডেরায়। ছোঁড়ারা বুঝে উঠতে পারছে না, তাদের নিয়ে এসব কী হচ্ছে, সকালবেলা দুজন মাস্তান তাদের তুলে নিয়ে গেল, তারপর মাংস ভাত খাইয়ে সিনেমার টিকিট কেটে দিয়ে সিনেমা দেখাল। তারপর অন্য মাস্তানরা তাদের সিনেমা হল থেকে গলায় মালা পরিয়ে মহল্লায় ঘুরিয়ে আবার আনু মাস্তানের ডেরায় তুলল। এসব কী হচ্ছে। কিন্তু তাদের কথা বলার কোনো অধিকার নেই, প্রতিবাদ করার কোনো কিছু নেই। চুপটি করে শুধু দেখে যেতে লাগল। শুধু দু-চারটে চড় থাপ্পড় খেয়েছে, আর কিছুক্ষণ চোখ বাঁধা, বাকি সব অভিজ্ঞতা মধুর, মনোরম। আবার কি নতুন অভিজ্ঞতা হবে, তারা ভেবে পাচ্ছিল না। তাদের মায়েদের দেখিয়ে দিয়ে, তাদের মা-দের বাড়ি চলে যেতে বলা হয়েছে। ছোঁড়াদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে সসম্মানে।

ছোঁড়াদের আর এক প্রস্ত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল আনু মাস্তান। দিব্যি ছোঁড়ারা হালুয়া-পুরি খেল।

তারপর আনু তাদের গায়ে মাথায় হাত বোলাল। প্রথমে জিজ্ঞেস করল, 'কারা তোদের তুলে নিয়ে গেল, তাদের চিনিস?'

কেউই তাদের চেনে নি, সবাই 'না' বলল।

'আগে কখনও কোথাও তাদের দেখিসনি?'

'না।'

'তাহলে কোথায় নিয়ে যায় তোদের? কোন পাড়ায়?'

'তা তো জানি না।'

'ট্যাক্সি করে তো গেলি, জানালা দিয়ে দেখতে তো পেলি, কোথায় গেলি?'

অন্য একজন ছোঁড়া বলল, 'আমাদের ট্যাক্সিতে তুলে, আমাদের চোখ গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল।'

'হুম্!' এটা নতুন তথ্য। 'তারপর কী করল?'

একজন ছোঁড়া বলল, 'তারপর আমাদের এক মহল্লায় নিয়ে গেল। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর হোটেলে নিয়ে এসে চোখের বাঁধন খুলে দিল। তখন চিনতে পারি এটা মুদিয়ালির মোড়।'

'কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, বাঁধনের ফাঁক দিয়েও দেখতে পাসনি?'

'না।'

'রাস্তার শব্দ শুনেও ধরতে পারিসনি?'

'না। তবে—'

'তবে কি?'

সেই ছোঁড়া অন্য তিনজন ছোঁড়ার দিকে তাকাল।

'বল।'

'হোটেলে দেখি আমরা তিনজন আছি, আসাদ নেই।'

'আসাদ ছিল কোথায়?'

'ওকে বোধ হয় রেখে দেয়।'

'কোথায়?'

'যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'তোদেরকে তো সিনেমা হল থেকে উদ্ধার করি, তখন তো ছিল।'

'আমরা সিনেমা হলে ঢোকার সময় আসাদকে দেখতে পাই। ভাল ফিলিম দেখিয়েছে, শাহরুখ খানের 'বাজিগর'।'

কিন্তু আসাদকে কেন মহল্লায় কিছুক্ষণ রাখা হল, সেই রহস্য আনুর জানা দরকার। আসাদের দিকে কটমট করে তাকাল আনু, 'যা বলবি, সত্যি বলবি। না হলে কেটে ফেলব। কোথায় তোকে নিয়ে গেল, কী করল, বল?'

আসাদ মনে মনে তৈরি হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। সে যদি সত্যি বলে তাহলে আনুর লোক বহিনের সন্ধান পেয়ে যাবে। শফী যে তাকে বিয়ে করতে পারবে না, বহিনকে যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, বহিনের মঙ্গলের জন্যই যে তাকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর তাকে নিশ্চিতভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাকি তিনজনকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল রুস্তমের লোক, এই সূত্র দেওয়া উচিত হবে না। বহিন বিপদে পড়ুক, সে চায় না। প্রাণ যায় সেও ভি আচ্ছা, কিন্তু বহিনকে বিপদে ফেলা যাবে না।

সে একটা কিস্‌সা বানাল। চার ছোঁড়ার মধ্যে একমাত্র তাকেই বাছাই করা হল। এক আলিশান বাড়িতে তাকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল। তার তিনতলায় নিয়ে গিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দিল। আলোয় ঝলমল করছে, সেই বাড়ির অন্দরমহল। গায়ে গায়ে বহু মূল্যবান পাথর বসানো। সব নিঃশব্দ। কোথাও সেলাইমেশিনের ঘর ঘর শব্দ হচ্ছে না। একজন অপরূপ দাসীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে। একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। খুব হালকা আলো জ্বলছিল সে ঘরে। পালঙ্কের বিছানায় লোলচর্ম অশীতিপর এক বুড়ি শুয়েছিল। দেখে মনে হবে, সেই বৃদ্ধা যৌবনকালে অসাধারণ এক সুন্দরী ছিল। কিন্তু এখন বয়েসের ভারে জরাজীর্ণ। গায়ের ত্বক কুঁচকে গেছে। দাঁত পড়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। আসাদকে সেই বৃদ্ধার শিয়রের পাশে বসতে বলা হয়। তারপর সেই বৃদ্ধার কপালে হাত বুলিয়ে দিল যখন, সেই বৃদ্ধা ধীরে ধীরে যৌবন ফিরে পেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সেই বৃদ্ধা যুবতীতে পরিণত হয়েছে। যৌবন ফিরে পেয়েছে। অপরূপ সুন্দরী সে রমণী। আসাদের মনে হয়, এ বাড়িটা

মেটিয়াবুরুজের ভেতরই, কিন্তু মেটিয়াবুরুজে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথায় সেটা? আনু মাস্তানকে আসাদ নিজেই প্রশ্ন করতে লাগল।

আনু মাস্তান অলৌকিক এক কিস্‌সার আকর্ষণে মজেছিল, সে কী করে জানবে, কোথায় সে বাড়িটা। কিন্তু আসাদের বলা এই কিস্‌সা বিশ্বাস করে নিল সে। মাস্তান বলে কি সে মানুষ নয়? তারও মন আছে, সেও জনগণের অংশ। মেটিয়াবুরুজে বাস্তবতা তো সারাক্ষণ ঘটছে, তার মুখোমুখি সব সময়ই হতে হচ্ছে, অলৌকিকতা কিছু একটা ঘটুক, সেও চায়, জনগণের মানসও তাই চায়।

আনু মাস্তান তো জানে, শফীর হবু বিবিকে উদ্ধার তাকেই করতে হবে। দরকার হলে রক্তপাত ঘটবে, প্রাণ যাবে, প্রাণ নেবে, কিন্তু তার জীবনে অলৌকিকতার গল্প প্রয়োজন হবে না, এমন তো নয়? সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী সে। আসাদকে আর প্রশ্ন করে ঘুলিয়ে দিতে চায় না, আসাদের বিভ্রম যদি প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে এমন একটা কিস্‌সা থেকে সে বঞ্চিত হবে। শেষ মেষ মেনে নিতে হল এই ছোঁড়া গায়েব আসলে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যেখানে শাবানার আত্মগোপনের কোনো রহস্য জড়িত নয়। শাবানা উদ্ধার সে অন্য কাহিনী, অন্য কিস্‌সা।

৯

আসাদের বর্ণনা করা কিস্‌সায় মজে থাকল আনু মাস্তান। সেই এক বৃদ্ধার যৌবন ফিরে পাওয়ার কাহিনী। সেই রমণী মেটিয়াবুরুজের কোন এলাকায় বাস করে, সে কথা আসাদ বলতে পারেনি। মেটিয়াবুরুজের ভিতরই, না-মেটিয়াবুরুজের মতো একটি মহল্লায়। যেখানে তিন মঞ্জিলওয়ালা আলিশান বাড়ি আছে। যে বাড়ি সুন্দর ও প্রাসাদোপম। সেখানে এক বৃদ্ধা আসাদের স্পর্শে যৌবন ফিরে পায়। আসাদের বর্ণীত এই কিস্‌সা একমাত্র আনু মাস্তানেরই একার অধিকারে রাখতে চায় আনু মাস্তান। প্রচার করে জনগণের সম্পত্তি করে দিতে আপত্তি আনুর। আসাদ তাকে চুপি চুপি এই কাহিনী বলেছে, চুপি চুপি এ কাহিনী নিজের কাছে নিজের করে রাখবে আনু। বেশ মজে থাকা যায় এতে। এর অলৌকিতা অত্যন্ত আকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর।

আনু বলছে না এই কিস্‌সা সাগরেদদের, নিজের কাছেই রাখছে। বেশ মজে আছে।

একজন সাগরেদ বলল, 'ওস্তাদ, কী পেলে ছোঁড়ার কাছ থেকে?'

'ও কিছু না, চুপ যা।'

'তবে যে গুম মেরে আছ?'

'হুম!' আর কিছু বলে না আনু।

আনুকে এখন ভয়ংকর গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন দেখে সাগরেদরা চিন্তিত হল। ছোঁড়ার

কাছ থেকে কিছু একটা শোনার পর থেকে এমন গম্ভীর ও চিন্তিত হয়ে গেছে। আনু মাস্তান তো এমন গম্ভীর প্রকৃতির নয়, এবং বুদ্ধিজীবীদের মতো চিন্তাশীল নয়। খুবই প্র্যাকটিক্যাল। যা করে দ্রুত, আর ঝুঁকি নিয়ে। গায়ের জোরও আছে, আছে অসীম সাহস। তার একটা চিৎকারে মহল্লা কেঁপে ওঠে। তাকে এমন নিরীহ চিন্তাশীল দেখে সাগরেদদের ভাল ঠেকল না। তাহলে কি আনুরই দলের কেউ ছোঁড়া অপহরণ করেছে? কোনো ছিঁচকে সাগরেদ? সেই শত্রুতায় আনু মুষড়ে আছে, চিন্তাশীল আছে? প্রতিপক্ষের শত্রুতায় ক্রোধান্বিত হওয়া যায়, কিন্তু আত্মপক্ষের শত্রুতায় মুষড়ে পড়তে হয়।

সাগরেদদের আশ্বস্ত করতে চাইল আনু, সে ঠিক আছে। তাকে নিজের মনে থাকতে দেওয়া হোক, এটুকু বলছে সে।

সাগরেদরা ভাবল, ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

সাগরেদরা ভাবল, শাবানা উদ্ধারের ব্যবস্থা কখন করবে ওস্তাদ? সময় যে ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওস্তাদের মুখের ওপর সওয়াল করার কোনো উপায় নেই। একটু বেতাল দেখলে ধুমধাড়াক্কা চালিয়ে দেবে। ক্ষুরও চালিয়ে দিতে পারে। আনু মাস্তান নিজের মনে থাকতে চাইছে, আনু মাস্তানকে নিজের মনে থাকতে দিতে হবে। আনু মাস্তানের সিদ্ধান্তের ওপর প্রশ্ন করার হুকুম নেই, নিয়ম নেই। শেষ কথা সেইই বলে।

অতএব সাগরেদরা আনু মাস্তানকে একা থাকতে দিয়ে ডেরার বাইরে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকল। আনু হাঁক দিলেই যাতে এক ডাকে সাগরেদরা হাজির হতে পারে, সে-রকম ভাবে থাকল সাগরেদরা সতর্ক উৎকর্ণ হয়ে। কেউ চা খায় চা দোকানে। কেউ খাইনি ডলে। কেউ মাগনা ঠান্ডা খায়। কেউ সিগারেট ফোঁকে। সাগরেদরা সবাই জানে আনু মাস্তান ভাল একটা অর্ডার পেয়েছে, তাড়াতাড়ি সে কামটার নিকেশ করতে হবে। ডেরা ছেড়ে যাওয়া অন্যায় হবে। ওস্তাদের কখন কী মেজাজ মর্জি হবে বলা মুশকিল। কখন কাকে তুলে আনতে হবে, কখন কাকে পেটাতে হবে, কখন কার ওপর হামলা করতে হবে, সব বলে দেয়। দরকার হলে নিজেও অ্যাকশানে লাগে। ছোটখাটো কাজে ওস্তাদকে জড়াতে চায় না তারা।

রুস্তম ওস্তাদ তাদের চিরশত্রু। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেই আছে। কখনো এরা পেটায় তাদের দলের লোকদের, কখনো ওরা পেটায়। অনতিবিলম্বে বিপক্ষের সঙ্গে কোনো একটা জোরদার অ্যাকশান ঘটতে চলেছে। কেন না অবিলম্বে বিবি উদ্ধারে নামতে হবে তাদের। আর এই বিবিকে গোপন করছে রুস্তমের লোকজন। এমনই খবর তারা পেয়েছে। খবরের সত্যতা নিয়ে কোনো তর্ক নেই। যেটা জানা জরুরি, বিবিকে কোথায় কোন মহল্লায় কোন তল্লাটে লুকিয়ে রাখা হয়েছে? সে খবরটা

জানতে হবে খুবই দ্রুত, আর অতিদ্রুতই বিবি উদ্ধার করতে হবে। এখন ওস্তাদের চিন্তাশীল হওয়ার কোনো অবকাশই ছিল না। ছোঁড়াটার সঙ্গে কী সব কথা হল, তারপর থেকে ওস্তাদ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল। ওস্তাদের স্বভাবে এমনটা ছিল না। যা হবে সব ধুম ধাড়াক্কা। কোনো ভাবনাচিন্তার জায়গা নেই। চলছিল ভালভাবেই। ছোঁড়াদের উদ্ধারও হল বিনা রক্তপাতে। ভেবেছিল, ছোঁড়া অপহরণের সমাধানের ভিতরই বিবি উদ্ধারের সূত্র সন্ধান পাওয়া যাবে, তা তো পাওয়া গেলই না। ছোঁড়ার সঙ্গে ওস্তাদের কথা হল, তাতে ওস্তাদ শান্ত হয়ে পড়ছে, তার স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধুত্তেরি, এসব সয় সাগরেদদের? চালাও ক্ষুর। নয়তো পিস্তল ছোঁড়ো, বোমাবাজি কর। অ্যাকশানে কোনো ধানাইপানাই লাগে না।

'হ্যালো।'

'কে?'

'আমি শওকত।'

'বলুন বলুন।'

'তোমার গলা এমন মিন মিনে শোনাচ্ছে? তুমি তো আনু, নাকি?'

'হ্যাঁ। বলুন না।'

'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছু হয়নি তো।'

'তোমাকে এবার ডেঁটে কথা বলতে হবে।'

'কী হয়েছে বলুন তো?'

'এখনও তুমি কনে উদ্ধার করতে পারলে না। মাঝে একদিন সময় আছে।'

'ও ভাববেন না, কালকের মধ্যে কনে আপনি পেয়ে যাবেন। আমি শুধু একটু চিন্তামগ্ন থাকতে ভালবাসছি।'

'তুমি চিন্তামগ্ন? মানে?'

'মানে কিছু নেই। এমনিতে।'

'ব্যাপারটা কী? কিছু একটা ঘটেছে তোমার জীবনে?'

'সামান্য একটা ব্যাপার, সে আপনাকে বলা যাবে না।'

'ও ঠিক আছে, বোলো না। কিন্তু কথার নড়চড় না হয়।'

'আজ রাতেই ছকে নিচ্ছি। কালকে মাল পেয়ে যাবেন?'

'মাল?'

'ওই কনে।'

'কথার খেলাপ হবে না তো?'

'একদম নয়। আর পাঁচ দশ মিনিট চিন্তামগ্ন থাকব, তারপর আবার যে-কে সেই।'

'কেন চিন্তামগ্ন হয়েছ, তা কি আমাকে একটুও বলা যাবে না?'

'না। সে একমাত্র আমার ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না। আমার কাজ হলেই হল।'

'অসততা পাবেন না, কাজ আপনার করে দেবই।'

'খবরটা পেয়েছ, কোথায় আছে?'

'সে খবর আমি পেয়ে যাব।'

'বেশ বেশ।'

চিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে বলে আনু নিজেই ফোনটা নামিয়ে রাখে। তারপর আবার চিন্তামগ্ন হয়। বেশ লাগে। বেশ মনের আরাম। চিন্তামগ্ন থাকে আরো খানিকটা সময়। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে—'লট আ যা! লট আ যা!'

সাগরেদরা সবাই দুদ্দাড় ফিরে আসতে লাগল।

সবাই এসে দেখল ওস্তাদ আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। চোখ জ্বলছে, হাতে পায়ে অস্থিরতা। ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠল, 'রুস্তমের একজনকে আভি হিঁয়া তুলে আন বে। শালো রুস্তম খানকি কা আওলাদ!'

সবাই বুঝল, এখন একটা অ্যাকশান হবে। রুস্তমের দলের একজনকে তুলে আনতে হবে। অস্ত্র সঙ্গে থাকবে। তৈরি হতে লাগল তারা। তারা জানে এমন ছোটখাটো অ্যাকশানে ওস্তাদ যাবে না। ওস্তাদের কাছে রুস্তমের এক আদমিকে তুলে আনতে হবে। ওস্তাদ সে আদমিকে পিটিয়ে তার থেকে কথা বের করবে, কন্যাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে? তারপরে আসল অ্যাকশান। ঝটপট সব তৈরি হচ্ছে সাগরেদরা। তারা ভেবে নিচ্ছে, কাকে তুলবে। যাকে তুলবে, সে নিশ্চয় একটু নরম প্রকৃতির হবে। যাকে পেটালে, তার মুখ থেকে কথা বের করা সহজ হবে। তার ডেরা আক্রমণ করবে, আর তাকে বাড়ি থেকে তুলে আনবে। অতএব ওসমান জাফর লাল সোনা তৈরি হতে থাকে। আর নিজেরা ফিস ফিস করে ছক কষতে থাকে।

দেরি হচ্ছে আনু ধমকায়, 'যা বে দেরি করিস না। আজ যত রাত হোক একজনকে তুলে আনতে হবে।'

'যো হুকুম।'

ওরা সব বেরিয়ে গেল।

আনু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'শালা!'

১০

রাত দুটোর সময় রুস্তম ওস্তাদের কাঁচা ঘুম ভাঙাতে বাধ্য হল সাগরেদ তাহের। রুস্তম দরজা খুলেই দেখে তাহেরকে, 'কি হয়েছে, এত রাতে? নিদ হারাম করলি?'

'ওস্তাদ!'

'কী হয়েছে বলবি তো?'

'পটকাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'কারা?'

'কারা তো জানি না।'

'খোঁচড়?'

'ওর বিবি এসেছে, ওকে সওয়াল করলে জানতে পারবে। আমার বাড়ির পাশে পটকার বাড়ি তাই আমাকে আগে জানিয়েছে। আমারও নিদ হারাম হল।'

'কই পটকার বিবি?'

দরজার বাইরে থামের আড়ালে ছিল পটকার বিবি। ওস্তাদ খুঁজছে শুনে থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

তাহের আর পটকার বিবিকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে নেয় রুস্তম।

রুস্তম চোখ মলচে ঘুম তাড়িয়ে বলল, 'পটকা কি কোনো বেইনসাফি কাম কালকে করছিল?'

তাহের বলল, 'না তো!'

'কাল তো কারবালায় তোলা তোলার দিন ছিল।'

'সেখানে কিছু করেনি তো?'

'না।'

'তা তো জানি না।'

'তবে পটকা পাকড়াও হল কেন? পাবলিক তুলল, না অন্য কেউ?'

'তা তো জানি না।'

'কারা তুলল পটকার বিবি? তাদের চিনতে পারলে?'

পটকার বিবি বৃত্তান্ত দিল পটকাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার। তারা ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু হল। তখন রাত সাড়ে বারোটা হবে। আমরা দরজা খুলতে চাইনি। লাথি দিয়ে দিয়ে দরজা ভাঙল চার পাঁচজন লোক। তাদের মুখ রুমালে ঢাকা ছিল। ঘরের আলো নেভানো ছিল। তারা টর্চ এনেছিল। প্রথমে আমার স্বামীর মুখ বেঁধে ফেলে। ধস্তাধস্তি চলে। আমার স্বামী বাধা দেয়। তখন ওরা লাথি মারে আমার স্বামীকে। তারপর চ্যাংদোলা করে বের করে নিয়ে যায় ঘর থেকে। বাইরে রাস্তায় অটো দাঁড় করানো ছিল, অটো করে নিয়ে যায়।

'কোথায় নিয়ে গেল, কোনদিকে?'

'বুঝতে পারিনি।'

'তাদের একজনকেও চিনতে পারনি?'

'না তবে—'

'তবে কি?'

'তবে একজন খুঁড়িয়ে চলছিল।'

'হুম! বুঝেছি। আনুর লোক ছিল। সঙ্গে ছিল খোঁড়া সোনা। কিন্তু আনু কেন পটকাকে তুলল? মতলব কি? দাঁড়া একটু ভাবতে দে।' রুস্তম একটা সিগারেট ধরায়, আর ভাবতে থাকে।

তাহের বলল, 'ওস্তাদ, ভাববার কিছু নেই, এ আনুর কাজ।'

'কী করে বুঝলি?'

'খবর আছে ওস্তাদ! তুমি বিবিকে শেলটার দিয়েছ, এ খবর লিক করেছে। আর বিবি উদ্ধারের অর্ডারটা আনু পেয়েছে শওকতের কাছ থেকে। বিবি কোথায় আছে জানার জন্য পটকাকে তুলে নিয়ে গেছে আনুর লোকজন।'

'শালা খানকির বাচ্চা আনু, তোকে দেখ লুঙ্গা। দুশমনি, দুশমনি করবি তুই? বহিনকে তুলে দিবি? ইতনা বে ইনসাফি ধর্মে সইবে না।'

তাহের বলল, 'পটকা ডরপুক আছে, চড় চাপড় খেলেই বলে দেবে বহিন কোথায় আছে।'

'বহিনকে বাঁচাতে হবে রে তাহের। জান চলে যায় সেও ভি আচ্ছা, বহিনকে বাঁচাও। সব জমায়েত হও বহিন কা পাশ, জরুর অ্যাকশন হোগা। জান দেগা তো জান লেগা। রুস্তমের ওয়াদার খেলাপ হবে না। কুইক রেডি। সব সাগরেদ কো এত্তেলা পাটাও। বহিন কো পাস যাও, বহিন কো বাঁচাও।' হঠাৎ রুস্তম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। 'শালা আনু তেরা দেখ লুঙ্গা! শালা খানকির আওলাদ!'

চিৎকার করে আনু মাস্তানের উদ্দেশ্যে গালাগাল দিতে লাগল রুস্তম মাস্তান। রাত্রি খান খান করে তার চিৎকার মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ছে। মহল্লা কেঁপে উঠছে। ঘুম ভেঙে যাচ্ছে মানুষজনদের।

সাগরেদদের এত্তেলা পাঠানো হয়েছে। তারা সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে এসেছে। প্রথমে রুস্তমের ডেরায় জড় হচ্ছে। তারপর তারা ছুটছে ধানখেতির বস্তিতে। ধানখেতির বস্তি সিল করে দিয়েছে।

তখন ভোর হয়ে গেছে।

মসজিদে মসজিদে আজান চলছে।

ধানখেতির বস্তির মানুষ যারা ঘুম থেকে উঠেছিল, তাদের সর্তক করে দেওয়া

হল বস্তি আক্রান্ত হতে পারে। সকলকে সর্তক থাকতে হবে, সকলকে প্রতিরোধ করতে হবে। যারা ঘুমিয়েছিল, তাদের জাগানো হল। শোনানো হল সতর্কবাণী। রুস্তমের লোকজনই যথেষ্ট। তারা তৎপর হয়ে উঠেছে।

রুস্তমের লোক নিয়ামতের কাছে পৌছে যায়। নিয়ামত মা-মেয়েকে ঘরের ভেতর শুতে দিয়ে বাইরে দরজার সামনে শুয়েছিল। রুস্তমের লোক তার কাছে এসে ফিস ফিস করে বলে যায়, 'কন্যা লুঠ হতে পারে।'

'শফীর লোক জেনে গেছে, কন্যা কোথায় আছে?'

'সম্ভবত।'

'তাহলে তো বিপদ।'

'বিপদ কিছু নেই। আমরা তো আছি, দেখি কেমন করে নিয়ে যায়। জান থাকতে নিয়ে যেতে দেব না। তার আগে আমাদের লাশ যাবে।'

'লাশ পড়বে? খুন হবে? রক্তপাত ঘটবে?'

'ভয় পাচ্ছিস বুড়ো?'

'ভয় তো লাগেই।'

'ওস্তাদ আসছে, নিজেই অ্যাকশান করবে, আনু মাস্তান আমাদের চির শত্রু!'

'আনু মাস্তান!'

'চমকে উঠলি যে!'

'বড়িয়া মাস্তান।'

'আমাদের ওস্তাদ কীসে কম আছে?'

'বহোত ডর লাগছে।'

'চ্যাঁচামেচি করিস না, মা মেয়েকে আসানিকে সাথ নিদ যেতে দে। ওদের কোনো ব্যাঘাত ঘটতে দিলে চলবে না। ওদের গায়ে কোনো আঁচড় না লাগে। ওস্তাদের তাই হুকুম আছে।'

মা মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল।

হঠাৎ কুকুরের ডাকে মায়ের ঘুম ভেঙে যায়।

তারপর আজানের শব্দ শোনে।

মা দেখে, মেয়ে অকাতরে ঘুমচ্ছে। মুখের ওপর চুল এসে পড়েছিল, মা সরিয়ে দেয়। তারপর মেয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ভোর হয়েছে। আরো একটু ঘুমবে মেয়ে। মেয়েকে ঘুমতে দেওয়া উচিত হবে। হালকা আলো ছড়িয়ে আছে ঘরের ভেতর। আর চারপাশে নরম নৈঃশব্দ। কোথাও কিছু অনিয়ম ঘটেনি। যেমন চলছিল, তেমনই চলছে। যেমন ভোর হয় তেমনই ভোর হয়েছে। যেমন মেয়ে ঘুমিয়ে থাকে, তেমনই ঘুমিয়েছে। মেয়েকে বাঁচানো খুব জরুরি।

কিন্তু মায়ের আর ঘুম ধরে না। বিছানায় নিঃশব্দে এপাশ ওপাশ করে। দরজা খোলার শব্দে যদি মেয়ের ঘুম ভেঙে যায়, সেই আশঙ্কায় মা বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে ভোরের নরম আলোয় বাইরে বেরিয়ে আসছে না। বিছানায় মেয়ের সঙ্গে তেমনই শুয়ে থাকে।

হঠাৎ মেয়ের চোখ খুলে যায়।

মা কপালে হাত বুলোয়, 'যা ঘুমিয়ে যা।'

'কীসের শব্দ মা?'

'কই কিছুর শব্দ নেই তো?'

'কিছুর শব্দ পাচ্ছ না?'

'না।'

'আমার মনে হয় বাইরে কিছু একটা ঘটতে চলেছে?'

'কী ঘটবে?'

'কেমন একটা গন্ধ, কেমন একটা হাওয়া।'

'জানালা তো বন্ধ করা আছে।'

'আমার কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বলতে পার?'

'তা তো জানি না।'

'আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।'

'কীসের স্বপ্ন।'

'একটা সাপ আমাকে তাড়া করছিল।'

'সাপ?'

'হ্যাঁ সাপ।'

'কোথায়?'

'কোনো এক জঙ্গলে।'

'স্বপ্ন স্বপ্নই।'

'আমার সত্যি মনে হচ্ছিল।'

'আর একটু ঘুমো।'

'না, আর ঘুমোব না। চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতে ভাল লাগছে।'

'তাই চোখ বন্ধ করে পড়ে থাক।'

'তুমি আমার কপালে হাত বুলিয়ে দাও।'

'এই তো দিচ্ছি।'

মেয়ে ঘুমতে চায়নি। কিন্তু আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে মেয়ে 'মা মা মা' করে ডেকে উঠছে। আর কেঁদে উঠছে। মেয়ের এই ঘুমন্ত অবস্থায় কান্না দেখে

মায়ের প্রাণ আকুল হয়। এ কোন বিপত্তি হল, মেয়ে ঘুমে ঘুমে কাঁদছে কেন? লোকজনদের ডাকবে? বলবে, এই নতুন বিপত্তির কথা? ভেবে পায় না মা। মায়ের মন সব সময় শঙ্কায় ভরে ওঠে। ভোর হয়ে গেছে, সকাল ফুটতে শুরু করেছে, অথচ মেয়ে ঘুমের ভেতর কেঁদে চলেছে।

বাইরে কীসের ফিসফাস? দুপদাপ পদশব্দ বস্তির মধ্যে? বস্তির স্বাভাবিক জীবনযাপনে পদচারণা তো এমন বেখাপ্পা হয় না? মায়ের মন বড়ই আকুল হয়। কী ঘটতে চলেছে?

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে মা। পাশ ফিরে মেয়েকে দেখে। মেয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তেমনই কাঁদছে।

নিঃশব্দে দরজায় কান দেয়। কারা যেন বাইরে ফিস ফিস কথা বলছে। কে যেন ভয় পেয়েছে, কে যেন সাহস যোগাচ্ছে তাকে। মা ভেবে পায় না কী করবে। অস্থিরতায় ঘরের ভেতর পায়চারি করতে শুরু করে। আবার দরজায় কান পাতে। আবার ফিস ফিস শব্দ শুনতে পায়। বস্তির রাস্তায় বেখাপ্পা পদচারণা শুনতে পায়।

'মা মা মা।' আবার মেয়ের ঘুম ভেঙে গেছে। 'মা তুমি কোথায়?'

'এই তো আমি।'

'আমার কাছে এস তুমি।'

মা ছুটে যায় মেয়ের কাছে। 'ভয় কি আমি তো আছি।'

'আমার কোনো ভয় নেই?'

'না।'

'আমার কপালে হাত বুলিয়ে দাও। আবার স্বপ্নটা দেখছিলাম।'

মা কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

'আমি আর ঘুমবো না।'

'বেশ, না ঘুমোস না ঘুমোবি।'

'আমাকে একটা কাহিনী বল।'

'বলছি।'

'তাড়াতাড়ি শুরু কর।'

'এক দেশে এক রাজা ছিল—'

মা কাহিনী বলতে থাকে, আর মেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে থাকে।

১১

পটকাকে কয়েক ঘা মার দেওয়া শুরু করতেই পটকা সব বলে দেয়। কোথায় বিবিকে লুকিয়ে রেখেছে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে দেয়। কিন্তু পটকা যে সত্যি বলছে,

তার প্রমাণ কি? যতক্ষণ না পটকার কথা মতো বিবিকে পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পটকাকে ছাড়া যাবে না। ও যে সত্যি কথা বলছে, তার কি নিশ্চয়তা আছে? আনু মাস্তান এমন সহজ আদমি নয়। পটকার কথা মতো বিবি উদ্ধার হবে, তবেই পটকাকে ছাড়া হবে। মিথ্যে বললে একটা হাত কেটে তবে ছাড়বে।

রাতারাতি পটকাকে এক গোপন ডেরায় নিয়ে যাওয়া হল। পাঁচুড়েতে। একটা গুদাম ঘরে আটকে রাখা হল। হাত পা বেঁধে মুখ বেঁধে রাখা হল। যাতে চিৎকার করতে না পারে। পটকা পায়ে হাতে ধরে বলেছে, 'আমি সত্যি কথা বলছি, বিবিকে ওখানেই পেয়ে যাবে', তার কথায় বিশ্বাস করেনি আনু। শত্রুপক্ষের লোককে বিশ্বাস করে না সে।

তারপর আক্রমণের ছক কষা হতে শুরু করল। এসব করতে করতে ভোর হয়ে গেল। ঘুমতে পেল না। মসজিদে আজান শুরু হয়ে গেল। দেরি করা যাবে না, এতক্ষণে নিশ্চয় রুস্তম তৈরি হয়ে গেছে। কেন না পটকা অপহরণের খবর সঙ্গে সঙ্গে রুস্তমের কাছ পৌঁছবার কথা। দেরি করলে রুস্তম আরো তৈরি হতে পারবে। আনু বাতাসে গন্ধ পাচ্ছে, যতই তাড়াতাড়ি করুক না কেন অ্যাকশান একটা হবেই। বিবি আশ্রয়ে রুস্তমের ফায়দা কিছু নেই, কিন্তু যেহেতু আনু উদ্ধার করতে যাচ্ছে, রুস্তম বাধা দেবেই। রুস্তম কনেকে নাকি বহিন ডেকেছে। পাতানো ভাই বোনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে রুস্তম খুবই আবেগপ্রবণ। রুস্তমের দিক দিয়ে ভাবে আনু, সত্যিই একটা আবেগ আসে। একেবারে দিলের গোড়া থেকে এক ধরনের ভালোবাসা বোধ হু হু করে ওঠে। সে সব ভালোবাসার গায়ে লাথি মারে আনু। আনু মাস্তান মেটিয়াবুরুজের শের আছে, তার সঙ্গে টক্কর দেওয়া মুশকিল আছে। হয় সে জান নেবে, নয়তো জান দেবে।

সকাল সকাল কাজটা সারতে হবে। আজকেই লাস্ট ডেট। কাল শাদী আছে। পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা কম নেবে না সে। আর শওকতউল্লার পয়সা আছে, চিপ্পুস পার্টি নয়। কথার দাম আছে। ঠিক সময়ে বিবি পৌঁছবার ব্যাপারটা তাকে শুধু দেখতে হবে। নেমন্তন্ন হয়ে গেছে। বিয়ের ব্যবস্থাদি সব পাকা। শুধু বিবি নেই। বিবি সে পৌঁছে যাবে ঠিক সময়ে।

ভোরবেলা সোনাকে ধানখেতি বস্তিতে পাঠাল আনু। পরিস্থিতি বুঝে আসতে। সেই মতো আর্মস নেবে, সেই মতো লোকজন নিয়ে যাবে। সহজে ব্যাপারটা মিটবে না, বুঝতে পারছে আনু। বাতাসে তেমনই গন্ধ পাচ্ছে।

সোনা এসে বলল, 'রুস্তমের লোকজন পাহারা দিচ্ছে।'

'দেখলি কাউকে?'

'দুজনকে দেখেছি। আর দেখতে পাইনি, বোধহয় লুকিয়ে আছে।'

'রুস্তম নেই?'

'মালুম পেলাম না।'

'চলো অ্যাকশান! আনুর কথার দাম আছে।'

সকালের আলো ফুটতে রুস্তম ধানখেতির বস্তিতে যায়। অ্যাকশানের জন্য তারা সব তৈরি আছে। বহিনকে বাঁচাতে হবে। শুনল আনুর লোক সোনা এসে ঘুরে গেছে। তার মানে পরিস্থিতি বুঝতে এসেছিল। তার মানে অ্যাকশান একটা হচ্ছেই।

রুস্তম নিয়ামতের ঘরের সামনে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে চিৎকার করে উঠল, 'কোন মায়ের লাল আছিস আয়, বহিনকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যা। আরে মরদ আছি আমি, মরদ! জান লিয়ে তবে ছাড়ব।'

ঘরের ভেতর মা তার মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছিল। রুস্তমের এই চিৎকার শুনে মা-মেয়ে কেঁপে ওঠে।

মেয়ে মায়ের আঁচল খামচে ধরে। বড় বড় চোখ মেলে তাকায়—'মা, আমাদের কী হবে?'

'চুপ যা, তোকে বাঁচাতে এসেছে তোর ভাইয়া।'

'আমাকে বাঁচাতে কি পারবে?'

'পারবে পারবে।'

'আমি যে খুব ভয় পাচ্ছি।'

'ভয় পাস না, বুকে সাহস রাখ।'

'আমাকে বার করে দাও, আমি কোথাও চলে যাই। এসব আমার ভাল লাগে না।'

'কোথায় যাবি তুই?'

'কোথাও।'

'চুপ যা, কাহিনী বলব।'

'আমি কাহিনী শুনতে চাই না।'

'তাহলে তুই ঘুমিয়ে পড়, আমি তোকে গান শোনাব।'

'আমার ঘুম আসবে না।'

'তাহেল কি করলে তুই শান্ত হবি বল।'

'আমি জানি না।'

'খেলনা চাস, খেলতে চাস?'

'না।'

'কি খেতে চাস বল, তোর জন্যে আনাব।'

'কিছু খেতে চাই না।'

'তাহলে কি করব বল না?'

'আমি জানি না, কিছুই জানি না।'

কথা ফুরিয়ে যায় মা মেয়ের। তারা আর কথা বলে না। মা উঠে পড়ে কান পাতে দরজার বাইরে। বাইরের পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। রুস্তম পা ফাঁক করে সিগারেট খাচ্ছে আর চিৎকার করছে।

মেয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। তার বাইরের ব্যাপারে একেবারেই মনোযোগ দেওয়ার ইচ্ছে নেই। মা সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়েছে, পরিপাটি হয়ে বিছানায় বসে আছে। চোখের পাতা তার পড়ছে না। অপলক তাকিয়ে আছে।

মায়ের বুক দুরু দুরু। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কী ঘটবে সে ব্যাপারেও কোনো আন্দাজ করতে পারছে না। এ অভিজ্ঞতা তো তার কখনো হয় নি! সে শুধু দরজায় কান পাতে, আর ভয় পেতে জানে।

রুস্তম কোমরের রিভলভারে মাঝে মাঝে হাত দেয়, চারপাশ দেখে। সাগরেদরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মূল জায়গায় তার পাহারা। বহিনকে তুলে নিয়ে যেতে হলে এখানে আসতে হবে। তার আগে বাধা দেবে সাগরেদরা। সমস্ত রাস্তা ঘিরে রেখেছে তারা। বস্তির মানুষরা যেমন জীবনাযাপন করে, তেমনই করছে। তাদের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ নয়, তারাও কোনো সংঘর্ষে নামবে না। দু-মাস্তানের কাজিয়া, দুই মাস্তানের লোকজনই করে। সে যে কোনো জায়গায় হতে পারে। ক্ষয়ক্ষতি, সে হতেই পারে। খুন জখম সে হয়েই থাকে।

জল খেতে চাইল রুস্তম। বস্তিবাড়ির এক বউ এসে গেলাস ভরে জল দিয়ে গেল। রুস্তম জল খায়। তারপর আবার সিগারেট ধরায়। তার উপস্থিতিতেই বস্তির লোকজন থর থর করে কাঁপছে। রুস্তম মাস্তান যদি খুন হয়, তাহলে তার এই জল খাওয়া শেষ জল খাওয়া হবে। কেন না পরিস্থিতি কেমন হবে বলা মুশকিল। আনু মাস্তান এলাকার সেরা মাস্তান। সে যদি রুস্তমের সঙ্গে লড়তে আসে, লড়াই জোর হবে নিশ্চিত। আবার আনু মাস্তানের কাছে রুস্তম মাস্তান হারতে পারে, মরতে পারে। আনু মাস্তান নিষ্ঠুর প্রকৃতির মাস্তান। তার হৃদয়ে দয়ামায়া খুব কম আছে। আর তার লোকজন খুবই খতরনাক। গায়ের জোরও বেশি। তাহলে বিবি কি লুঠ হবে? কিছুই বলা যাচ্ছে না। ঘটনার গর্ভেই পরিণতি লুকিয়ে আছে। ঘটনার ভেতর দিয়েই আমরা সেই অভিজ্ঞতা পাব।

দরজা অল্প ফাঁক করে মা নিয়ামতকে কাছে ডাকল।

নিয়ামত আজ আর কাজে যায়নি। দরজা গোড়ায় পাহারায় আছে। তার ঘরে আশ্রয় দিয়েছে মা-মেয়েকে ; তার কি পালিয়ে গেলে চলে?

নিয়ামত মায়ের সঙ্গে কথা বলল, 'কি ব্যাপার?'

'রুস্তম কি পারবে আনু মাস্তানের সঙ্গে?'

'তা তো জানি না।'

'যদি না পারে?'

'তাহলের তো জান দিতে পারবে।'

'জান দিতে পারবে?'

'হ্যাঁ, সাচ্চা আদমি আছে, দু-নম্বরি পাবে না রুস্তমের মধ্যে। পারলে ওইই পারে তোমাদের রক্ষা করতে।'

আশ্বস্ত হয়ে মা মেয়ের কাছে ফিরে যায়।

মেয়ে তেমনই অপলক বসে আছে।

মা বলে ওঠে, 'কি হল তোর?'

মেয়ে কিছু বলে না।

মেয়ের পিঠে হাত বুলোয় মা।

বস্তির কার কাছ থেকে যেন খইনি চাইল রুস্তম। রুস্তমের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটা খইনি ডলছিল। আর রুস্তম বুক চিতিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোনো ভয় নেই। তাকে কোনো ভয় পেতে নেই।

লোকটা সবটা খইনি কাঁপা হাতে দিল রুস্তমকে।

রুস্তম ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিল খইনি। একটু থুতু ফেলল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে চারদিকটা তাকিয়ে নিল। দূর থেকে দেখা গেল, তাহের ছুটতে ছুটতে আসছে।

তাহের হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে বলল, 'ওস্তাদ, এসে গেছে। ধানখেতির মোড়ে তিনটে অটো করে নেমেছে।'

'আমাদের সব তৈরি তো?'

'হ্যাঁ, এবার বাধা দেবে।'

দূরে বোমাবাজির শব্দ। লোকজন ছোটাছুটি করছে। বস্তির মানুষ যে-দিকে পারছে ছুটছে। বিপুল চিৎকার চ্যাচামেচি ও বোমাবাজির প্রচণ্ড শব্দ। বস্তির মানুষ সব ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে পট পট দরজা জানালা বন্ধ করে ফেলছে। শিশুরা কাঁদছে। মেয়েরা আর্ত চিৎকার করছে।

রুস্তম ধীর শান্ত হয়ে মা-মেয়ের ঘরের দরজার সামনে আসে। তারপর দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে।

মা তখন ভয়ার্ত চোখে মেয়েকে জড়িয়ে বসে আছে। মেয়ে ভাবলেশহীন।

রুস্তম ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। কিছু কথা বলল না। নীরব চোখে একটু তাকিয়ে থাকল। তারপর বহিনের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল একটিবার। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তারপর।

ঘর থেকে বেরিয়েই রুস্তম বোমার শব্দ পেল। তারই দশ হাত দূরে বোমা ফেলেছে কেউ। রাস্তায় নেমে চারদিক তাকিয়ে কোমর থেকে রিভলবারটা বের করতে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে তার পায়ের ওপর বোমা পড়ল। রাস্তায় ছিটকে পড়ল রুস্তম। পায়ের অংশ উড়ে গেছে। তখনও নড়া চড়া করছিল রুস্তম।

আনু মাস্তানের দল কাছে চলে আসে। আনু মাস্তান কাছ থেকে রুস্তমকে গুলি করে।

রুস্তম যদিও কাতরাচ্ছিল, গুলি করার পর কাতরানি বন্ধ হয়ে যায়। খুব অল্প সময়ই বেঁচেছিল রুস্তম।

তারপর কন্যা অপহরণ হয়। শাবানাকে ওরা তুলে নিয়ে যায়।

পাঠক, কাহিনীর উপসংহার এখানে। আমরা কখনো কোনোদিন অন্য কাহিনীতে যাব। অবশেষে মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা সমাপ্ত হল। এ কাহিনীর পরবর্তী ঘটনাক্রম কী কী হতে পারে, তা পাঠকরা ভেবে নিতে পারবেন। এ পর্যন্ত লেখক লিখতে পারল। ইতি।
